স্বর্গ-মর্ত

উৎসর্গ

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

অনুজপ্রতিমেষু

এক

সুবলপুরে গোপাল ঠাকুরের আখড়ায় জন্মাষ্টমীতে খুব সমারোহ।

গোপাল ঠাকুর—নাড়ুগোপাল মূর্তি। আখড়ার সেবায়েৎ ব্রজদাসী বষ্টুমী। যেমন ঠাকুরটি সুন্দর—তেমনি শ্রীমতী সেবায়েৎটি। বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হইয়াছে, পনেরো ষোল বৎসরের একটি সন্তানের জননী—তবু তাহার শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীতে মালিন্যের ছাপ স্পর্শ করে নাই। দেখিলে মনে হয় তিরিশ বৎসরের একটি যুবতী মেয়ে, লালপেড়ে অর্থাৎ লাল পাড়ওয়ালা কাপড় পরিলে লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত মনে হইত; গ্রামের লোকেরাই বলে এ-কথা।—ব্রজদাসী তাহাতে লজ্জা পায়। বলে—ও কথা বলবেন না। আমাকে শুনতে নাই। আমি বষ্টুমী।

থান কাপড় পরিয়া কপালে তিলক নাকে রসকলি কাটিয়া ব্রজদাসী ঘন-শ্যাম-পল্লব ঘেরা আখড়াটিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। আখড়াটি যেন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। তেমনি চমৎকার মানুষ। গোপালজীর সেবা লইয়াই আছে।

জ্বালা শুধু ছেলে দুলালকে লইয়া।

এমন মা—তাহার এমন ছেলে! লোকে আড়ালে বিস্ময় প্রকাশ করে। বিস্ময়ের কথাই বটে; সব দিক দিয়াই মায়ের সঙ্গে ছেলের এমন গরমিল দেখা যায় না।

এমন সুন্দর মায়ের শ্রী, এমনি ছোটখাটো গড়নের মা—তাহার ছেলের চেহারা যেমন কর্কশ তেমনি কালো, আকারেও তেমনি স্থূল এবং প্রকাণ্ড। পনের-ষোল বছরের ছেলেটাকে বিশ বছরের জোয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। স্বভাবে মা এমনি স্নিগ্ধ এমন ভালো মানুষ—আর দুলাল এমন দৃঢ়, এমন দুর্দান্ত, এমন উদ্দাম—যে মা ও ছেলেকে একসঙ্গে দেখিবামাত্র লোকের মুখে-চোখে সবিস্ময় প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, কপালে সারি সারি জিজ্ঞাসার রেখা দেখা যায়—ভাবে এই মায়ের এই ছেলে? পরমুহূর্তেই আপন মনেই তাহারা হাসে—তাহাদের মনই উত্তর দেয়—অদৃষ্ট! গোটা গ্রামের লোকে ভয় করে। আড়ালে কেহ বলে—দানো, কেহ কেহ বলে—কালাপাহাড়!

কালাপাহাড় তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে বষ্টুমের ছেলে এমন সুন্দর আখড়ায় মানুষ হইয়া মোটর বাসের ড্রাইভারি শিখিতে যায়।

ব্রজদাসী সবই জানে সবই তাহার কানে আসে কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। কি বলিবে সে? তাহার নিজের অন্তরেই যে এ লইয়া দুঃখ জমিয়া জমিয়া পাহাড় হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে আপন মনেই আক্ষেপ করিয়া অতি মধুর মৃদুস্বরে গুন গুন করিয়া মহানন্দের পদাবলীর একটা কলি গাহিয়া নিজেকে বোধ হয় সান্ত্বনা দেয় অথবা সৃষ্টি-রহস্যতত্ত্ব স্মরণ করিয়া মনে মনে ম্লান হাসি হাসে—'সুখ দুখ দুটি ভাই।' কখনও গায় সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু—, তারপর শিহরিয়া উঠিয়া চুপ করিয়া যায়। মনে মনে বলে—হে গোপাল, হে গোবিন্দ—ক্ষমা কর প্রভু! আমার এ ঘর দুঃখে ভরিয়া দিয়াছ—আর যেন আগুনে পুড়াইয়া দিও না। একবার ঘর পুড়িয়াছে—আর না।

জন্মাষ্টমীর আগের রাত্রে ভোরবেলা ব্রজদাসী গোবিন্দ স্মরণ ভুলিয়া এই সবই ভাবিতেছিল। তাহার অদৃষ্ট আর হতভাগা দুলালের—।

হঠাৎ একটা অমানুষিক ক্রুদ্ধ চীৎকারে ভোর রাত্রির নিথর স্তব্ধতা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আখড়ার ঘন বৃক্ষপল্লবের মধ্যে কয়টা পাখী পাখা ঝটপট করিয়া উঠিল সেই শব্দে; ব্রজদাসীর ঘরের চাল হইতে একটা টিকটিকি সন্তবতঃ চকিত হইয়া মাটিতে ঝপ করিয়া পড়িয়া গেল। ব্রজদাসী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল—দুলাল!

আখড়ার ঠিক নিচে ডাহুকী নদীর নালাটায় সাঁতার জল; সেখানে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ উঠিতেছে। ওই ছোট নালাটার মধ্যে যেন সমুদ্র মন্থন চলিতেছে। ঘরের কোণে হ্যারিকেন আলোটা দুলাইয়া জ্বালিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে; ব্রজদাসী লণ্ঠনটা তুলিয়া দম বাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।—দুলাল!

নালাটায় নামিবার জন্য আখড়ার একটি ছোট বাঁধানো ঘাট আছে। ঘাটের মাথায় গিয়া ব্রজ দাঁড়াইল। কিছুই দেখা যায় না, জলটায় উথল-পাতাল চলিতেছে। হঠাৎ জলের উপর মাথা তুলিয়া দুলাল আলোর ছটা দেখিয়াই বোধ করি চীৎকার করিয়া বলিল—ছোরা, ছোরাটা আন মা! জলদি!

—দুলাল—

—আঃ! ছোরা, আমার ছোরাটা জলদি। কুমীর। ধরেছি বেটাকে আমি কায়দা ক'রে।

দুলাল ঘাটে আসিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁধে কুমীরটা কামড়াইয়া আছে। দুলাল তাহাকে চিৎ করিয়া বগলে চাপিয়া ধরিয়াছে। ছোট মেছো কুমীর। কিন্তু তবুও কুমীর। ব্রজ কাঁপিতে কাঁপিতেই ছুটিয়া গিয়া দুলালের ছোরাটা আনিয়া ঘাটে নামিয়া গেল। দুলাল তখন সেটাকে মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিয়া হাঁটু ও হাত দিয়া টিপিয়া ধরিয়া আছে; সরীসৃপ-গুলো চিৎ হইয়া পড়িলেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে, লেজটা দিয়া আছাড় মারিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে।

দুলাল হাত বাড়াইয়া বলিল—দে।

ছোরাটা লইয়া সরীসৃপটার গলার নিচে বসাইয়া দিয়া লম্বা করিয়া পেটের দিকে টানিয়া দিয়া দুলাল লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া—আ—প্ বলিয়া আবার একবার হাঁক মারিয়া উঠিল। মাথাটা ঝাড়িল, লম্বা চুলগুলা ছোট ছোট জটার মত ঝাপট খাইয়া দুলিয়া উঠিল। কাঁধের ক্ষতস্থান হইতে গাঢ় লালরক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

ব্রজর হাত-পা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে।

দুলাল ব্রজর হাত হইতে লণ্ঠনটা লইয়া তুলিয়া ধরিয়া কি যেন দেখিল, তাহার পর বলিল—ঠিক আছে। ওই গিয়ে লেগেছে বাঁকের মাথায়।

একটা বাঁকের বাঁশের দুইপ্রান্তে সরু দড়িতে গাঁথা গোটা বিশেক পাকা তাল। জন্মাষ্টমীর দিন আখড়ায় উৎসব। এ আখড়ার শ্রেষ্ঠ উৎসব। দুলাল রাতদুপুরে উঠিয়া তাল কুড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে এই বিপদ। সাধের বিপদ।

লোকেও বলিল—ব্রজদাসীও অস্বীকার করিতে পারিল না। নিজেকেও ব্রজদাসী ধিক্কার দিল। কেন সে দুলালকে তালের জন্য তিরস্কার করিয়াছিল। আগের দিন ভোরবেলা দুলাল মটরবাসের কাজে বাহির হইবার জন্য সাজিতেছিল—সেই সময়টিতে ব্রজ স্নান সারিয়া দাওয়ায় উঠিয়া বলিয়াছিল—আচ্ছা দুলাল, আমার কি সব পণ্ডশ্রম হ'ল রে! আমার জীবনের সব ঘিটাই আগুন মনে করে কি ভস্মে ঢাললাম রে!

ভ্রূ কুঁচকাইয়া দুলাল বলিল—কেন? কি হ'ল কি?

—কাল না জন্মাষ্টমী? তোকে না বলেছিলাম—দুলাল, বারোটা মাস তিরিশ দিন যা

করিস বৈষ্ণবের ছেলে হয়ে জন্মাষ্টমীর সময় দুটো দিন ওসব লোহালক্কড় ঘাঁটতে যাস না। কত লোক আসবেন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভক্ত মহান্ত সন্ন্যাসী আসবেন এখানে, তার উদ্যোগ আছে আয়োজন আছে—

—বাজে বকিস না বাপু। উয্যুগ তো গোটাকতক তাল আর তেল ময়দা চালগুঁড়ো। তেল ময়দা দোকানে মিলবে—তালও চাইলে লোকে দেবে, চাল গুঁড়ো করে নে। ব্যাস—ভারি জন্মাষ্টমী—তাতে আবার কাজ কামাই!

—দুলাল! কি বলছিস? জিভে তোর আটকাচ্ছে না?

—না।

—ওরে হতভাগা, ওরে পাষণ্ড, ওরে নাস্তিক! আমি মরলে যে তোকেই এসব করতে হবে রে!

—না। ওসব আমি করব না। কুড়োজালি নিয়ে—বাঘা ছাপ কেটে—ও আমার দ্বারা হবে না।

—মরে যা। মরে যা। তুই মরে যা।

—তুই মরে যা। তুই মরে যা। তুই মরে যা। আমি মরব কেন?

—তাই মরব।

—হ্যাঁ—তাই মরে থাকিস। আমি ফিরে এসে রাতে তোকে সামাজ দেব—দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে যাব। নিশ্চিন্দি।

—চলে যাবি? আমার গোপালের কি হবে?

—হবে—ওই মাটির ডেলা নাড়ু হাতে ধরে যেমন আছে—তেমনি ধরে থাকবে। আর মহান্তর অভাব হবে না। জমি আছে আখড়া আছে—গাঁয়ের লোকে ভোগ দেয় ভক্তি করে—কত জনা ছুটে আসবে।

সে আর কথা না বলিয়া কাঁধে হালফেশানী ঝোলাটা ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঝোলাটার মধ্যে দুলালের হরেক রকম জিনিস থাকে। ঝোলাটায় হাত দিতে দুলালের নিষেধ আছে। সে বলে, তোর ভাঁড়ারে আমি তো হাত দিই না, আমার ভাঁড়ারে তুই হাত দিবি কেন। হাত দিতে যাস না—বলে দিলাম।

—কি বললি? দুলালের মুখের দিকে ব্রজদাসী একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, সে দৃষ্টি বাহ্যতঃ প্রশান্ত স্থির—কিন্তু অতল জল দহের মত গভীর; দুলাল না হইয়া অন্য কেহ হইলে দৃষ্টির সে গভীরতা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিত। দুলাল শিহরিয়া উঠে না—সে বলে—এমন ক'রে তাকিয়ে থেকে কি হবে বল?

ব্রজদাসী নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় দেবপূজার কাজে। থাক, জানিয়া তাহার কাজ নাই, জানিতে সে চায় না, কখনও জানিতে চাহিবে না। মধ্যে মধ্যে সে ক্ষোভের হাসি হাসে; তোর টাকাকড়ি যা আছে তোরই থাক, সে ব্রজদাসী চায় না! গোপালের অনুগ্রহে তাহার অভাব কিছুর নাই!

সেদিন সন্ধ্যায় দুলালের ফিরিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া ব্রজ খানিকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইলেই—দুলালের কর্কশ কণ্ঠের গানের সাড়া মাঠ হইতে ভাসিয়া আসে। প্রায় পোয়াখানেক দূরে মোটা কর্কশ গলায় দুলাল গাহিলে ব্রজ আখড়ায় বসিয়া শুনিয়া উনান ধরাইয়া ভাতের জল বসাইয়া দেয়। দুলাল বাড়ী ফিরিয়া ওই নালার ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিয়া স্নান করে—আধঘণ্টা ধরিয়া লম্বা চুলগুলি আঁচড়ায়, তারপর মায়ের

হাতের তৈয়ারী খাঁটি ঘি মাখিয়া গরম ভাত খায় আর বলে—এইটি পৃথিবীতে আর কেউ করবে না, এই গরম ভাত আর ঘি—আঃ, এ যেন অমৃতি!

ব্রজদাসী বলে—আমার কর্মফল আর তোর কপাল, বুঝলি! নইলে ঘরে যার মাখনচোরা ননীগোপাল—তার ঘরের ছেলে হয়ে তুই এক কড়ি ঘি ভাত খেয়ে বলছিস—অমৃতি! তোর যদি সুমতি হ'ত—তবে গোপালের প্রসাদ ছানা-ক্ষীর-মাখন—এ যে তুই দু'বেলা খেতিস বাবা!

যাক্ সে সব কথা।

ব্রজদাসী দুলালের গানের সাড়া না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল, ব্রজ আসিয়া আখড়ায় ঢুকিবার পথের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ কৃষ্ণা সপ্তমী, চৌদ্দদণ্ড পরে চাঁদ উঠিবে। এই দণ্ড দুয়েক আগে প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকিয়াছে, পেঁচাগুলো চেঁচাইয়া একপাক উড়িয়া গাছ বদল করিয়াছে, এখন রাত্রি সাড়ে আটদণ্ড কি নয় দণ্ড হইবে; চারিদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার; তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া ব্রজ নিরুপায় হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনে মনে আপসোস করিতেছিল—মহেশ মণ্ডলকে কেন বলিল না! আখড়ায় সন্ধ্যায় গ্রামের প্রবীণেরা আসে অল্পবয়সীও আসে; আখড়ায় নামগান হয়; প্রথমে হয় নাম-সংকীর্তন, তারপর গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এই আখড়ার সবচেয়ে বড় ভক্ত বড় সহায় মহেশ মণ্ডল খোল লইয়া বসিয়া বলে—আজ মা-জী একখানি নয়, দুখানি পদ গাইতে হবে।

ব্রজদাসী বোষ্টুমীর যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি পদাবলী সঙ্গীতে পারদর্শিতা। বড় বৈষ্ণব ভক্তের কাছে তাহার গান শিখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

মহেশ মণ্ডল খোল বাজায়, ব্রজদাসী পদাবলী গায়।

এই কিছুক্ষণ আগে—দণ্ড তিনেক আগে মজলিস ভাঙিয়াছে—তাহারা উঠিয়া গিয়াছে; মণ্ডল তাহার পরেও কিছুক্ষণ ছিল। জন্মাষ্টমীর আয়োজনের কথা বলিয়া সমস্ত কিছুর ভার লইয়া বাড়ী গিয়াছে।

মণ্ডল একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল—দুলাল ফিরবে কখন?

—পঁহর পার হবে—আর ফিরবে। গানে সাড়া উঠল বলে। ষাঁড়ের মত চেঁচাতে চেঁচাতে আসবে। ব্রজ হাসছিল। সম্ভবতঃ বেদনার হাসি।

মহেশ মণ্ডলও একটু লজ্জিত হইয়া হাসিল।

ব্রজ বলিয়াছিল—আপনি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন মোড়ল। আমার অদৃষ্ট!

মহেশ বলিয়াছিল—আমি বুঝিয়ে বলব ওকে একদিন।

—না। দৃঢ় কণ্ঠে ব্রজ জবাব দিয়াছিল।

মহেশ মণ্ডল আর ও কথাই তুলিল না, জন্মাষ্টমীর কথায় ফিরিয়া আরও দুই চারিটা কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আঃ—ব্রজ যদি তখন মণ্ডলকে বলিত সে আসুক—একটু বসুন আপনি! তাহা হইলে আর এমন উৎকণ্ঠার বোঝা বুকে লইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত না।

ঠিক এমনি সময়ে একটা বোঝা মাথায় করিয়া দুলাল ফিরিয়াছিল।

ঘি-তেল-ময়দা-চালগুঁড়া দোকান হইতে কিনিয়া মাথায় করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সমস্ত লইয়া ওজন পনের-বিশ সের হইবে। ষোল বছরের দুলাল দুই তিন ক্রোশ পথ এই বোঝা

বহিয়া আনিয়াছে। মানগোবিন্দপুরের বাজার এখান হইতে পাকা দুই ক্রোশ পথ।

বোঝাটা নামাইয়া দুলাল বলিয়াছিল—এই নে। তোর গোপাল কত খাবে খাক। এক ঘুমের পর উঠে ওই চাঁদ রায়ের দীঘির পাড়ের তাল এক বোঝা কুড়িয়ে এনে দোব।

ব্রজ খুশী হইয়াছিল।

দুলাল তাহার উপার্জন করিয়া গোপালের ভোগের জন্ত এত সামগ্রী কিনিয়া আনিয়াছে—ইহাতে তাহার আনন্দ হৃদয় ছাপাইয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল। ইচ্ছা করিতেছিল সকলকে ডাকিয়া দেখায়। মহেশ মণ্ডল মহাশয়কে ডাকিয়া দেখাইবার ইচ্ছা যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্বরণ করিতেই হইল। দুলাল বলিল—ঘাড়টা একটু টিপে দে ত মা। ওঃ—অভ্যেস নাই, বইতে গিয়ে দম বেরিয়ে গিয়েছে।

চাঁদ রায়ের বাঁধের তাল এ অঞ্চলে বিখ্যাত। কিন্তু গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে চাঁদ রায়ের বাঁধে রাত্রে কেহ তাল কুড়াইতে যায় না। ওখানে যাইতে হইলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই ভরা নালাটা পার হইতে হয়, তাহার উপর চাঁদ রায়ের বাঁধের দক্ষিণ পাড়ের জঙ্গলটার নামই হইল বাঘতলার জঙ্গল; গত একশত বৎসরের মধ্যে দুই-দুইবার এ অঞ্চলে বাঘ আসিয়াছিল এবং দুই-বারই ওই একই জায়গায় বাসা গাড়িয়াছিল। বাঘ অবশ্য রোজ আসে না এবং আসিলে মানুষের অজানা থাকে না, ডাক দিয়া সে জানাইয়া দেয়, গরু, ছাগল মারিবার সময় দেখাও দেয়, রাত্রে কেউ ডাকে, বাঘের গায়ের বোটকা গন্ধ বেশ খানিকটা দূর হইতেই পাওয়া যায়; তবুও গ্রাম্য মানুষেরা বলে—"বাবা সাবধানের বিনাশ নাই। কাজ কি গিয়ে রাত্রিকালে? মনে কর, সনদে পর্যন্ত বাঘ আসে নাই, কিন্তু সনদের পর যে আসবে না তা কে বললে? এই তো আট কোশ তফাতে গঙ্গা আর ময়ূরাক্ষী মিশেছে, সেখানে ঝাউবনে বাঘের তো বারো মাসের বাসা; বর্ষার সময় ঝাউবন জলে ডুবলে এদিক ওদিক ছটকে বেরোয়। সনদের পর বেরিয়ে আট কোশ রাস্তা আসতে কতক্ষণ ওদের কাছে? এক লাফে কমসে কম দশ হাত তো মারবেই!"

বাঘের পর সাপের ভয়ও আছে। কিন্তু রাঢ়ের এ অঞ্চলটায় মানুষ সাপকে ভয় করে না; প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ এবং সাপে প্রায় একসঙ্গেই বাস করিয়া আসিতেছে। গ্রামে যেমন কুকুর বিড়াল থাকে, গৃহস্থের আঙিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সাপও ঠিক তেমনি। ভয় করে না—কিন্তু তা বলিয়া রাত্রে বন জঙ্গল মাঠের মধ্যে লোকে সাধ করিয়া যায় না।

চাঁদ রায়ের বাঁধের বিখ্যাত তালগাছটা—তালের চারিটা আঁটি, প্রকাণ্ড বড়—যেমন তার মিষ্টতা—তেমনি প্রচুর মাড়ি অর্থাৎ রস। ভোর না হইতেই চারিপাশের পাঁচ-ছয়খানা গ্রামের ছেলেরা ছুটিয়া আসে। এবং প্রতিদিনই ছোট হোক বড় হোক—একটা মারামারি কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। সেই কারণে দুলাল তৃতীয় প্রহর রাত্রে উঠিয়া চাঁদ রায়ের বাঁধে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল। ব্রজদাসী তাহাকে বার বার বারণ করিয়াছিল—এই দেখ চাঁদ রায়ের বাঁধে যেন যাবি না!

দুলালের মধুমাখা বাক্য! সে তাহার মোটা নাকটা তুলিয়া দাঁতগুলা বাহির করিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিয়াছিল—আচ্ছা!

—আচ্ছা নয়, মনে থাকে যেন!

উত্তরে আর একবার আগের মত মুখভঙ্গি করিয়া টর্চ এবং বাঁকটা লইয়া সেই মধ্যরাত্রে গোটা গাঁয়ের ঘুম ভাঙাইয়া মোটা গলায় গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। যেমন দুলাল—তেমনি তার গান; কি যে ঐ গানের অর্থ ব্রজদাসী তাহা বুঝিতে পারে না। শুধু আতঙ্কিত

হইয়া শরীর মন শিহরিয়া উঠে। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া একটা কলি নিস্তব্ধ রাত্রিকে আলোড়িত করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল, একটা কলি গাহিতে গাহিতেই দুলাল চলিতেছিল—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা!

শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া ব্রজ হাসিয়াছিল—আগুন জ্বালাইয়া ব্রজদাসীকে পুড়াইয়া খাক করিলি—আর কেন? আরও আগুন জ্বালাইতে সাধ! কাহাকে পোড়াইবি হতভাগা? নিজেই পুড়িয়া মরিবি। থাক—আর থাক, আর আগুনে কাজ নাই। তার পর বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিল দুলালকে লইয়া তাহার দুর্ভোগের কথা। হঠাৎ চীৎকার উঠিল, একটা অমানুষিক ক্রুদ্ধ চীৎকার। ব্রজ মুহূর্তে উঠিয়া বসিল। চীৎকার করিয়া উঠিল—দুলাল!

* * * *

লণ্ঠনের আলোয় দুলালের দিকে আতঙ্ক এবং বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিতেছিল। রক্তাক্ত দেহে দৈত্যের মত দুলাল দাঁড়াইয়া আছে। নিজের ক্ষতের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—পেট চেরা কুমীরটার মৃত্যু-আক্ষেপ দেখিয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে। ছোট একটা মেছো কুমীর! কিন্তু ছোট হইলেও কুমীর। তাহার শক্ত মোটা কাঁটা-ভরা লেজটা আছড়াইয়া ঘাটের বাঁধানো ঠাঁইটুকুকে যেন চুরমার করিয়া দিবে। গলা হইতে লেজের গোড়া পর্যন্ত পেটটা চিরিয়া দিয়াছে দুলাল। রক্তে ঘাটটা লাল হইয়া গিয়াছে। কতক্ষণ পরে ব্রজদাসীর মনের সাড় ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া দুলালের হাত ধরিয়া বলিল—দেখি দেখি!

—কি?

—তোর কাঁধ বেয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে, পিঠটা যে ভেসে যাচ্ছে!

তাচ্ছিল্যভরে দুলাল বলিল—বেটা আমাকে কাতলা মাছ মনে করেছিল। শা—লা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! বেটার ময়ূরাক্ষীতে পেট ভরে নি, 'ডাউকিতে' এসেছিল, সেপানে সুবিধে হয় নি, এসেছ এই 'বাউকি'তে—তাও দুলালের ঘাটে! হুঁ—হুঁ বাবা হামারা নাম বিরিজ ননদন—ডাণ্ডা চলে মেরা দনাদন্—দনাদন্! খচ্ করে কামড়ে ধরলে বেটা। ওপারে যেই জলে পড়েছি—অমনি বেটা কোথা ছিল—শুঁসিয়ে এসে ধরলে কাঁধে। ছামনে পড়েছিল—তাই পিছন থেকে পায়ে ধরলে কায়দা করত আমাকে।

—উঠে আয়!

—দাঁড়া। এ বেটাকে নিয়ে যাব। বেটার চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হবে—

—দুলাল—ওসব অনাচার করিস না। রাত পোয়ালে জন্মাষ্টমী, গোপালের সেবার আখড়া—

—আচ্ছা—আচ্ছা। বাইরে রেখে দোব। সকালে হুই গাঁয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে—যা করবার করব।

সে দুই হাতে কুমীরটাকে তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল।

ব্রজদাসী শঙ্কিত হইয়া প্রায় চীৎকার করিয়া ডাকিল—কি হল? দুলাল?

দুলাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—কিছু না। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—ধর দিকিনি!

কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বেটা বেশ জখম করেছে। খুব রক্ত পড়েছে, নয়? চল উপরে চল! আখড়ায় উঠিয়া আসিয়া দাওয়ার উপরেই সে শুইয়া পড়িল।

ব্রজদাসী শুকনা কাপড় আনিতে ঘরের ভিতর গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—দুলাল!

দুলাল সাড়া দিল না।

—দুলাল! ব্রজদাসী তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল।

দুলাল তখন জ্ঞান হারাইয়াছে।

দুই

রাঢ়ের উত্তরাঞ্চল। ময়ূরাক্ষীর একটি শাখানদী নাম ডাহুকী; ডাহুকীর ক্রোশখানেক উত্তরে একখানি চাষীর গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়া ডাহুকীর চেয়েও ছোট একটি প্রবাহিণী বহিয়া গিয়া পড়িয়াছে ডাহুকীতে। ওটার নাম 'বহুকী'—লোকে বলে বউকী। বউকীর একেবারে কূলের উপর আখড়াটি।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—কালই বলবান। কালের গ্রাসে সবই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদুপতির সে সমৃদ্ধ মথুরাপুরীও নাই, রঘুপতি রামচন্দ্রের সে অযোধ্যাও আজ মাটির তলায়, মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

মানগোবিন্দপুরের বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাস বাবাজী কিন্তু হাসিয়া বলেন—আছে বাবা আছে। মথুরাপুরীও আছে ব্রজধামও আছে, আযোধ্যাও আছে। বাইরে নাই ভিতরে আছে। মানুষের মনের পৃথিবীতে আছে বাবা। আমি তো বাবা যখন ব্রজদাসীর এই ধামটিতে ঢুকি—আমার মনে হয় নন্দমহারাজের পুরীতে এসে ঢুকলাম।

একটু হাসিয়া বলেন—মনে হয় নন্দমহারাজ বুঝি কোথাও গিয়েছেন—হয়তো নবলক্ষ গোধনের গো-শালা তদারক করছেন—কি বিচুলি কাটাচ্ছেন—যশোমতী একা পুরীর মধ্যে গোপালের ভাবনায় ভোর হয়ে বসে আছেন।

ব্রজদাসী মানুষজনের সম্মুখে লজ্জা পায়। তাহার সুন্দর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠে। কেহ থাকিলে সে হাতজোড় করিয়া বলে—প্রভু এ-বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় আমাকে বলে দেন। আমি বুঝতে পারছি—আমি ডুবেছি।

—না ব্রজদাসী তুমি উঠছ।

—না। আমার পরকাল গিয়েছে বাবাজী। ইহকালও যেতে বসেছে। আমাকে আপনি মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন। দুলাল আমার কাল—সকল কাল খেয়ে আমাকে অকূল পাথারে ডুবিয়ে দিলে।

জন্মাষ্টমীর দিন নরোত্তম বাবাজীর কাছে এই আবেদন জানাইতে গিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইয়া গেল। বলিল—এই দেখুন! এই দেখুন! এ আমি কি করব বলুন!

দুলাল যন্ত্রণায় এবং জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিল।

—তাই তো ব্রজ; জ্বরে যন্ত্রণায় এ যে বেহুঁস। জন্তু-জানোয়ারের দাঁতে নখে বিষ আছে। ডাক্তার ডেকে দেখানো উচিত মনে হচ্ছে। আমি মহেশকে বলি—সে ডাক্তার ডাকুক, মানগোবিন্দপুরের সুধীর ডাক্তারকেই খবর দিক। আর—

ব্রজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নরোত্তম দাস বাবাজীর মুখের দিকে চাহিল।

বাবাজী বলিলেন—জন্মাষ্টমীর আয়োজন আমরাই পাঁচজনে করে নিচ্ছি। তোমার মন আজ চঞ্চল হয়ে রয়েছে—তুমি দুলালের কাছেই বসে থাক। ওর কাছে একজন কারুর থাকা দরকার। কাজ করবার লোকের তো অভাব নেই।

তা নাই।

জন্মাষ্টমী-পর্বে গোবর্ধনপুরের এই গোপালের আখড়ায় সমারোহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু মহান্ত অনেকে আসিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর এই আমলেও এই অঞ্চলটিতে প্রাচীন কালের জীবনসঙ্গীত জাগিয়া উঠে খোলকরতালের ধ্বনিতে—নাম-সংকীর্তনের সুরের মধ্যে। বারো বৎসর এই গোপালের আখড়ার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বারো বৎসরের প্রতি জন্মাষ্টমীতেই উৎসব হইয়া আসিতেছে। ইহার আগে জন্মাষ্টমীর উৎসব হইত মানগোবিন্দপুর নরোত্তম দাস বাবাজীর আখড়ায়। নরোত্তম দাস বাবাজীই গোবর্ধনপুরের আখড়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহেশ মণ্ডল বাবাজীর শিষ্য—সে-ই আখড়ার ঘরদুয়ার করিয়া দিয়াছে—কিছু জমিও দিয়াছে। আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়া গোপালের সেবা পরিচালনা করিবার জন্য ব্রজদাসীকে আনিয়া আখড়ার সকল ভার অর্পণ করিয়াছেন। ব্রজদাসীই জোড়হাত করিয়া বাবাজীকে বলিয়াছিল—প্রভু—জন্মাষ্টমী তো নন্দপুরের উৎসব, বংশীবটেরও নয়, কদম্বতলেরও নয়, রাধা-মাধবের কুঞ্জগৃহেরও নয়, মথুরাপুরের তো নয়ই। আপনার এ আখড়া তো তাই। বংশীধারীর শ্রীমতীকে বামে নিয়ে অধিষ্ঠান এখানে। এখানে মা যশোদা গোপালকে কোলে নিয়ে বসবেন—কোনখানে—কোন্ মুখে? শ্যামের কি আমার লজ্জা হবে না?

নরোত্তম দাস বাবাজীর সাধক জীবন বিচিত্র। তিনি জন্মবৈষ্ণব নন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম;—শিক্ষায় দীক্ষায় প্রথম বয়সে উগ্র আধুনিক, উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া মানগোবিন্দপুরে এক আখড়া করিয়া সেইখানে বৈষ্ণব সাধনায় বসিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া বসিবার পর হইতেই এ অঞ্চলের বৈষ্ণব পর্ব-পার্বণগুলি বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটাই অবশ্য বৈষ্ণবভাবের দেশ। অজয়ের কূল ধরিয়া পশ্চিমে জয়দেব কেঁদুলী হইতে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অঞ্চলটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিয়া নবদ্বীপে শচীমায়ের কোলে গৌরতনু শিশুর আবির্ভাব যেদিন হয়—সেদিনও মানুষ বুঝিতে পারে নাই এই শিশুর পদরেখা ধরিয়া নূতন ভাব ভাগীরথী উদ্ভূত হইয়া গোটা দেশটা ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু অজয়ের কূলের এই অঞ্চলের সাধক কবি তাহার বহুকাল পূর্বে ধ্যান-কল্পনায় এ প্লাবন যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—দেখিয়াছিলেন মাটিতে চাঁদ নামিয়া আসিল—জ্যোৎস্নায় পৃথিবী সত্য সত্যই ভাসিয়া গেল। নানুরের সাধক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—'আজ কে গো মুরলী বাজায়—এ ত কভু নহে শ্যামরায়।' শুধু তাই নয় বৈষ্ণবভাবের নব অভ্যুত্থানের পর এখানে মহাজন ভক্ত দলে দলে যেন মিছিল করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। অজয়ের দশকোশের মধ্যে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর উত্তরে একচক্রা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। কাছাকাছি বীরচন্দ্রপুরকে লোকে বলে গুপ্ত বৃন্দাবন। এ অঞ্চলে প্রতি পাঁচখানি গ্রামে একটি করিয়া বৈষ্ণবের আখড়া। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালে ছাওয়ানো আখড়া; যদুপতির পাথরে গড়া বিরাট রাজপ্রাসাদ নয় যে, কাল ভাঙিয়া দিলে আর গড়া যায় না, সে ভাঙা পাথরের স্তূপই সরানো অসম্ভব হইয়া উঠে। মাটির আখড়া কাল ভাঙে—জলে গড়িয়া পড়ে, ইঁদুরে গোড়ায় গর্ত কাটিয়া তলাটা ফোঁপরা করিয়া দেয় তখন একদিন ধ্বসিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে ফাটে—ভাঙে, মানুষ ওই ভাঙা দেওয়ালেই জল ঢালিয়া কাদা করিয়া

আবার দেওয়াল দেয়, লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়া খড় বাঁশ মাথায় করিয়া আনে, দেওয়ালের উপর চাল তুলিয়া সযত্নে নিজের হাতে রাঙা মাটি দিয়া নিকাইয়া, আল্পনা আঁকিয়া মনোমন্দিরের অধীশ্বরকে হাত জোড় করিয়া বলে—আমার মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিত হও। নরোত্তম দাস বলেন —তাই তো বলি বাবা, মথুরাপুরীর ইট-কাঠ-পাথর ভেঙেছে কাল, মাটি চাপা দিয়েছে, আসল মথুরা যেমনকার তেমনি আছে। কালের সঙ্গে কালাচাঁদের খেলা চলেছে বাবা!

জন্মাষ্টমীর উৎসব লইয়া ব্রজদাসীর কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তাই হবে। যশোমতী যেখানে গোপালকে নিয়ে গরবিনীর মত বসে থাকেন—সেই পুরীতেই হবে জন্মাষ্টমীর পালন।

তিনি একটু হাসিলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। ব্রজদাসী লজ্জিত হইয়া মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়াছিল; বলিয়াছিল—ও কথা বললে আমি লজ্জা পাই প্রভু।

—না। ঘাড় নাড়িয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আনন্দ যখন হৃদয় ছাপিয়ে পড়ে ব্রজদাসী—তখন এমনি এক-একটা মধুর ভাবের রূপ নিয়ে বাইরে প্রকাশ পায়। কখনও লজ্জা—কখনও বিনয়—কখনও কিছু। তুমি ব্রজদুলালের মা যশোদা—তোমার গোপালের আখড়াতেই তো জন্মাষ্টমীর সত্য ক্ষেত্র; তাই হবে।

তখন হইতে এই বারো বৎসর ধরিয়া এই আখড়াতেই জন্মাষ্টমীর সমারোহ হইয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব মহান্তেরা আসেন—সারাদিন থাকেন—সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া যান—আপন আপন আখড়ার পার্বণ পালনের জন্য। দুপুরে ব্রজদাসী কীর্তন গায়। এ সজ্জন সমাগমের প্রধান আকর্ষণ ব্রজদাসীর গান।

* * * *

নরোত্তম বাবাজী বলিলেন—তুমি দুলালের শিয়রে বসে থাক। কাজ করবার লোকের অভাব হবে না।

ব্রজদাসী বসিয়াই ছিল। দুলাল কাতরাইতেছে।

ভাদ্রমাস, পল্লীগ্রামে বলে পচা ভাদর, এ সময়ে যত মাছি—তত মশা। ভন ভন করিয়া মাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুলালের পায়ে বসিয়া তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিতেছে। ব্রজদাসী উঠিয়া গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। অন্ধকার ঘরে বসিয়া থাকিতে তাহার কান্না পাইল। দুলাল যদি না-বাঁচে!

মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলিয়া লইয়া দুলালকে সে কোলে পাইয়াছে।

ষোল বৎসর পূর্বের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

অপরূপ একটি সুখনীড়।

হঠাৎ সে নীড় তাহার ভাঙিয়া গেল। তাহার বৈষ্ণব তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তাহার বয়স আটাশ। কৈশোরে যৌবনে—যে রূপ তাহার ছিল সে রূপে তখন মালিন্য পড়িয়াছে। এই অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৈষ্ণবী যুবতী ঘরে আনিয়া তুলিল। লজ্জায়-অভিমানে ধিক্কারে ক্ষোভে সেও ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কোথায় বাহির হইয়াছিল—তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। পথে বাহির হইয়া চলিয়াছিল। পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছিল। গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। গান ছিল মূলধন। গান শুনিয়া লোকে কাঁদিত, তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না, বলিত—আর একখানা গাও। ব্রজদাসী না বলিত না, আবার গান ধরিত, গান শেষ করিয়া বলিত—এইবার আসি।

গৃহস্থের গৃহিণী-বধূ-কন্যা সকলের সমস্বরে সস্নেহে নিমন্ত্রণ জানাইত—আবার এসো যেন।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিত—আসব, ফেরবার সময় আসব মা।

—কবে? কবে ফিরবে?

—কালও ফিরতে পারি, আবার দেরিও হতে পারে।

—যবেই ফেরো, এসো যেন।

—আসব বৈ কি। আপনাদের দোরই যে আমাদের ভাণ্ডার মা।

গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া গ্রামান্তরে প্রবেশ মুখে এদেশের ছায়াঘন পুষ্করিণীর ঘাটে নামিয়া মুখ হাত ধুইয়া বিশ্রাম করিত; দুপুর হইলে কাঠ কুটা কুড়াইয়া ইট বা মাটির ঢেলা দিয়া উনান পাতিয়া ছোট পিতলের বক্‌নো চড়াইয়া দিত। ঝুলিতেই থাকিত ভাণ্ডার। ন্যাকড়ার খুঁটে বাঁধা নুন, কয়েকটা লঙ্কা, শিশিতে তেল, ভিক্ষার চাল, দুইটা আলু একটা বেগুন। রান্না চড়াইয়া সে ভাবিত অদৃষ্টের কথা। অতীত কালের কথা স্মরণ করিত—চোখ দিয়া জল গড়াইত। গুন গুন করিয়া আপন মনেই গান করিত—

সখি বলিতে বিদরে হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া!

রাত্রে সজ্জন গৃহস্থবাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া রাত্রি কাটাইয়া—আবার প্রভাতে যাত্রা শুরু করিত। পথে হাটবাজার পড়িলে সেইখানেই আসর পাতিয়া বসিয়া যাইত। চারিপাশে ভিড় জমিত। নানা জনে নানা কথা বলিত। কুৎসিত ইঙ্গিত অশ্লীল মন্তব্য। কিন্তু সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গান ধরিত—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন
এ দুটি নয়নতারা।

গাহিতে গাহিতে সে গানের মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া দিত।

গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া
শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া।

গানের মহিমায় মানুষগুলির মনে উচ্ছৃঙ্খলতা, কুৎসিত লালসা আপনিই শান্ত হইয়া আসিত। ভাবান্তর ঘটিত। মুহূর্তপূর্বে যাহারা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহারাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত, যাহারা অশ্লীল মন্তব্য করিয়াছিল—তাহারাই বলিত—আহা-হা! ভণিতায় আসিয়া মহাজনের নাম উচ্চারণ করিয়া সে যখন কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম জানাইত—তখন তাহারাও তাহার সঙ্গে প্রণাম জানাইত।

কোন কোন শ্রোতা তারিফ করিয়া বাহবা দিত—বাঃ বাঃ! চমৎকার!

মধুর হাসিয়া সে নমস্কার জানাইয়া বলিত—আপনাদের দয়া প্রভু!

রসিকজনে ইহার পরও বলিত—বাঃ—বষ্টুমীর গান যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমন মিষ্টি।

সে আরও একটু মিষ্টি হাসিয়া মাথার থানকাপড়ের অবগুণ্ঠন আরও খানিকটা দিয়া বলিত—বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু!

বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে আবার সে পথ চলিত।

হঠাৎ একদিন এক গাছতলায় বসিয়া তাহার কান্না পাইল। এমন করিয়া সে আর কত ঘুরিবে?' এমন করিয়া কি ঘোরা যায়? ঘরে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া মনের ক্ষোভে সে পথে বাহির

হইয়াছিল—কিন্তু সে পথও যে আর সহ্য হইতেছে না! মনের ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া আসিয়াছে। তবে?

কোথায় যাইবে সে?

দিনে বিশ্রামের ক্ষণে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিত, রাত্রে অন্ধকারে চোখ চাহিয়া সে ভাবিত—কোথায়—কোথায় যাইবে সে?

অকস্মাৎ একদিন যেন সে ডাক শুনিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল—সে বৃন্দাবন যাইবে। মনে মনে নিজেকেই বলিল—হায় রে পোড়া কপাল আমার! কোথায় যাইব এ কথা নাকি ভাবিতে হয়!

জয় রাধাগোবিন্দ! বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সময়টা ছিল মধ্যরাত্রি। বেশ মনে আছে। গৃহস্থবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল সেই মুহূর্তেই পথে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা পারে নাই! গৃহস্থবাড়ী—গৃহস্থ দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে, সে দরজা খুলিয়া যাইবে কি করিয়া? চোর বদমাসের কথা দূরে থাক—দরজা খোলা পাইয়া কুকুর বিড়াল ঢুকিলে অনিষ্ট হইবে—সে অপরাধের দায় যে পড়িবে তাহার উপর! সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কত কল্পনা করিয়াছিল।

পদব্রজেই সে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে।

দেবতার চরণে গিয়া গড়াইয়া পড়িবে। জয় রাধাগোবিন্দ! নিজেকে সে বিসর্জন দিবে। গুনগুন করিয়া গাহিয়াছিল—

কি আর বলিব আমি!
তোমার চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।

কথা মনে করিতে করিতে হাসি পাইল ব্রজদাসীর। উপহাসের হাসি! নিজেকেই উপহাস করিল সে। যেমন তাহার সংকল্প তেমনি তাহার কপাল। পায়ে হাঁটিয়াই যাত্রা শুরু করিয়াছিল। কি সে তাহার উৎসাহ! সকল দুঃখই যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য ভাঙা ঘরের জন্য ক্ষোভ জাগিত। কেন জাগিত কেমন করিয়া জাগিত সেদিন বুঝিতে পারিত না—আজ পারে। মনের পাপ! মনে পড়ে—একদিন এক গৃহস্থবাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। অপরূপ সুখের সংসার। কর্তা গিন্নী ছেলে বউ নাতিতে জমজমাট, হাসি কান্না রসিকতা তামাসা ঝগড়ায় বাড়ীটা অহরহ যেন সুখে কল্ কল্ করিতেছে। হাসিতে তো সুখ থাকেই, রসিকতা তামাসাও সুখেরই কথা—কান্না ঝগড়াও এ বাড়ীতে সুখের। মায়ে ছেলেতে, স্বামী স্ত্রীতে ছলনার কলহ, ছোট শিশুগুলিকে ধমক দিয়া কাঁদানো দেখিয়া সুখে আনন্দে তাহারও অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মনে আছে—ছেলের মুখখানি দুই হাতে নিজের মুখের সামনে ধরিয়া মা-কে ধমক দিতে দেখিয়াছিল—এ—রে ছে—লেঃ! এঃ—!

শিশুটি ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে মা হাসিয়া সারা হইয়া গোটা বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিল—দেখ গো—আমার ঠোঁট ফুলিয়া কান্না দেখ!

ঠিক এই সময়টিতেই গিন্নী উপর হইতে চীৎকার করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছিলেন—
—না—না—না! এ বাড়ীতে আমি জলগ্রহণ করব না।

পিছনে পিছনে ছেলে আসিতেছিলেন—সমান চীৎকার করিয়া সে বলিতেছে—জল যাবে না?

—না।

—খাবে না?

—না। না—না—না।

—আচ্ছা। আমার দোষ নাই তা' হলে।

—বড় খোকা! খবরদার!

—কিছুতেই না। আমি কোন কথা শুনব না।

—না। ভালো হবে না। বড় খোকা!

—তোমার ও চোখরাঙানিকে আর আমি ভয় করি না। বলিয়াই সে মাকে ছোট মেয়ের মত কোলে তুলিয়া লইল।—গোটা পাড়ায় তোমাকে ঘুরিয়ে আনব আমি, চীৎকার ক'রে বলব—"খুকী আমার রাগ করেছে—জল খাবে না গো! পথে ব'সে মাখবে ধুলো ঘর যাবে না গো!"

মা হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল—ওরে দুশমণ—ওরে দুষ্টু—ছাড় ছাড়। নামিয়ে দে; নামিয়ে দে! পড়ে যাব! মাথা ঘুরচে আমার!

ছেলে মায়ের কথা না মানিয়া পাক কয়েক বন বন করিয়া ঘুরিয়া লইয়াছিল—আনি-মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না!

নামাইয়া দিতেই মা ছোট্ট মেয়ের মত হাসিয়া সারা!

সেদিন রাত্রে তাহাদের দাওয়ায় শুইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারে না। সারারাত্রি নিজের দুঃখে কথাগুলি আপনি জাগিয়া উঠিয়াছিল, খাতকের ঘরে মহাজনের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ডাকিতে হয় নাই, তাড়াইয়া দিতেও পারে নাই।

পরদিন সকালে বিদায় লইবার সময় বধূটি বলিয়াছিল—আজ থেকে যাও।

—না মা!

—কেন? কাল কি কষ্ট পেয়েছ? অসুবিধে হয়েছে?

—কষ্ট? অসুবিধে? আমার? হাসিয়া ব্রজদাসী বলিয়াছিল—পৃথিবী যার অন্ধকার মা—তার আবার কষ্ট! না—কষ্ট নয়। কিন্তু অন্ধকারে আর থাকতে পারছি না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক মুহূর্ত পরে আবার বলিয়াছিল,—অকারণে বলিয়াছিল নিজের দুঃখের কথা—না বলিয়া যেন স্বস্তি পায় নাই, বলিয়াছিল,—চাঁদে গ্রহণ লাগে, রাহু এসে চাঁদকে গেলে, চাঁদ আবার মুক্ত হয়, কিন্তু যার কপালে চাঁদ নিজেই হয়ে যায় রাহু—তার কি আকাশপানে তাকিয়ে থাকলে চলে? তাকে তখন খুঁজতে হয়—কোথায় কোন্ জগতে আছে নতুন চাঁদ। আমি তাই চলেছি।

কথায় বাধা দিয়া এবার গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—কিছু মনে করো না বষ্টুমী, তোমার মুখের হাসি দেখে মনে হচ্ছে মা—চাঁদকে তুমিই গিলে খেয়েছ—তোমার ঠোঁটের হাসিতে যেন প্রতিপদের চাঁদ উঁকি মারছে! সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবী লজ্জা পাইয়াছিল। তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তবু সে দমে নাই। উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছিল। বলিয়াছিল—ও মা তোমার চোখের ভুল। চাঁদের হাটে তুমি বাস কর মা—কর্তা চাঁদ, ছেলে চাঁদ, নাতি চাঁদ,—তোমার কপালে চাঁদ—কোলে চাঁদ—আশে চাঁদ—পাশে চাঁদ; আমার ঠোঁটের হাসিতে যদি চাঁদের ফালিই দেখতে পেয়ে থাক মা—তবে সে চাঁদ নয়—তোমার চাঁদের ছটা বেজেছে সেখানে।

আমার প্রভু তোমার চাঁদের হাট অক্ষয় করুন মা, তোমার চাঁদের হাটের ছটা আমার হাসিতে ফুটে উঠেছে—সে আমার মহাভাগ্য মা। ওরই আলোতে পথ দেখে আমি চলে যাব

—সেই চাঁদের চরণতলে—যে চাঁদে গ্রহণ লাগে না, যে চাঁদের ক্ষয় বৃদ্ধি নেই। কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—আমার শ্যামচাঁদ—বৃন্দাবনের অক্ষয় পূর্ণিমার চাঁদ!

স্বামী পুত্র নাতি বধূ কন্যা লইয়া ভরা সংসার তুলিয়া কথা—রহস্যচ্ছলে বলিলেও বাংলা দেশের মেয়েদের সহ্য হয় না। কথাটা বলিয়া ব্রজ পরমুহূর্তেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে খঞ্জনীতে ধ্বনি তুলিয়া বলিয়াছিল—যাবার সময় গান গেয়ে যাই মা শোন!

"ও কাল কালিন্দী কূলে—ও কেলি কদম্ব মূলে—
ও সই—! এ কি অপরূপ কাল শশী!"

গান শেষ করিয়া—মার্জনা চাহিয়া—ভিক্ষা লইয়া সে উঠিয়া পডিয়াছিল, পাছে আরও কথা বাড়ে তাই বলিয়াছিল—যেতে যে হবে অনেক দূর মা! তার ওপর সময় নষ্ট কবা বারণও বটে।

—কোথায় যাবে? কত দূর?

—কত তা জানি না। তবে অনেক দূর। যাব বৃন্দাবন।

—বৃন্দাবন! সে কি?

—হ্যাঁ মা। সেই তো একমাত্র অক্ষয় চাঁদের পুরী! অন্ধকারে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি মা। সংসার আমার অন্ধকার!

মনে আছে বিদায় লইয়া সে সেদিন যতখানি তাহার শক্তি ততখানি দ্রুতপদে চলিতে শুরু করিয়াছিল। ঠিক যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছিল।

আজ সে বেশ বুঝিতে পারে সেই সুখের সংসারটি দেখিয়া ঈর্ষার তাড়নায় এমন নিজের দুঃখে কাতর হইয়াছিল, বৃন্দাবনের মুখে এমন করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া যায় নাই। ওই গৃহস্থ বাড়ীটি হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছিল। হয়তো ছুটিতে ছুটিতে একদিন বৃন্দাবনেই গিয়া উঠিত। কিন্তু—। মর্মান্তিক দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল ব্রজদাসীর মুখে।

পথের মধ্যে দুলাল তাহার বুক জুড়িয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ঝাঁপ দিয়া পডাই বটে।

তাহার মনে আছে একবার একটা গিরগিটি তাহার গায়ে পডিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় গাছ-তলা দিয়া চলিবার পথে অতর্কিতে একেবারে গাছের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া তাহার কাঁধের উপর পড়িয়াছিল। সে কি আতঙ্ক—সে কি অন্তরাত্মার চমক! যাহার এমন ভাবে কখনও কিছু পড়ে নাই সে মর্মান্তিক মুহূর্তের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ঠিক এমনি করিয়াই দুলাল তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সে কি দিন!

জংশন স্টেশনের লম্পট বাঙালী সাহেবকে মনে করিতে তাহার সমস্ত শরীর আজও হিম হইয়া যায়।

ভাবনায় ছেদ পড়িল ব্রজদাসীর।

ঘরের দরজা ঠেলিয়া নরোত্তমদাস বাবাজী প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল। মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সচেতন হইয়া বসিল।

বাবাজী বলিলেন, মৃদঙ্গ নোব। বরাবরই তো এ সময়ে কীর্তন হয়। এবার একবার নিয়ম-রক্ষাও তো করতে হবে। সুবলপুরের মহান্ত গাইবেন, ওকেই বললাম।

দেওয়ালের গালে সযত্নে কাপড় ঢাকিয়া খোলখানি তোলা থাকে। বাবাজী খোলখানি

নামাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। দরজা বন্ধ করিয়া দিতে ভুলিলেন না।

অন্ধকার হইয়া গেল ঘরখানা।

দুলাল একবার নড়িয়া চড়িয়া শুইল। সম্ভবতঃ আলোর ছটায় তাহার ঘোর ভাঙিয়াছিল। ব্রজ আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চঞ্চল হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। আজ জন্মাষ্টমী। এই আখড়া প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর হইতেই এই দিনটিতে সে দুপুরে পদাবলী গান করে। ভক্ত রসিকেরা শুনিয়া থাকেন। তাহার গোপাল শোনেন। এ বৎসর—! না সে হইবে না। শুধু তো তাহার নিজের অপরাধের কথাই নয়, দুলালের মঙ্গল অমঙ্গলও আছে যে। যে দুলালের মুখ চাহিয়া এই ভাবে সে বসিয়া থাকিবে—এই অপরাধের শাস্তি তাহাকে দিতে, যদি শাস্তিদাতা দুলালের উপর আঘাত হানেন! দুলালই যে তাহার জীবনমন্দিরের চূড়া! সোনার নয় পিতলের কলঙ্কবর্ণ লোহার চূড়াই বটে, কিন্তু বজ্রাঘাত হইলে যে চূড়ার উপরেই হয়!

ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুলালের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া সন্তর্পণে পাটের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আখড়ার উঠানে ছোট একটি আচ্ছাদন ইতিমধ্যেই তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। চারিপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া মাথায় আঁটি আঁটি খড় চাপাইয়া আচ্ছাদন প্রতি বৎসরই তৈয়ারী হয়। মহেশ মণ্ডলের তদারকে গ্রামের লোকেরাই এ কাজ করে। শুধু গোবর্ধনপুরের এই আখড়াতেই নয়, এ অঞ্চলের সকল আখড়াতেই এই ব্যবস্থা। আখড়ার সেবাইত মহান্ত যিনিই থাকুন আসল আখড়ার কর্তা যে গ্রামের লোকেই। আখড়া, শিবতলা, কালীতলা—এ সবের ভার গ্রামের লোকেই স্মরণাতীত কাল হইতে বহন করিয়া আসিতেছে। তাহার উপর মহেশ মণ্ডলের মত মানুষ যে গ্রামের মণ্ডল সে গ্রামের এসব কাজ এমন নিখুঁত ভাবে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। ব্রজ দেখিল, বাঁশের খুঁটিগুলিতে দেবদারু পাতা দিয়া মুড়িয়া দিতে পর্যন্ত ভুল হয় নাই। আমের শাখা গাঁথা লম্বা খড়ের দড়ি টাঙানো হইতেছে, উঠান ব্রজদাসী কাল সন্ধ্যাতেই নিকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপর আলপনা দেওয়াও হইয়া গিয়াছে, কে দিয়াছে ব্রজ জানে না, কিন্তু যেই দিয়া থাক—ভালই দিয়াছে।

মৃদঙ্গ লইয়া নরোত্তমদাস বাবাজী বসিয়াছেন, অন্য বৈষ্ণব মহান্তরা একে একে বসিতেছেন। ব্রজ আসিয়া সকলকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

নরোত্তমদাস বাবাজী মৃদঙ্গটি সামনে রাখিয়া হাত জোড় করিয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতেছিলেন—তিনি কথা বলিলেন না—শুধু মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সুবলপুরের মহান্ত বলিলেন—আপনি উঠে এলেন মা-জী!

মৃদু হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল, এলাম। আপনারা সকলে এসেছেন—তার উপর—এ দিনটি তো বছরে একদিনই আসে।

গোপালপুরের বুড়া বৈরাগী বাউল বলিলেন—দুলাল সুস্থ আছে তো!

—নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। রক্তপাত হয়েছে তো অনেক। বেঁচেছে সে শুধু গোবিন্দের করুণা আর আপনাদের আশীর্বাদ।

বাউল বলিলেন—মাগো! তুমি বলছ কি? করুণা হবে না গোবিন্দের? তোমার যে ওই একটি।

সুবলপুরের মহান্তের চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন—আঃ! পিতৃহীন বালক, মায়ের এই একমাত্র ভরসা। হবে না করুণা তাঁর! ঠাকুর যে আমার অনাথের—অসহায়ের—

দুর্বলের ! আঃ !

ব্রজর প্রতিবেশিনী রামকানাইয়ের মা ঝুড়ির পিঠে পাকা তাল ঘষিয়া মাড়ি বাহির করিতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল, অনাথ বলছেন বলুন বাবারা বলুন—দুর্বল বলবেন না, অসহায়ও বলবেন না। বাবা, বাঘের মতন রোক্ ছেলের, তেমনি কি প্রচণ্ড জোর গায়ে ! ষোল বৎসরের ছেলে আমার রামকানাইয়ের হামজুটি, রামকানাই ওর কাছে পিঁপড়ে। আবার তেমনি কি সাহস বাবা ! পিথিমীর কিছুকে ভয় নাই মা। তেমনি কি মার-হাত ছেলের ! সেই ছেলেবেলা থেকে। আমার রামকানাইয়ের ছামনের দুটো দাঁত কিল মেরে ভেঙে দিয়েছিল বাবা ! মুখ ফুলে এই হাঁড়ি হয়ে উঠেছিল। ভাগ্যে দুধে দাঁত তখন—তাই আবার হয়েছে—নইলে ছেলে আমার চের জনমের মত ফোকলা হয়ে থাকত। হবে না কেন ? মায়ের যে একদম শাসন নাই। শাসন থাকলে বোষ্টুম মহান্ত ঘরের ছেলে, আখড়ায় এমন গোপাল, মা নিজে এমন, গান শুনলে পশুপক্ষী বশ মানে—সেই মায়ের ছেলে আখড়ার সেবা আখড়ার ধর্ম বউকী জলে ভাসিয়ে দিয়ে ওই মেলেচ্ছ গাড়ী—লরী না ঘুড়ি—তাতেই কাজ করতে যায় ? মা গো—গাড়ীর ধোঁয়ার গন্ধ কী ? একবার আমি চেপেছিলাম—সাত কলসী বমি করে অন্নপেরাশনের ভাত তুলে তবে রক্ষে ! ও ছেলেকে দুব্বল ব'ল না বাবা। ও ডারপার ছেলে ডারপারের মরণ তালগাছে চড়ে—তা এ আবার নতুন দেখালে বাবা, জলের কুমীর ডাঙায় তুলে—তাকে মেলে। ওই ছেলে দুর্বল ! বাবাঃ !

মুখরা রামকানাইয়ের মা বলিয়াই চলিয়াছিল, রামকানাইয়ের মায়ের ওই স্বভাব, বলিতে শুরু করিলে থামে না, আগুন দেওয়া তুবড়ীর মত একেবারে বকিবার শক্তি ফুরাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত বকিয়াই চলিবে। নরোত্তমদাস বাবাজী তুবড়ীর মুখে জল ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার গোবিন্দ স্মরণ শেষ হইবামাত্র তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—ওগো বাছা রামকানাইয়ের মা, প্রভুর ভোগের জিনিস মা। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে প্রসাদ পাবেন। ও আয়োজন মুখ বন্ধ ক'রে করতে হয় মা। এ সময় বকতে নাই। রামকানাইয়ের উপরেও প্রভুর দয়া অনেক। দীর্ঘজীবী হবে তোমার ছেলে। চুপ ক'রে কাজ করে যাও—নইলে কি জানি বকতে বকতে মুখ থেকে আব ছিটকে পড়ে উচ্ছিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রামকানাইয়ের মা অবাক হইয়া গেল—বলিল—কি বাবা ? কি পড়বে ?

'আব' কথাটা এ অঞ্চলে অপ্রচলিত, সোজাসুজি থুথুই বলিয়া থাকে লোকে, নরোত্তমদাস বাবাজী কিন্তু থুথু কথাটা ব্যবহার করিতে পারেন নাই, বিশেষ করিয়া এমন ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভোগের বস্তুতে থুথু পড়িবে এ কথাটা মুখে যেন বাধিয়া গিয়াছে। কিন্তু রামকানাইয়ের মা কথাটা তাঁহাকে না বলাইয়া ছাড়িল না, অপ্রসন্ন মুখেই বলিলেন—কথা বলবার সময় মুখ থেকে আব বেরোয় না। থুথু—থুথু।

রামকানাইয়ের মা এবার শিহরিয়া উঠিল। কথা বন্ধ করিয়া সে কাজ আরম্ভ করিল।

বাবাজী বলিলেন—তবে আরম্ভ কর ব্রজ ; বলিয়াই তিনি মৃদঙ্গে ধ্বনি তুলিলেন। প্রথম দফা বাজনা শেষ করিয়া ছেহাই দিয়া হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—জয় রাধে গোবিন্দ জয় গৌর নিত্যানন্দ !

তারপরই ব্রজ গান আরম্ভ করিল। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা তারপর কৃষ্ণলীলা। দীর্ঘ দশকুষীতে মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

পুরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়

সঙ্গীগণ লইয়া হরষিত হৈয়া
নন্দ মহোৎসব গায়—

জন্মাষ্টমী দিবসে শচীনন্দনের পূর্বজন্ম স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া সেই দিনের মহোৎসবের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্মরণ করিতেছেন ব্রহ্মপুরের আনন্দ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রাত্রি ঘন দুর্যোগে আচ্ছন্ন, সমস্ত পৃথিবী দুর্যোগের বিভীষিকায় আচ্ছন্ন ত্রস্ত, তাহারই মধ্যে কারাগার অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, পিতা বসুদেব কারাগার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া যমুনার পাথার পার হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া সদ্যপ্রসূতি মা যশোমতীর কোলের পাশে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছেন। যশোমতী প্রভাতে উঠিয়া আপন শিশু জ্ঞানে তাঁহার মুখ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। সমগ্র ব্রজমণ্ডলে পরমোৎসবের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। শচীনন্দনের মনে পড়িতেছে মা যশোদার আনন্দবিভোর মুখমণ্ডল। মনে পড়িতেছে মাতৃবক্ষের অমৃত স্বাদের স্মৃতি॥

ঘৃত ঘোল দধি গো-রস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি—
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী।

নিজেই তিনি আজ কাঁধে দই ঘোলের ভার লইয়া নাচিতেছেন, যেমন নাচিয়াছিল সেদিন ব্রজপুরের গোপেদের দল।

ব্রজর মনে পড়িতেছিল নিজের কথা।

সেই দুর্যোগ রাত্রিতে পথে গাছের তলায় দুলালকে কোলে পাইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সে পূর্ব দিগন্তের পানে চাহিয়াছিল। রাত্রির অবসান হইল, সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়াছিল একরাত্রি বয়স্ক শিশুটির মুখের দিকে। মনে পড়িতেছে সেই ক্ষণের মনের অবস্থার কথা।

ওদিকে বৈষ্ণব মণ্ডলী—গ্রামের শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। একটি ভাবাবেশ যেন অন্তরলোক হইতে পৌষ-প্রত্যূষের পৃথিবীর বুক হইতে জাগিয়া ওঠা কুয়াসার মত ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে।

অকস্মাৎ একটা ক্রুদ্ধ আর্ত চীৎকারে সকলে চমকিয়া উঠিল—একটা আগুনের তড়িৎগতি হল্কা বহিয়া কুয়াসামণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। ব্রজ চমকিয়া উঠিল।

দুলাল টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, দাঁতে দাঁত টিপিয়া ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া সব ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া দিতে চাহিতেছে।

—গান—গান—গান। আমোদ। আমি মরে গেলাম—আর সর্বনাশী রাক্কুসী—তুমি গান গেয়ে ঠাকুরপুজো করছ!

দুলালের ক্রোধ বুনো মহিষের মত, তাহার কণ্ঠস্বরও বন্য পশুর মত কর্কশ, উচ্চ। রাগ হইলেই তাহার দাঁত বাহির হইয়া পড়ে, দাঁতে দাঁত ঘষে। দুলালের ক্রোধে ক্ষোভের চেয়ে হিংস্রতার পরিমাণ বেশী।

মহান্ত নরোত্তমদাস বলিলেন, ব্রজ ওঠ তুমি, আমি অনুমতি করছি।

ব্রজ উত্তর দিল না, সে গাহিয়াই চলিল। তখন সে নূতন পদ ধরিয়াছে, সমগ্র পৃথিবী নবজাত যশোদানন্দনকে বন্দনা করিতেছে—

জয় ব্রজরাজ কোঙর—
গোকুল উদয়গিরি-চান্দ উজোর।
কোটি ইন্দু জিনি মুখ, তনু জলধর—
একত্রে উদয়ে আলো করিয়াছে ঘর।

সে গাহিয়াই চলিল।

দুলাল দাওয়া হইতে একরূপ লাফ দিয়া পড়িল, নিচে পড়িয়া বসিয়া পড়িল—আবার উঠিল—সকল শক্তি একত্রিত করিয়া আখড়া হইতে বাহির হইয়া গেল।

—চললাম আমি।

ব্রজ তবু উঠিল না। সুবলপুরের মহান্ত সব চেয়ে বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন—গানের মধ্যে তিনি ব্রজদাসীকে ডাকিতে পারিলেন না—কিন্তু অগ্রসর হইয়া সামনে আসিয়া বসিলেন—মূল গায়কের কাজ তিনিই করবেন। ব্রজ গান গাহিতে গাহিতেই ঘাড় নাড়িল—না।

বাহির হইবার পথে হরিবোলা পাল দুলালকে ধরিল—দুলাল—বাবা!

এক ঝটকায় তাহার হাত ছাড়াইয়া দুলাল গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাও!

সে চলিয়া গেল।

ব্রজ তবু উঠিল না। সে গাহিয়া চলিল—

ও থল কমল জিনি চরণ রাতুল
হেরিয়া উদ্ধব পঁহু চিত মন ভুল।

তিন

ব্রজ গান শেষ করিয়া প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল কাপড় ছাড়িতে। একবার ফিরিয়া দেখিল না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না—দুলাল কোথায় গেল।

যাক—যেখানে গিয়াছে যাক্। একমাত্র ভাবনা অসুস্থ শরীর, এই ঘণ্টা কয়েক আগে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে—জলের কুমীর—বনের বাঘ—গর্তের সাপ অপেক্ষমাণ যম। হোক ছোট—তবু তাকে যমই বলিতে হইবে। তাহার পরিচয় তো দুলালের কাঁধের নীচে পিঠের উপর ধারালো দাঁতের চিহ্ন বর্তমান, রক্তপাতে তো সে সত্য লেখা হইয়া রহিয়াছে। ঘরের বিছানায় রহিয়াছে, দাওয়া নিকানো হইয়াছে তবু লাল রক্তের দাগ মুছে নাই। ঘণ্টাখানেক পর হইতে তো অজ্ঞানের মত পড়িয়া ছিল। ভাবন ওইটুকু। কিন্তু সে ভাবনাও আর সে ভাবিবে না। যেখানে গিয়াছে যাক, যা হইবার হোক, সে খুঁজিবেও না, ভাবিবেও না।

এ কি বন্ধন, নাগপাশ; ভগবান তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়াছেন। সে পাশ যদি আজ নিজে ছাড়িয়া যায় যাক। কালনাগের বিষে শরীর তাহার জর্জর হইয়া গেল!

মহেশ মণ্ডল অগ্রসর হইয়া আসিল—বলিল—ভেবো না—মা-জী। সে বাগ্দী বুড়ীর বাড়ী গিয়ে উঠেছে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি—পথে দেখি টলতে টলতে চলেছে। গিয়ে বাগ্দী দিদির দাওয়ায় শুয়ে বললে—আমাকে মরতে ঠাঁই দিবি একটুকু—বাগ্দী দিদি?

ব্রজ বলিল—থাম মোড়ল। আমাকে আর শুনিও না, ওর নাম আমি শুনতে চাই না, ওর মুখ দেখতে চাই না। তুমি—। সে আরও কিছু বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

বেচারী মহেশ বিষণ্ণ হাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া সরিয়া আসিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—থাক মহেশ। ব্রজ আজ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছে। সে বেশ ভালো আছে তো? ডাক্তার দেখানো হয়েছে? না, দেখালে না?

—হ্যাঁ। ওখানেই ডাক্তারকে নিয়ে দেখালাম। আমাকে দেখে ভয়ানক চীৎকার। ডাক্তারবাবুকে দেখে ঠাণ্ডা হল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খুব পরিচয় তো। ডাক্তার বললেন—ওর জন্যে দিন একটা দুটো আইডিনের তুলি আমাকে দিতে হয়। কিছু-না-কিছু ক'রে রক্তপাত করবেই ও। বেশ ক'রে ধুয়ে—ভাল করে বেঁধে-ছেঁদে দিলেন। বললেন—ভয় নেই।

—ভাল। সন্ধ্যেবেলা আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে আনব।

—না। ব্রজদাসী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বাবাজী বলিলেন মহেশ মণ্ডলকে, মৃদুস্বরে বলিলেন—তাই তো মহেশ, ব্রজদাসীর জীবনটা অশান্তিময় করে দেবে বলে মনে হচ্ছে। ও ছেলে আর যে বাগ মানবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই তো—আমরা—। বাবাজী কথা শেষ করিলেন না, কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন মহেশের কাছে সে অজ্ঞাত রহিল না।

মহেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মৃদুস্বরেই সে বলিল—আমি কি বলব প্রভু ভেবে পাই না। ভগবান—। আর সে বলিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত পর গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—মা-জী ছিলেন, ওঁর সামনে আমি বলতে পারি নাই। চণ্ডালের মত কথাবার্তা বাবা। ভগবানকে কটুবাক্য। গোপাল বিগ্রহকে সে—।

চুপ করিয়া গেল মহেশ।

দুলাল চীৎকার করিয়া বলিয়াছে—আমি যাচ্ছি ম'রে—যন্ত্রণায় ছটফট করছি আর একটা মাটির ঠাকুর নিয়ে মা হয়ে যে মাতামাতি করে সে রাক্কুসী। মনে হয় ওই ঠাকুর—

শিহরিয়া উঠিয়া মহেশ দুলালকে বলিয়াছিল—না—না—না, ও কথা ব'ল না বাবা। বলতে নাই। ছি!

—ছি! বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া দুলাল বলিয়াছিল—ছি! আচ্ছা—আচ্ছা! ঠাকুর বেঁচে থাক্। খুব ননী মাখন খাক। রাক্কুসী ওই মাটির ডেলা বুকে চাপিয়ে যাক স্বগ্যে। আমি ম'রে খালাস পাই।

বিষণ্ণ হাসিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাবাজী আকাশের দিকে চাহিলেন। বলিলেন—আমিই দায়ী একরকম মহেশ। ছেলেটাকে যদি আমি—

—না। দায়ী আপনি নন প্রভু। দায়ী আমার অদৃষ্ট—আর দায়ী হতভাগার—।

—না—না—না। ওসব কথা তুমি মুখে এনো না ব্রজ। আর আমি বলছি আর একটু বয়স হ'লেই ও ঠিক হয়ে যাবে। এ বয়সটারই হ'ল ওই ধর্ম।

—না। ঠিক হবে না বাবা। এ বয়সের কথা বলছেন—মানলাম। কিন্তু ছেলেবেলায় সেই চার পাঁচ বছর বয়সে—কোন্ ধর্মে ও ছেলে ঠাকুরকে মন্দ কথা বলত—ভাঙতে যেত বলুন তো? জন্ম থেকে ওর ঠাকুরের উপর একটা আক্রোশ!

হঠাৎ ব্রজদাসীর ঠোঁট দুটি অবরুদ্ধ আবেগের তাড়নায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য সে চোখ না বুজিয়া পারিল না, যেন মানুষের দিকে তাকাইয়া থাকিবার

মত শক্তির সম্বল শেষ হইয়া গিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ মেলিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি আমার শাস্তি বলুন তো? আমার গোবিন্দ—আমার গোপাল—তাঁর উপর যার—

আবার তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবাজী হাসিলেন। এটুকু যেন তাঁর মুদ্রাদোষ। সুখেও হাসি—দুঃখেও হাসি। চোখে জল পড়ে—মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। সে হাসি যে দেখে তাহার কান্না পায়।

মহেশ মণ্ডল বোধ হয় আর সহ্য করিতে পারিল না—সে চলিয়া গেল।

ব্রজও চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল রাত্রের অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজে। উনান ধরিয়া উঠিয়াছে। ময়দা গুড় তালের মাড়ি সবই প্রস্তুত। তালের বড়াগুলি ভাজিয়া ফেলিতে হইবে। সে বুক বাঁধিয়াছে। জয় গোবিন্দ! গোবিন্দ থাকিতে দুঃখ কিসের? যার গোবিন্দ আছেন—তার সব আছেন।

রাত্রে নরোত্তম দাস বাবাজী গোপালের পূজা করিয়া জন্মাষ্টমীর কথা পাঠ করিতে বসিলেন। প্রথম প্রহরের পূজা পাঠ শেষ হইয়া গেল। বাবাজী বলিলেন—উপবাস করে আছ ব্রজ, এইবার তুমি একটু বিশ্রাম করো। ঘুমুতে নেই তবু একবার গড়াও।

—হ্যাঁ।

—আমি সন্ধ্যাতেও লোক পাঠিয়েছিলাম। সে ভাল আছে। একটু সকৌতুক হাসি হাসিয়া বলিলেন—কি বলেছে জান? বলেছে তোমরা কেন এসেছ হে বাপু? সেই গোপাল-ঠাকুরের সেবায়েত মহন্তিনীকে পাঠিয়ে দিয়ো। তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে তবে যাব। নইলে আমি মরি সেও ভাল—কিছুতেই যাব না। কাল সকালে একবার যাবে, গেলেই চলে আসবে। গাড়ীর জন্যে—

বাধা দিয়া ব্রজদাসী বলিল—না।

বাবাজী হাসিলেন।

—আমি যাব না প্রভু। আমার বন্ধন কেটেছে—এ আমার উপর গোবিন্দের দয়া, আপনি প্রভু, গোপালের সেবার ভার থেকে আমায় মুক্তি দিন, আমি চলে যাই। পথ চলতে চলতে মাঝপথে বাঁধা পড়েছে, বাঁধন খুলেছে, আমি চলব—আর একবার চলব। এ বড় শাস্তি—এ বড় পাপ!

—ছি ছি ব্রজ! এ কথা বলো না। বলতে নাই।

—আছে। একশো বার আছে। আমি যে হাড়ে হাড়ে যন্ত্রণা পেয়ে বুঝলাম প্রভু।

—আজ এখন ও কথা থাক। কাল হবে।

—না আর না। সে অলস অবসাদে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া যেন এলাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর ভাদ্র মাসের অসহ্য গুমোট গরমে প্রায় অধীর হইয়া দাঁড়াইল। উঠানে নামিয়া পড়িল।

আঃ—ছি ছি! কি ওটা? একটা পাতা। কিসের পাতা? ছি ছি—আবার স্নান করিতে হইবে!

গামছাখানা টানিয়া ঘাড়ে ফেলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া সে যেন বাঁচিল। তবু খানিকটা বাতাসের স্পর্শ যেন পাওয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল পাতা ছোঁয়া পড়াটাও যেন ভাল হইয়াছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া দেহখানা জুড়াইবার সুযোগ

মিলিয়াছে। সারাটা দেহ যেন জ্বালা করিতেছে। আগুনের আঁচে সব যেন ঝলসিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য! ব্রজদাসী নিজেই একটু হাসিল। এক-একদিন কি যে হয় ভগবান জানেন! নহিলে এ আগুনের আঁচ আর কি এমন আঁচ! বাবাজীর আখড়ায় দোলের সময় যে সমারোহ হয় সে সমারোহকে ধনী জমিদার বাড়ীর বড় বড় যজ্ঞির সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড় বড় জোল উনান কাটিয়া রান্না, একটা উনানে আটটা হাঁড়ি চাপে। ময়রার দোকানের উনানের মত উনানে ব্যঞ্জন রান্না হয়। সেই উনানে উদয়াস্ত রান্নার কাজ করে ব্রজদাসী। বাবাজী বলেন—ব্রজ, তোমার হাতের ব্যঞ্জন ছাড়া প্রভু তো ভোগে অমৃত স্বাদ পাবেন না! তুমি যে গোপালের সেবা কর, তুমি যে সাক্ষাৎ যশোমতী গো।

সাক্ষাৎ যশোমতী। নরোত্তম দাস বাবাজী হয়তো রহস্য করেন। এতদিন কথাটা মনে হইলে সে খুশী হইত। মনে মনে শিহরিয়া উঠিত। বার বার বলিত—বাবাজী স্নেহে অন্ধ। তিনি যা বলেন তার অপরাধ যেন তাহাকে স্পর্শ না করে। দুলালের যেন অমঙ্গল না হয়। আজ সে মনে মনে স্থির করিল এবার বাবাজীর কথার প্রতিবাদ করিবে। বলিবে—না—এমন রহস্য আর করবেন না প্রভু!

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পায়ের দুইপাশের ক্ষেতের ধান জড়াইয়া যাইতেছে; ভাবিতে ভাবিতে কখন সে মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি? স্নান করিতে কোথায় চলিয়াছে সে? এ যে গ্রাম পার হইয়া আউশের মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। ওই তো চাঁদরায়ের বাঁধ! বাঁধের ওপারে বাগ্দীপাড়া। কপালে তাহার কুঞ্চনরেখা জাগিয়া উঠিল। দুর্দান্ত লক্ষ্মী-ছাড়াকে একবার দেখিয়া আসিবে নাকি? ওই তো বাঁধের ওপারে খানকয়েক ধানক্ষেত পার হইয়াই—।

ছি! ছি! না—। কখনই যাওয়া উচিত নয় তার। যে ছেলে তাহার ইষ্টদেবতার অপমান করে—যে ভগবানকে অবহেলা করে—তাহার মুখ দেখা তাহার উচিত নয়। বন্ধন ছিঁড়িয়াছে ভালই হইয়াছে।

হঠাৎ অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঠখানা যেন চমকিয়া উঠিল। কাহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

—ওরে! ওরে!

কে কাহাকে ডাকিতেছে? চেনা গলা!

—ওরে অ দুলালে! শুনছিস?

—আ—প!

—ও—এই শরীর নিয়ে যাবি কোথা? তোর মাকে আমি বলব কি?

—বলিস মরে গিয়েছি!

—ওরে হতভাগা, মরবি তো এইখানে মর না কেনে? মরতে যাবি কোথা?

—আমি চল্লাম আপনার আস্তানায়। বাসের আড্ডায়। সেইখানেই মরব।

—অ দুলালে—ওরে—অ।

বাগ্দী বুড়ী চীৎকার করিতেছে। দুলাল বুড়ীর ঘর হইতেও চলিয়া যাইতেছে। বাসের আড্ডায় চলিয়াছে। নিতান্ত দুর্মতি না হইলে এমন ইচ্ছা মানুষের হয় না। ক্রোশ-দেড়েক পথ যাইতে হইবে। এত রক্তপাত হইয়াছে তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই দুর্দান্তের!

ওই চাঁদ রায়ের বাঁধের পাশ দিয়া দুর্দান্ত আসিতেছে। ব্রজদাসী শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্তে ইধান ভরা ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া পড়িয়া আত্মগোপন করিল। যাক, তাহাকে দেখিতে

পাইলে দুর্দান্তটা ভাবিবে সে তাহারই খোঁজে আসিয়াছিল!

বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে দুলাল চলিয়াছে।

—যাব, চলেই যাব। যাবার পথে তোর সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করে তবে যাব। হাঁ বোঝাপড়া করব—ভাল ক'রে বোঝাপড়া করব—শেষ বোঝাপড়া করব। ই—তুইও বেজ বষ্টুমী—আমিও বাবা বিরিজ নন্দন—হাঁ—হাঁ—

—কি বোঝাপড়া করবি? বলি দাঁত কিস্ কিস্ ক'রে বোঝাপড়া করবি বলে তুই যে ফাঁকা মাঠে সাপের মত গজরাচ্ছিস—তা আমার সঙ্গে তোর বোঝাপড়ার আছে কি? ব্রজ আর থাকিতে পারিল না, ধানক্ষেতের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি বলিয়া উঠিল। রাগে আক্ষেপে অভিমানে কণ্ঠস্বর তাহার বিচিত্র। স্পর্শ তাহার সুস্পষ্ট।

দুলালও চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

ভয় দুলালের নাই। ভয় সে পায় নাই। অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার বিস্ময়ে সে চমকিয়া উঠিল। এই মাঠের মধ্যে অন্ধকার রাত্রে কোথা হইতে আসিল রাক্ষসী? পরমুহূর্তেই সে বিস্ময় কাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—যাব না, আমি যাব না তোর বাড়ী! কেন এসেছিস তুই? আমি চলে যাব। যেদিকে মন যায় আমি চলে যাব।

—আমি তোকে নিয়ে যেতে আসি নাই। আমি এসেচি চান করতে।

—চান করতে? আমি বুঝি না কিছু? চান করতে এসেছিস মাঠে—ধানক্ষেতে চান করতে এসেছিস?

—ধানক্ষেতে নয় রে মুখপোড়া—চাঁদ রায়ের বাঁধে—

—চাঁদ রায়ের বাঁধে! গাঁয়ে এত পুকুর থাকতে, ঘরের দোরে বউকীর ঘাট থাকতে—চাঁদ রায়ের বাঁধে? যা যা—তুই চলে যা, আমি যাব না—

পিছনের অন্ধকার হইতে বাগ্দীবুড়ী বলিল—ওই দেখ মা—ওই দেখ। কি বজ্জাদ কি নেমকহারাম তোমার ছেলে মা! আমার ঘরে এল—বলে—'আমাকে মরতে টুক্‌চে ঠাঁই দিবি!' আমি বলি—ষাঠ্ ষাঠ্ ষাঠ্—মরবি কেনে ভাই। বলে—অমন যার মা—তার মরণই ভাল! রাক্ষুসী—ডাকিনী—সে মা কত যে বললে—সে আর কত বলব! তা'পরেতে মা—মোড়ল ডাক্তার আনলে—ডাক্তার দেখলে—চলে গেল; হঠাৎ সনদে থেকে আমাকে গাল পাড়তে লাগল। বলে—কি বিছেনা দিয়েছিস, আমার সর্বাঙ্গে ফুটছে। বলে—কি গন্ধ তোর ঘরের! খেতে দিলাম দুধ। তা' বলে—আমি কি গরুর বাছুর যে দুধ খাব আমি? বললাম—হা রে যখন ছোট ছিলি তখন আমি ভাত দিয়েছি—খেয়েছিস—এখন বড় হয়েছিস—আজ তোকেও জাতবিচার করতে হবে—আমাকেও করতে হবে। আমি কি বলে ভাত দোব? আর ভাত খেলে—খারাপ হবে যে। ডাক্তার কি বলে গেল? বলে, মা—আমাকে যত গালাগাল ডাক্তারকেও তত গালাগাল।

দুলাল আর সহ্য করিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া উঠিল—বেশ করেছি—খুব করেছি। তিনকুলখাগী বুড়ী মরণ নাই তোর, আমি বলছি—তোর মরণ কোন কালে হবে না। পঙ্গু হবি—হাত পা পড়ে যাবে, তুই পড়ে থাকবি আর চিঁ চিঁ করে চেঁচাবি—এঁক মুঠো ভাঁত এঁক টুঁকুন জল—

বুড়ীও চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে—ও তিরদশে—ওরে ও বাঁশবুকো—ওরে ও যমের অরুচি—

ব্রজদাসী আবার ছুটিয়া আসিয়া বুড়ীর হাতে ধরিল—আমি তোমার হাতে ধরছি—আমি

তোমার কাছে ঘাট মানছি—তুমি আমার মায়ের মত। বড় যত্ন করেছ একদিন—তোমাকে ও ভালবাসে—

—না ওকে আমি ভালবাসি না। এক মুঠো ভাত চাইলাম—তা' দিলে না।

হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল—রাত্রে ভাত না হলে ওর পেট ভরে না মা, সে তুমি লুচি পুরি মিষ্টি রাজভোগ দাও না কেন—ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে—ভাত দে—ভাত! দুধ দিলে বলবে—আমি কি গরুর বাছুর? লুচি পুরি দিলে বলবে—আমি কি বামুনের বিধবা?

দুলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—তোর কি? তাতে তোর কি? আমার যা রুচি হবে তাই খাব। তোর ওই গোপালের লুচি পেসাদ যদি না খাই আমি! ননী ছানা যদি মুখে না রোচে আমার?

ব্রজদাসী এবার গর্জিয়া উঠিল—দুলাল!

—কি? দুলাল কাউকে ভয় করে না।

বাগ্দীবুড়ী এবার হাতজোড় করিয়া বলিল—হেই মা হেই—ভাই, আর তোমরা রাত-দুপুরে ঝগড়া ক'র না। আর আমার বুড়ো বয়সে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা নাই। দোহাই তোমাদের। যাও বাড়ী যাও। তাই দাও গে মা—একটু একমুঠো ভাত ফুটিয়ে দাও গে।

ব্রজ বলিল—না মা, ওকে বলতে হবে, ঠাকুরকে এমন কুবাক্য বলবে না। তা নইলে—

—তা নইলে—

ব্রজ যে কি করিবে সে কথা ভাবিয়া পাইল না, দুলালও তাহাকে ভাবিবার সে সময় দিল না—দাঁত বাহির করিয়া তর্জনী নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া বলিল—তোকেও বলতে হবে, ঠাকুরের পেসাদ খা, 'চরণোদক' খা, উপোস কর—এই সব বলে জ্বালাবি না। তুই মা—তোর ঠাকুর, সেই খাতিরে পেনাম সকাল সনধে করব—এই পর্যন্ত। হ্যাঁ। আর আমি মরব—আর তুই ঠাকুরের ছামনে গিয়ে তে—নে—নে ক'রে গান ধরবি—তা' হবে না।

—ওরে হতভাগা—

—খবরদার বলছি রাক্কুসী—খবরদার—হতভাগা আমাকে বলবি না তুই! কিসের লেগে হতভাগা হ'তে যাব আমি? হতভাগা! তুই হতভাগী, তুই কপালখাগী! তুই হতচ্ছাড়ী!

বুড়ী হাসিয়া ফেলিল—বলিল—আচ্ছা ভাই আচ্ছা—তুমি ভাগ্যিমান পুরুষ—তুমি—

—নিশ্চয়! হতভাগা! হতচ্ছাড়া! খবরদার ওসব বলবি না আমাকে!

—বেশ বলব না। চল—বাড়ী চল।

—ভাত দিতে হবে।

—দোব।

—তবে ধর আমাকে।

—ধরতে হবে? এই যে এখুনি চলে যাচ্ছিলি—বাসের আড্ডায়—পাকা দেড় কোশ পথ!

—না পারতাম রাস্তায় মরে পড়ে থাকতাম। কাল সকালে খবর পেয়ে গিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতিস—ওরে দুলাল বাবারে—

—ঠাস ক'রে এক চড় দোব তোর মুখে।

—তবে ধর না কেন আমাকে!

ব্রজদাসী হাসিবে, না কাঁদিবে—ভাবিয়া পায় না। সেই রাত্রে আখড়ায় ফিরিয়া ভাত চড়াইয়া দিল। ভাত নামাইয়া সে যখন দুলালকে ডাকিল তখন কিন্তু দুলাল সাড়া দিল না।

অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া সে চমকিয়া উঠিল।—গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে।

জ্বর আসিয়াছে। প্রায় বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছে। চোখ মেলিবার চেষ্টা করিয়াও চোখ মেলিতে পারিতেছে না।

চার

দুই মাস পর দুলাল চোখ মেলিল।

দুই মাসের মধ্যে তাহার চেতনা ছিল না। লাল চোখ মেলিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রলাপ বকিয়াছে। কুমীরের দাঁতের ক্ষতের প্রদাহ—তাহার সঙ্গে কোন জ্বরের বিষ দুই মিশিয়া রোগের একটা জট পাকাইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রায় যমে মানুষে টানাটানি।

দুই মাস ব্রজদাসী মাথার শিয়রে বসিয়া শুধু গোপালকে ডাকিয়াছে। তাহার দৃঢ় ধারণা —গোপালের প্রতি অবজ্ঞার অপরাধের দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে অমোঘ বিধানে। ডাক্তার দেখানোর ত্রুটি ছিল না, নরোত্তম দাস বাবাজী সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মহেশ মণ্ডল দিবা-রাত্রি ডাক্তারের নির্দেশমত ওষুধ খাওয়াইয়াছে সেবা করিয়াছে; ব্রজদাসী শুধু চরণোদকের পাত্র লইয়া শিয়রে বসিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিয়াছে আর যখন দুলাল জল চাহিয়াছে তখনই চরণোদক মুখে দিয়া তবে জল দিয়াছে।

আশ্চর্য দুলালের চরিত্র, চরণোদক মুখে দিলেই সে মুখ বিকৃত করিয়াছে। বলিয়াছে—আঃ!

অল্প জ্ঞান যখন ফিরিল—তখন বলিয়াছে—আঃ কি জল! গন্ধ। মিষ্টি। আঃ! ওষুধ আর দিয়ো না! আঃ!

ফুল এবং নৈবেদ্যে মিষ্ট আস্বাদ রোগের মধ্যেও তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে।

ব্রজদাসী সকাতরে মনে মনে প্রার্থনা জানাইয়াছে—ক্ষমা করো। অবোধ অজ্ঞান!

দুই মাস পর ভোরবেলা সেদিন দুলাল অকাতরে ঘুমাইতেছিল। মধ্যরাত্রি হইতে কেমন নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজ ভাবিতেছিল অন্যরূপ। বাহিরে মহেশ মণ্ডল শুইয়াছিল, শঙ্কিত হইয়া ব্রজ তাহাকে ডাকিল—মোড়ল!

মহেশ নাড়ী দেখিতে পারে। পল্লীগ্রামে মণ্ডলদের এ বিদ্যাটি অবশ্যই জানিতে হয়। মহেশ এ বিদ্যাটি ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। সে সন্ধ্যা হইতেই ব্যাপারটা অনুমান করিয়াছিল। সাতদিন আজ, জ্বরের মাত্রা ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছে। আজ জ্বর অল্পই আছে সমস্ত দিন। হয়তো ডাক্তারী যন্ত্র থারমোমিটারের হিসাবে একশো, কি—কিছু বেশী হইবে।

ব্রজদাসীর শঙ্কিত আহ্বানে বিস্মিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল—প্রশ্ন করিল—কি—মা—কী?

—একবার দেখ দিকি। এ যে—শাকগাছটার মত নেতিয়ে পড়েছে।

মহেশ উঠিয়া আসিয়া নাড়ী দেখিয়া—মৃদু হাসিয়া বলিল—ভয় নাই। নাড়ী ঠিক আছে, চমৎকার আছে। জ্বরটা আজ ত্যাগ করবে। ঘুমুচ্ছে—সুস্থ হচ্ছে কিনা! কোন ভাবনা করো না।

—ঠিক বলছ ?

হাসিয়া মহেশ বলিল—ভাবনার কিছু থাকলে—আমি এমন করে হেসে কথা বলতে পারি মা-জী ? কোন চিন্তা নাই। তুমি ঘুমাও ; আমি বলছি। আমি বরং থাকি।

—না।

ব্রজদাসী তবুও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। মহেশ মণ্ডল যাহা বলিয়াছে—সে-কথা সে অবিশ্বাস করে না, মহেশের কথা অবিশ্বাস করা যায় না, তবুও দুর্দান্ত দুলাল—এমন নিস্তেজ হইয়া গেল কেন ? মৃত্যু, সে বড় রহস্যপূর্ণ ; বিচিত্র তাহার গতি-বিধি ; তাহাকে চেনা যায় না, জানা যায় না, কখন কোন্ দিক হইতে কেমন ভাবে অতর্কিত একটি ফুৎকারে প্রদীপ নিভাইয়া দেওয়ার মত মানুষের জীবন শেষ করিয়া দেয় কেউ বলিতে পারে না। সে দুলালের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কার্তিক মাস—শীতের আমেজ পড়িয়াছে, শেষরাত্রে কাপড়খানা ভাল করিয়া টানিয়া গায়ে দিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল ; বাহিরটা নিস্তব্ধ—অতি মৃদু একটা সন্‌সন্ শব্দ—আর তাহার সঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে।

—মা !

ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল ; দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে—কখন চোখের পাতা দুইটি আপনি নামিয়া আসিয়া জুড়িয়া গিয়াছে ; তন্দ্রা আসিয়াছিল। ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে দুলাল এই মুহূর্তটিতেই ডাকিল—মা !

ব্রজদাসী বিস্ফারিত নেত্রে দুলালের দিকে চাহিল—বুকের ভিতরটায় যেন পাহাড়ের চূড়া হইতে পাথর খসিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে—সব গুঁড়াইয়া দিতেছে। দুলাল আবার ডাকিল—মা !

দুলালের চোখ দুইটি শরতের আকাশের মত ঘোর-মুক্ত—পরিচ্ছন্ন, মালতী ফুলের পাপড়ির মত শুভ্র প্রসন্ন ; ব্রজদাসীর মুখের পানে—গাঢ় অনুরাগে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকার মধ্যে চৈতন্য প্রদীপ শিখার মত জ্বলিতেছে। ব্রজদাসী দুলালের কপালের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গাঢ় আবেগে আপনার ঠোঁট দুটি চাপিয়া ধরিল। শীতল স্নিগ্ধ কপালখানি ! সে ডাকিল— দুলাল !

দুলাল এবার দুই হাত তুলিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

ব্রজদাসী অঝোরঝরে কাঁদিতেছিল।

দুলাল বলিল—কাঁদিস না। বড় অসুখ করেছিল আমার—নয় !

ব্রজদাসী শুধুই কাঁদিল, কথার উত্তর দিতে পারিল না।

দুলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—সেই আমাকে কুমীরে ধরেছিল, জন্মাষ্টমীর দিন। সেই আমি বাগ্দীবুড়ীর বাড়ী গিয়েছিলাম রাগ ক'রে। হুঁ। ওঃ ! আচ্ছা—সেই কুমীরটাকে মেরেছিলাম—সেটা কি হ'ল ? তার চামড়াটা ?

—তার চামড়াটা ! এবার ব্রজ চোখ মুছিয়া হাসিল।

দুলাল বলিল—তার চামড়াটা যদি নষ্ট হয়ে থাকে তো ভাল হবে না।

—আচ্ছা পাগল তুই কিন্তু দুলাল !

—কেন ?

—তোর এই অসুখ—যমে-মানুষে টানাটানি—আমি তোকে দেখব—না—তোর কুমীরের চামড়ার ব্যবস্থা করব ? তা ছাড়া বাবা—বৈষ্ণবের ঘর—গোপালের আশ্রম, এখানে কি ওসব চামড়াটামড়া নিয়ে—অনাচার করতে পারি ?

দুলাল আজ কিন্তু ফোঁস করিয়া উঠিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঃ—বেটার মেছো কুমীর—আমার পিঠে দাগ করে দিলে, আর—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর আক্ষেপ করিয়া বলিল—কুমীরের চামড়ায় আচ্ছা জুতো হয়। মিলিটারী বেটাদের কাছে বিক্রী করলে—ওঃ—সে মেলাই টাকা হত।···আচ্ছা—পচে-থসে একটুকুও পড়ে নাই? বেটার দাঁতগুলো কি হল? দাঁতগুলো!

—সে আমি জানি না দুলাল, আমাকে আর জ্বালাস না।

—সকাল হোক, আমি দেখব—কিছু-মিছু পড়ে আছে কিনা।

ব্রজ শিহরিয়া উঠিল।—তুই উঠবি! উঠতে পারবি?

—তা পারব। তুই ধরবি আমাকে। তা পারব? সে কনুইয়ে ভর দিয়া তখনই উঠিবার চেষ্টা করিল।

তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্রজ বলিল—খবরদার দুলাল! ওরে আজ দু'মাস তুই বিছানায় শুয়ে আছিস! জ্ঞান ছিল না!

—দু—মা—স! দুলালের চোখ দুইটা বড় হইয়া উঠিল। লে বাবাঃ! আঃ—তা' হ'লে আমার চাকরিমাকরি কিছুই নাই আর!

—না থাকে নাই—তার জন্যে দুঃখু করেও কাজ নাই। তুই এখন সেরে ওঠ!

একটু নীরব থাকিয়া ব্রজ আবার বলিল—নিজে এত দুঃখ পেলি বাবা, আমাকে এত দুঃখ দিলি—আজ দু'মাস ঠায় তোর শিয়রে বসে আছি—প্রতিক্ষণে মনে হয়েছে আমার চন্দ্র-সূর্য্যি যেন এই নিভে গেল, এতেও যদি তোর জ্ঞান না হয় দুলাল—তবে আর তোকে কি বলব আমি, বল? তুই বৈষ্ণবের ছেলে, ঘরে গোপালজীর সেবা, তুই তাঁকে মানিস না, তাঁর সেবাতে তোর মন নাই, কলকারখানা, কোথায় মটর, কোথায় হাঙ্গামা-হুজ্জোত—এই নিয়ে তোর মাতামাতি! ওরে—এসব তোর সইবে কেন? তুই ভাল হয়ে ওঠ,—নিজের ধর্ম্মে থাক বাবা, আমার প্রাণটা জুড়োক—তোর মঙ্গল হবে—ভাল হবে।

ব্রজদাসীর কণ্ঠস্বরে সে কি কাকুতি! দুলালের মনে হইল মান-গোবিন্দপুরের বাজারের ভিক্ষুক মেয়েগুলোর ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যেও এমন কাকুতি থাকে না, তাহাদের কণ্ঠস্বরও এমন সকরুণ নয়! কালাপাহাড় দুলাল, দানো দুলাল তাহার চোখও সজল হইয়া উঠিল—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিল।

ব্রজদাসী তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

সকাল বেলা চোখে আলো লাগিয়া দুলালের ঘুম ভাঙিল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজদাসী উঠিয়া স্নান সারিয়াছে; দুই মাস পর আজ পরিপাটী করিয়া গোপালের ঘর মার্জনা করিয়া ধুইয়া মুছিয়া একটি প্রসাদী করবী ফুল লইয়া দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দুলালের ঘুম ভাঙিল। মাথার শিয়রে বসিয়া ব্রজ বলিল—মনে মনে গোপালকে প্রণাম কর বাবা! আশীর্বাদী দোব।

দুলাল মায়ের মুখের দিকে চাহিল। একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এমন নিষ্পলক দৃষ্টি দেখিয়া ব্রজদাসী শঙ্কিত হইয়া ডাকিল—দুলাল! তাহার ভয় হইল, আবার রোগের কোন নূতন উপসর্গ দেখা দিল নাকি!

দুলাল ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে উত্তর দিল—কি?

—এমন ক'রে চেয়ে রয়েছিস কেন বাবা?

—তোর কি চেহারা হয়েছে! তোরও জ্বর হচ্ছে নাকি?

ব্রজ কাঁদিয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুইটির প্রান্তে প্রান্তে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

দুলাল বলিল—এঃ, মুখখানা কালিমাখা হয়ে গিয়েছে!

—হোক। নে, এখন আশীর্বাদ নে। গোপালকে মনে মনে প্রণাম কর।

দুলাল প্রতিবাদ করিল না। হাতদুইটি কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। ব্রজদাসী ফুলটি কপালে ঠেকাইয়া দিয়া বলিল—মনে মনে বল—আমার অপরাধ হয়ে থাকলে—তুমি মার্জনা কর!

—এই দেখ! এত সব আমি বলতে পারব না।

—না—তোকে বলতে হবে! জানিস—উনিই তোকে বাঁচিয়েছেন? ডাক্তার বদ্যির সাধ্যি ছিল না।

—এই দেখ!

—নইলে আমি মাথা খুঁড়ব তোর পায়ে!

—মাথা খুঁড়বি?—আমার পায়ে?

—হ্যাঁ। আমার যে কথা সেই কাজ! বল—

—আচ্ছা। তাই বলছি।

—বল।

—বলেছি। মনে মনে বলেছি।

—না—আমাকে শুনিয়ে বল।

—সে—আমি পারব না। কক্ষনো না।

ব্রজদাসী বলিল—তোকে পারতে হবে দুলাল। আমাকে জিজ্ঞেসা করছিলি—আমার চেহারা এমন হ'ল কেন? আমার জ্বর হচ্ছে কিনা? জ্বর নয়—জ্বালা, তোর শিয়রে দু'মাস জেগে বসে থেকেছি আর দুশ্চিন্তার জ্বালায় জ্বলে আমার এই অবস্থা হয়েছে। তুই বিশ্বাস কর—ঘরের কোণে কোণে,—আমার মনে হ'ত, কালো-কালো কি দাঁড়িয়ে থাকত, ভয় পেতাম, গোপালকে ডাকতাম আর কাঁদতাম;—সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি—ছায়াগুলো মিলিয়ে যেত। তোকে বলতে হবে। বল।

দুলাল কেমন হইয়া গেল। সে হাত জোড় করিয়া মৃদুস্বরে কথাগুলি বলিয়া গেল। শেষ করিয়া সে লজ্জায় সারা হইয়া গিয়া বলিল—ধেৎ! বললাম—মনে মনে বলেছি। তা মানবে না। এইসব আবার মুখ ফুটে বলা যায় নাকি?

সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

ব্রজদাসী হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ন-পথ্যের দিন ব্রজদাসী প্রথমেই দুলালের হাতে তুলিয়া দিল—গোপালের নৈবেদ্যের একটি আতপ-কণিকার প্রসাদ। বলিল—আগে প্রসাদ মুখে দে! প্রসাদী হাত মাথায় বুকে পেটে বুলিয়ে নে।

দুলাল ভক্তি সহকারেই প্রসাদ-কণিকা লইয়া—ভাতের থালাটি টানিয়া লইল। পুরানো মিহিচালের ভাত, নিরামিষ ঝোল একটু। দুলালের মনে হইল অমৃত।

ব্রজদাসী ছোট একটি পাথর বাটীতে একটু আমসত্ত্ব গুলিয়া নামাইয়া দিল। বলিল—বাতাস দেব ভাতে? গরম রয়েছে অনেকটা!

দুলাল চোখ বুজিয়া রসাস্বাদন করিয়া খাইতেছিল। সে এ কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ

বলিল—বুঝলি মা, অনেক ভাবলাম এ ক'দিন।

—কি?

—তোর কথাই শুনব। বুঝলি!

ব্রজদাসী কথাটা ঠিক ধরিতে পারিল না, তবুও তাহার মন এ কথায় যেন আনন্দে ডগমগ করিয়া উঠিল। ছোট এতটুকু কথা, কিন্তু আজ ব্রজদাসীর কাছে কথাটা অনেক। দুলাল আজ অন্নপথ্য করিতেছে, মন তাহার প্রসন্ন হইয়াই ছিল, সেই প্রসন্নতার উপরে আনন্দের স্পর্শ যেন দীঘির শান্ত কালো জলে দক্ষিণা বাতাসের প্রবাহে হিল্লোল বহাইয়া দিল। আলোর ছটার একটা ঝিকিমিকি তুলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। কৌতুক-চঞ্চল হইয়া ব্রজদাসী কথাটা সঠিক না বুঝিয়াও ছেলেকে ঠাট্টা করিয়া বসিল—বলিল—আঃ—হায়—হায়—রে! সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিতে ভুলিল না।

দুলাল সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রজদাসী বলিল—আর আমি বাঁচব না! বুঝতে পারছি দিন আমার ফুরিয়েছে! এইবার আমি মরব।

—কেন? মরবি কেন? হ'ল কি যে মরবি?

—তুই যে আমার কথা শুনবি! আর আমি বাঁচি? এত সুখ আমার ভাগ্যে ভোগ করা আছে?

দুলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলিয়া গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলিয়া চলিল।

ব্রজদাসী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে দুলাল বলিল—যা—তবে তোকে আমি বলব না কথাটা!

—কথা শুনবি মায়ের তার আর বলবি কি?

—বলতাম। তা' আর বলব না। তোর ভারী বাড় বেড়েছে। সব তাতেই ঠাট্টা।

—আচ্ছা—আচ্ছা। আর ঠাট্টা করব না। কি বলছিলি বল।

—না। কিছুতেই বলব না।

ব্রজদাসী খুব গ্রাহ্য করিল না। এ কথা দুলালের মুখে তো নতুন নয়। রাত্রি করিয়া বাড়ী ফেরা লইয়া মায়ে-পোয়ে ঝগড়া দুই-চারিদিন অন্তর নিয়মিতই হইয়া থাকে। ব্রজ যেদিন কাঁদে—সেদিন দুলাল ওই কথাই বলে—আচ্ছা—আচ্ছা। তোর কথাই শুনব। সকাল-সকালই বাড়ী ফিরব। দিন তিনেক, বড় জোর চার পাঁচ দিন সকাল সকাল ফিরিয়া আবার সেই যথা-নিয়মে এক প্রহর রাত্রি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে শুরু করে দুলাল। ব্রজদাসী এঁটো বাসন লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। দুলাল রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিল।—আমার পকেটে যে সিগারেট ছিল কি হ'ল? নতুন বাক্স ছিল। জন্মাষ্টমীর দিন ঘরে থাকব বলে কিনে এনেছিলাম। কি হ'ল?

ব্রজ আসিয়া কুলুঙ্গী হইতে ন্যাকড়ার একটা মোড়ক খুলিয়া বাক্সটা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—এই নাও বাবা। ও জিনিস তোমার নেবে কে? বর্ষার বাতাস লেগে মিইয়ে যাবে বলে—আমি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখেছিলাম।

দুলাল এবার খুশী হইয়া উঠিল। রাগটাও তাহার খুব অকৃত্রিম ছিল না। রাগের কথাও কিছু ব্রজদাসী বলে নাই, তবে দুলালকে লজ্জা দিয়াছিল, লজ্জা পাইয়াই দুলাল রাগ করিয়া সে লজ্জা ঢাকিতে চাহিয়াছিল। এবার সে খুশী হইবার সুযোগ পাইয়া—খুব বেশী রকমে খুশী হইয়া

উঠিল, মায়ের হাতখানা ধরিয়া টানিয়া বলিল—লক্ষ্মী মা রে আমার—লক্ষ্মী মা!

—ছাড়—ছাড়।

—ব'স—ব'স—। শোন সেই কথাটা।

—বল্।

—অনেক ভেবে দেখলাম—এ—কদিন। বুঝেছিস! তোর কথাই ভাল। বোষ্টুমের ছেলে—নিজের জাত-ধর্ম মেনেই চলা উচিত। ও ভগবান বল্ ভূত বল্ বুঝলি কিনা—আছে বললেই আছে—নাই বললেই নাই।

ব্রজ ছেলেকে আর বলিতে দিল না, গভীর আবেগে তাহার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিল।

—আঃ, আমাকে বাঁচালি বাবা, আমাকে বাঁচালি!

দুলাল আনন্দে হাসিল। স্বভাব মত হা-হা—করিয়া হাসিল না, নিঃশব্দে হাসিল।

ব্রজ বলিল—দেখবি, তোর ভাল হবে। পরে বুঝতে পারবি।

আবার বলিল—ভগবান—গোবিন্দ—শ্যাম—ওঁর চরণ ছাড়া আশ্রয় আছে আর?

আবার বলিল—ভগবান আছেন। নাই—একথা যে বলে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর নাই দুলাল! মা-মরা ছেলেও তো সংসারে বাঁচে। সংসারে যারা ভগবান মানে না—তাদের বাঁচা ওই মা-মরা ছেলের মত বাঁচা!

কথাটা বলিয়াই ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—গোবিন্দ গোবিন্দ! জয় রাধে গোবিন্দ!

দুলাল বলিল—তুই তা হলে মরে ছিলি এতদিন? আজ বাঁচলি!

দুলাল ব্রজদাসীর মুখের দিকে চাহিল।

—আমি তো জানতাম না এতদিন ভগবানকে! এতদিন তা হ'লে ভূত হয়ে ছিলি। আজ আবার বাঁচলি!

ব্রজ হাসিল। বলিল—হ্যাঁ। সে নামের যে গুণই ওই। 'নামের গুণে গহন বনে মৃততরু মুঞ্জরে।'

দুলাল হঠাৎ বলিল—আমি কিন্তু সিগরেট খাব। বলতে পাবে না বষ্টুমের ছেলে খেতে নাই।

—না রে না। তা বলব না। বৈষ্ণব মহান্তেতে গাঁজা খায়। খেতে বারণ শুধু মদ।

—তা জানি। তবে তোমার ওই গুরুটি, ওই নরোত্তম দাস বাবাজী ওটি যে কঠিন লোক। উনি যে পান পর্যন্ত খান না। তার চেলা হয়েছ—বিশ্বাস কি—কোন দিন বলতে পার।

—না তা বলব না। ব্রজ হঠাৎ ছুটিয়া গেল, চড়াই পাখীর ঝাঁক নামিয়া পালংশাকের কচি পাতাগুলি কাটিতে শুরু করিয়াছে।—ওরে বাপ্‌রে—বাপ্‌রে।

ব্রজ ছুটিয়া ছুটিয়া ছোট মেয়েটির মত চড়ুই পাখী তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। মনের আনন্দ আজ তাহার আগুন দেওয়া তুবড়ির ফুলের মতই উচ্ছ্বসিত বেগে উপরে উঠিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে রূপালী সোনালী ফুলের মত।

সন্ধ্যায় দুলালকে সে আসরে নিজের পাশে লইয়া বসিল। আরতির সময় তাহার হাতেই দিল কাঁসর। দুলাল বিন্দে পড়িল। ব্রজদাসীর ছেলে হইয়াও তাহার তাল-জ্ঞান নাই। কোনমতেই ঠিক্ সময় সমান রাখিয়া ঘা মারিতে পারে না।

মহেশ্ হাসিল। কাঁসরখানা দুলালের হাত হইতে লইয়া গোবিন্দ পালের হাতে দিল।—বাজাও। ও আমারই মত তালকানা!

আরতির শেষে কীর্তন গানের সময়ও ব্রজদাসী তাহাকে পাশে লইয়া বসিল। গানের সময় দুলাল মায়ের পাশে থাকিতে ভালবাসে। গান তাহার আসে না, কণ্ঠস্বর কর্কশ, তাল-জ্ঞান নাই—তবু ব্রজদাসী গাহিলে সে নীরব হইয়া শোনে—আর আপন মনেই দোলে, এ দোলাটা কিন্তু ঠিক তালে তালে দুলিয়া যায় সে, বিন্দুমাত্রও ভুল হয় না।

গান শেষ হইলে ব্রজদাসী মহেশ মণ্ডলকে বলিল—তুমি একটু থেকে যেয়ো মোড়ল। আমার ক'টা কথা আছে।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রজ গোপালের মন্দিরের দরজায় বসিয়া বলিল—দুলাল আমার কাছে কথা দিয়েছে মোড়ল—সে আর ওসব বাস-টাসের চাকরি করবে না।

মহেশ বলিল—আমি তো অনেক আগেই বলেছি মা-জী, ওই দিকেই যখন ওর মতি তখন চাকরি না করে—একখানা বাস কিনে—

—না মোড়ল। দুলাল আমার ভগবানের সেবাই মাথায় তুলে নেবে। ওসব চাকরি ছেড়ে দেবে, এখন আখড়াতে আমার কাছেই কিছুদিন সেবার খুঁটিনাটি শিখুক, তারপর মান-গোবিন্দপুর পাঠিয়ে দেব—কি নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেব—সেখানে দীক্ষা নিয়ে পড়াশুনো করে ফিরবে। কিন্তু তার আগেই আমি ওর বিয়ে দিতে চাই মোড়ল—

বিয়ে? দুলালের—! মহেশ যেন কথা বলিতে গিয়াও পারিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভগবান তোমার ইচ্ছাই সব।

ব্রজ বলিল—না, ওসব কথা শুনব না আমি। ভাল একটি মেয়ে দেখে মালাচন্দনের ব্যবস্থা কর। ওকে আমি ভাল করে বাঁধব।

মহেশ চুপ করিয়া রহিল।

ব্রজ বলিল—না, চুপ ক'রে থাকলে হবে না। তুমি যা ভাবছ তা আমি জানি। কিন্তু যে ক'রে হোক এটি করতেই হবে।

—বাবাজীকে আমি শুধাব ব্রজ।

—আমি কলঙ্কের পশরা মাথায় তুলে নিয়েছি মোড়ল। আবার ওর জন্যে যে জাতের মেয়ে হোক, তাকে বউ ক'রে ঘর করতে রাজী আছি। টাকা দিয়ে কিনে আনতে হয় কিনে আন তুমি। সংসারে দুলালের মত আরও অনেকেই তো জন্মায় মোড়ল। শুধু মেয়েটি একটু সুশ্রী হ'লেই হ'ল। এ আমি করব। বাবাজী বারণ করলেও আমি শুনব না। আর তুমি যদি না এগিয়ে এস এ কাজে, তবে আমিই পা বাড়াব। আমিই খুঁজে আনব মেয়ে।

মহেশ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। এত কথার পরেও হাঁ-না কিছু বলিল না—অথবা বলিতে পারিল না। ব্রজদাসী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি জান? পর-মুহূর্তেই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—থাক্, পৃথিবীতে আমাকে যে যত দুঃখ দেয় দিক, আমি কাউকে দুঃখ দেব না। আচ্ছা তুমি এখন এস মোড়ল। দুলাল একা আছে, আমি যাই।

সে উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পাঁচ

ব্রজদাসী মহেশ মণ্ডলকে বলিল—কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়া সে দুলালকে কোলে পাইয়াছে, কিন্তু সে কলঙ্কের সত্য মূল্য কি সে কথা ব্রজদাসী জানে। লোকে সত্য জানে না—তবে অনুমান করে। অনুমান কেন ব্রজ নিজেই বলিয়াছিল একদিন—"বৈষ্ণবীর দেহ-মন প্রভুর চরণে উৎসর্গ করতে হয়; এ দেহ শুধু গন্ধপুষ্প ফুটে ভক্তির চন্দনে লিপ্ত হয়ে তাঁর চরণতলে পড়ে শুকিয়ে যায়। এতে তো ফল হবার কথা নয় বাবা। কিন্তু"—বিচিত্র হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—বলিয়াছিল—"কিন্তু আমার ভাগ্য অদ্ভুত আর প্রভুর লীলা অদ্ভুত—তাই সেই পূজো করা ফুলে ফল ধরল! কি করব বলুন বাবা! তবে হ্যাঁ—মানুষকে দেখলাম—মানুষই দেবতা—আপনাদের মাঝেই আমার প্রভুর বাস—তাই করুণার অভাব হল না, কোনদিন দুঃখ পেলাম না; কোনদিন আপনারা জিজ্ঞাসা করলেন না, ওগো বোষ্টমের মেয়ে এ তোমার কেমন ধারা, এ কি আচরণ, প্রভুর চরণে সকল ফল সমর্পণ হ'ল তোমাদের ধর্ম কিন্তু তোমার কোলে ফল? ছি—ছি—ফল সঁপতে গিয়ে ফল চুরি করেছ তুমি।" আবার বলিয়াছিল—"শুধু তাই নয় বাবা—ধিক্কার দেওয়া দূরের কথা, পাপের ফল বিষ হল ব'লে—দূরে ফেলে দেওয়া দূরের কথা, আপনারা সমাদর ক'রে মাথায় ক'রে নিলেন। আপনারাই আমার দেবতা। শুধু যার পাপে আজ আমার—" বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়াছিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—"না, আজ কাউকে দোষ দেব না বাবা, নিজেকেও গাল দেব না, ভুল—পাপ হয় মানুষের মনের ভুলে; সে ভুলের সাজা ভগবান মানুষকে দেন না—সে সাজা মানুষ নিজেই নেয়; আমি যেমন নিচ্ছি, সেও তেমনি নিচ্ছে। আমার প্রভু তাকে মার্জনা করুন। হে গোবিন্দ—তুমি তাকে মার্জনা করো।" হাত জোড় করিয়া সে প্রণাম জানাইয়াছিল প্রভুর চরণে।

ব্রজদাসী তাহার ধর্ম অনুযায়ী তাহার অন্তরের উপলব্ধি মত কথাটা সত্যই বলিয়াছিল। এ গ্রামে গোলের আখড়া স্থাপন করিয়া যেদিন নরোত্তম দাস বাবাজী তাহাকে আখড়ায় সেবার ভার ও সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন সেদিন ব্রজদাসী মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিল; ভাবিয়াছিল এই লইয়া গ্রামে এবং গ্রামান্তরের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা কুৎসিত আন্দোলন হইবে। বাবাজী এবং মহেশ মণ্ডলকে সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিল—না কাজ নাই। আমি বরং আখড়ায় দাসীর মত থাকব। আমার কলঙ্ক আমি সইতে পারব। কিন্তু ওই দুগ্ধপোষ্য শিশু, ও যদি মনে হয় দুঃখ পায়—ব্রজদাসী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি মিথ্যে ভয় করছ ব্রজ। একটা কথা তুমি জান না। কিম্বা ইচ্ছে করে ভুলে যাচ্ছ। তুমি এখানকার লোকের চিত্ত জয় করে বসে আছ। প্রভু আমার শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ব্রজদাসী, কলঙ্ক তোমার মাথায় দিয়েছেন—তোমাকে আরও মনোরমা করবার জন্যে। চাঁদের অঙ্গে কলঙ্কের জন্যেই চাঁদকে লোকে বেশী ভালবাসে। তোমার রূপ আর কণ্ঠ দিয়ে তুমি মানুষের মন জয় করেছ—তোমার কলঙ্ক নিয়ে লোকে কথা কয় আড়ালে—কিন্তু তার জন্যে ঘৃণার চেয়ে করুণা পাও বেশী। দু চার জন আপত্তি হয়ত করবে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই খুশী হবে। তুমি দেখো।

বাবাজীর কথাই সত্য হইয়াছিল—গ্রামান্তরের দুই-চারিজন মহান্ত আসে নাই প্রতিষ্ঠা উৎসবে, তা ছাড়া সকলেই আসিয়াছিল। খুশী হইয়াছিল।

ব্রজদাসী সেই সাহসে বলিল—'আমি নিজে খুঁজে আনব মেয়ে।' দুলালকে সে বাঁধিবে। বৈষ্ণবী ব্রজদাসীর চোখে একটি ছবি ভাসিয়া উঠে। তাহার বাপের আখড়ায় উঠানের মধ্যস্থলে একটি বকুল গাছ ছিল, সেই গাছটার দুই পাশে ছিল দুইটি লতা, মাধবী আর মালতী। বকুলের কাঠ শক্ত কাঠ, সেই কাঠের কাণ্ডটায় ওই লতা দুইটি এমন পাকে পাকে জড়াইয়াছিল যে গাছটা লোহার শিকলে বাঁধা মানুষের মত আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সারাটা কাণ্ডের উপরের মোটা ডাল-গুলিতে লতার পাক কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। সে শুধু লজ্জা পায় নিজের কাছে, ধিক্কার দেয় নিজেকে, মনে হয় সে জড়াইয়া ধরিতে পারে নাই—তাই তাহার পাক খসিয়া পড়িয়াছে; তাহাকে পথে বাহির হইতে হইয়াছে। সে তাই মনে মনে সংকল্প করিল—শক্ত মেয়ে, যে মেয়ে পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারিবে এমন মেয়ে সে খুঁজিয়া আনিবে। যাহার রূপে থাকিবে ফুলের মাধুরী—বেষ্টনে থাকিবে মাধবীলতার পাকের দৃঢ়তা। একবার জড়াইয়া ধরিতে পারিলেই ব্রজদাসী নিশ্চিন্ত। ইহাতে নরোত্তম দাস বাবাজী নিষেধ করিলেও সে শুনিবে না। মহেশ মণ্ডলের উপর তাহার রাগ হইয়া গেল—তাহার কথা সে মনেই আনিল না।

দুলাল সম্পর্কে তাহার একটি কল্পনা আছে। সন্তান সম্পর্কে বৈষ্ণব মায়ের অতি স্বাভাবিক —অতি সাধারণ কল্পনা একটি।

জাতিধর্ম, কৌলিক সাধনা, নিজের জানা ও চেনা পৃথিবীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবি—এই সমস্তের সঙ্গে মিলাইয়া সে রচনা করিয়াছিল তাহার সাধ। দুলাল তাহার গুরুগিরি করিবে। একজন গোস্বামী মহান্ত হইবে। নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার গুরুতুল্য, কিন্তু নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার আদর্শ নয়। নরোত্তম দাস বাবাজীর খানিকটা সে যেন বুঝিতে পারে না, ধরিতে পারে না। ইংরাজী লেখাপড়া জানা এতবড় চাকরে সব ছাড়িয়া মনেপ্রাণে বৈষ্ণব হইয়াছেন—বেশ-ভূষায় কথায়-বার্তায় ভাবে-ভঙ্গিতে সে আমলের সব কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন —তবুও যেন কোথায় খানিকটা কিছু আছে সেটুকু ব্রজদাসী তাহাদের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। সেটুকু বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে যখন বাবাজীর ছেলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। তখন আর একটা মানুষ বাহির হইয়া আসে বাবাজীর ভিতর হইতে। বাবাজীর আখড়াতে তখন ঢুকিতে ভয় হয় ব্রজদাসীর। তাই নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার কল্পনা নয়।

বহুদিন পূর্বে নবদ্বীপ ধামে সে দেখিয়াছিল এক তরুণ গোস্বামীকে। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, সুস্থ সুন্দর দেহ, তেমনি কমনীয় কান্তি, বড় বড় চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, কামানো মুখ, কামানো মাথা, গলায় মোটা তুলসীর কণ্ঠী, কপালে তিলক, নাকে রসকলি—সে যেন মানুষটি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে কলহকোলাহলের মধ্যে ভাষার মধু বিলাইয়া দিতে। সে কি মধু—কণ্ঠস্বরে মধু—উচ্চারণে মধু—ভঙ্গিতে মধু—তেমনি কি বাছাই করা মধুর প্রতিটি শব্দ! এক সন্তানহারা মাকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিল, তাঁহারও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি কথা বলিতেছিলেন। পরের দিন দেখিয়াছিল—জননীটির কোলে মাথা দিয়া তিনি শুইয়া আছেন; সন্তানহারা মা—হারানো সন্তানকে যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন, সস্নেহে হাত বুলাইতেছেন গুরুর সর্বাঙ্গে। বৈষ্ণবের মেয়ে সে সর্বান্তঃ-করণে বিশ্বাস করে এই তত্ত্বে। বুদ্ধি দিয়া বিচার বা যাচাই করিতে কোন দিন যায় নাই, এক-জনকে সাধনার সঙ্গী করিতে গিয়া সে ঠকিয়াছে, তবু সে বিচার করে নাই, হৃদয় দিয়া বিশ্বাস করিয়াছে - যে তাহাকে ঠকাইয়াছে, ঠকিয়াছে সেই; ঠকিয়া যে দুঃখ সে পাইয়াছে, সে দুঃখ সোনা হইয়া জমা হইয়া আছে তার বুকে। এই হৃদয়ের বিশ্বাস-বলেই ওই গুরুটিকেই তাহার

সুন্দর মনে হইয়াছে—পবিত্রতম মানুষ মনে হইয়াছে—কতবার নিজেকেই শুনাইয়া বলিয়াছে—যে ছেলে-হারানো মায়ের খালি বুক ভরিয়া দিতে পারে—পুত্রশোকের শূল-বিদ্ধ চোখের অশ্রুধারার ছিদ্রপথ অমৃত-কাজল পরাইয়া নিরাময় নিরশ্রু করিয়া তুলিতে পারে, তাহার চেয়ে বড় কে—এর চেয়ে মধুর মানুষ কে ?

তাহার দুলাল এমনি একটি মানুষ হইবে। এমনি গুরু গোস্বামী! দুলালের রং কালো। রূপের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কিন্তু এমনি শিক্ষা—এমনি স্বভাব—এমনি হৃদয় যদি তাহার হয়, তবে এই কালো মানুষের মধ্যেই রূপ ফুটিয়া উঠিবে নীল কাচের বাতি-দানের, স্নিগ্ধ শান্ত কোমল, এমনি নমনীয় এমনি কমনীয়—মাড়াইয়া গেলেও ফুটিয়া ব্যথা দিবে না ; অথচ আসল স্থান হইবে তাহার মানুষের মাথার উপর। কল্যাণের আশীর্বাদ বর্ষণ করিবে সে অজস্র ধারায়। লেখাপড়া শিখিবে, চরিতামৃত পড়িবে, ভাগবত পাঠ করিবে, লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিবে। দুলালের কণ্ঠস্বর ভাল নয়, গানের গলা তাহার হইবে না এটা সে বুঝিয়াছে—কিন্তু পদাবলী কণ্ঠস্থ থাকিবে, গাহিতে না পারুক, সুরের রেশ গলায় আনিয়া আনিয়া আওড়াইয়া যাইতে তো পারিবে। দুঃখী জনকে বলিতে তো পারিবে—'মহাজনের বাক্য মা, সংসারের এই তো সার সত্য। চণ্ডীদাস প্রভু'—দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিবে—'সব মহাজনের সেরা মহাজন বলেছেন কি জান ?

সুখ দুখ—দুটি ভাই।
কহে চণ্ডীদাস—শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দু'টি ভাই।
সুখের লাগিয়া—যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

তাহার পর নবদ্বীপের সেই গোস্বামী প্রভুর মতই বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিবে—'মা গো, অন্ধকারে মানুষ থাকতে পারে না। রাত্রে ভাবে কখন দিনমণির উদয় হবে। আলো ফোটে—পৃথিবীতে জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ মানুষ কলরব করে ওঠে কি আনন্দ—কি আনন্দ বলে, বৃক্ষ-লতায় ফুল ফুটে ওঠে। মা, ভেবে দেখ, অন্ধকার তখন সকলের দেহকে ঘিরে-জড়িয়ে ধরে, দেখো মা, তুমি চলবে—তোমার পিছনে পাশে চলবে তোমার ছায়া, গাছের তলায় দাঁড়াবে ছায়া—সে তো এই অন্ধকারই মা। আরও ভেবে দেখ—ওই আলোই তাকে ফোটায়। সুখ আর দুখ—আলো আর অন্ধকার—যমজ দু'টি ভাই। এড়ানো যায় না মা।' কথাগুলি সেই নবদ্বীপের কথা—ব্রজদাসীর আজও কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

এমনি কল্পনা সে করে তাহার দুলাল সম্পর্কে। গোস্বামী হইলে কি নাম হইবে দুলালের সে পর্যন্ত সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে—'গোপালদাস গোস্বামী!'

ব্রজদাসীর সেই পুরানো কল্পনা আজ আবার নূতন করিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চোখে তাহার জল আসিল। বৈষ্ণবী সে—সে তো জানে বহুভাগ্যের এই মানব জন্ম সার্থক-অসার্থক হয় জীবনের কর্মফলে। হতভাগ্য দুলাল, এই বহুভাগ্যের মানব জন্মে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে পাপের পথে। পাপ তাহার রক্তের কণায় কণায় বন্যার জলের আবিলতার মত মিশিয়া রহিয়াছে, প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই বেগের মুখে বাঁধ দিয়া ব্রজদাসী তাহাকে সরোবরের মত বাঁধিবে। ধীরে ধীরে সমস্ত আবিলতা ময়লা মাটি—থিতাইয়া নিচে বসিয়া যাইবে, জীবনের রক্তধারা হইবে নির্মল—কাজল দীঘির জলের মত শান্ত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, তখন তাহাতে ফুটিবে—ওই যে পাপ—ওই পাপের পাঁক হইতে ফুটিয়া উঠিবে পদ্ম। এই প্রবল

বন্যার মুখে সে দিবে মাটির বাঁধ। মনে পড়ে তাহার প্রথম জীবনের গুরুর কথা। বাউল বলিত—জান গো—এই মাটি আর তোমরা কোন প্রভেদ নাই। প্রভু আমার বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এলেন প্রেম—শান্তি—মুক্তির ধারার মত। ধরবে কে তাঁকে? মা গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে এলেন—মাথা পেতে তাকে ধরলেন—ভোলা মহেশ্বর। আমার প্রভুকে কে ধরবে? তাঁকে ধরলেন—মা যশোদা, কোল পেতে দিলেন। তারপর? কোলেই ত তিনি বাঁধা থাকবেন না! তাঁকে দুই হাত বাড়িয়ে দুই তীরের মত ধরবে কে? ধরলেন শ্রীমতী! জয় রাধা! জয় রাধা! জয় রাধা! গোবিন্দ আমার মুক্তি শান্তি প্রেমের স্রোত—রাধা আমার তীর। তাই তো যত ভাঙনের দুঃখ আমার শ্রীমতীর বুকে গিয়ে লাগে।

দুলালকে সে কোল পাতিয়া ধরিয়াছে। এইবার চাই তাহাকে বাঁধিবার মত দুখানি হাত। একটি কিশোরী মেয়ে। কণ্ঠস্বর হইবে মিষ্টি। রূপসী মিলিবে না—কিন্তু শ্রীমতী মেয়ে খুঁজিলে মিলিবে! মাজিয়া ঘষিয়া সে তাহার রূপকে বাহির করিবে।

নিজের যৌবন-কালের কথা মনে পড়ে।

রাধা গোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া সে কি আনন্দ, সে কি লীলা মাধুরীর রসের তন্ময়তা! দোল যাত্রায়—বাসন্তী পূর্ণিমায়। পুষ্পসজ্জা—রঙের পিচকারী লইয়া খেলা, ঘোর বর্ষায়—শ্রাবণ পূর্ণিমায় মেঘ ঢাকা চাঁদের কুয়াসার মত জ্যোৎস্নায় ঘরের মধ্যে ঝুলনা ঝুলাইয়া খেলা—সে সব এক স্বর্গ-সুখের স্মৃতি! ভাবিতে গেলে আজও শরীর যেন আবেশ-বিবশ হইয়া যায়, চোখে জল আসে। সেই রসাস্বাদনের মধ্য দিয়া দুলালকে সে রাধাশ্যামকে চিনাইয়া দিবে। একবার চিনাইয়া দিতে পারিলে—আর ভয় নাই। মানুষের মন ভ্রমরের মত—পদ্মের সন্ধান যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সে ছুটিয়া বেড়ায় ফল ফসলের ক্ষেতে-ক্ষেতে। কিন্তু পদ্মের সন্ধান পাইলে সে আর ফেরে না। ওই পদ্মবনেই গুন গুন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—ক্লান্ত হইলে ওই পদ্মপাতায় ঘুমাইয়া পড়ে। পদ্ম তুলিতে গিয়া কত পদ্মদলের মধ্যে মরা ভ্রমর ব্রজ দেখিয়াছে!

পরদিন হইতেই সে মেয়ের খোঁজ শুরু করিল।

দুলালকে খাওয়াইয়া সে বলিল—তুই থাক বাছা, নিজেই একটু চা করে খাস। আমি আজ একবার ঘুরতে যাব।

—ঘুরতে যাবি? কোথা?

ব্রজ কথাটা ভাঙিল না। বলিল—এই বাবা, পাঁচটা গেরস্ত বাড়ীতে মায়েদের সঙ্গে ভাবসাব আছে; ভালবাসেন, দয়া করেন,—তোর আজ দু'মাসের ওপর অসুখ—যেতে পারি নাই। একবার যাই ঘুরে আসি—দেখা ক'রে আসি।

দুলালের ভুরু দুইটা কুঁচকাইয়া উঠিল—মায়ের এই ধরণ এই প্রবৃত্তিটা সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না। 'ভালবাসেন—' বেশ কথা, দয়া করেন কি! দয়ার কি ধার ধারে তাহারা? কি প্রয়োজন দয়ার? কি অভাব আছে তাহাদের? আর অভাবই যদি থাকে—তবে সে অভাবের জন্য পরের কাছে হাত পাতিবে কেন? এইজন্যই—এইজন্যই তাহার মাথা ন্যাড়া করিয়া তিলক কাটিয়া কণ্ঠী পরিয়া মহান্ত হইতে ঘোরতর আপত্তি। এই করিয়া—এমনই অভ্যাস হইয়াছে তাহার মায়ের—যে—অভাব না থাকিলেও ভিক্ষা না করিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। —হরি বলিলেই এক মুঠা চাল,—ওই একমুঠা চালের জন্য তাহার মায়ের লোভের অন্ত নাই।

ব্রজ হাসিয়া বলিল—খোকনের আমার মা দু'দণ্ড বাইরে গেলেই সব অন্ধকার। বেশী দেরি করব না আমি! বিকেলেই ফিরব। এসে সন্ধ্যে জ্বালব, আরতি আছে—

—না—না। দুলাল গর্জন করিয়া উঠিল।—তার জন্যে নয়।

—তবে কি ?

আমার মাথা—আর তোর মুণ্ড। যেতে পাবি না তুই। ভিক্ষে করবি কি ? কিসের জন্যে ভিক্ষে করবি ? অভাব কি তোর ?

—ভিক্ষে বৈষ্ণবের ধর্ম দুলাল। অভাবের জন্য নয় বাবা। রাজা রাজ্যপাট ছেড়ে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে প্রভুর নাম নিয়ে পথে বের হন। ও না হ'লে তাঁকে বুকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁরও দয়া হয় না।

—যা—যা বাপু, যেখানে যাবি! যা করবি কর গে। কানের কাছে তত্ত্বকথা বকিস না।

সে একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে শুরু করিল।

ব্রজদাসী ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুলাল একা বসিয়া ওই কথাই ভাবিতে লাগিল। গোটা আখড়াটা যেন রাত্রির পৃথিবীর মত স্তব্ধ, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে যেন। গরমিলের মধ্যে দুই চাঁরিটা পাখী কল কল করিতেছে আর গোটা-চারেক কাঠবিড়ালী চিক্ চিক্ শব্দ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুইটা কাক সুযোগ-মাফিক ছোঁ মারিয়া কাঠবিড়ালীগুলিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। আশ্চর্য চাতুর্যের সঙ্গে কাঠবিড়ালীগুলি আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে; কাক ছোঁ মারিবার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা সরিয়া গিয়া কোন গাছের আড়ালে বা লাফ দিয়া গাছটার কাণ্ডের উপর উঠিয়া পড়িয়া লেজ ফুলাইয়া দাঁত দেখাইয়া খানিকটা নাচিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।

দুলাল ভাবিতেছিল—বৈষ্ণব মহান্ত হওয়ার কথা। ন্যাড়া মাথায় এক গোছা টিকি, গলায় তুলসীর মালা, নাকে কপালে তিলক সমেত নিজের রূপ কল্পনা করিতে গিয়াই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। পরনে খাটো থানকাপড়ের বহির্বাস। দূর! কিম্বা মাথায় লম্বা চুল রাখিয়া দাড়ি গোঁফ রাখিয়া আলখাল্লা পরিয়া কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা করিয়া;—দূর!

আর এই ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা—যাহার সঙ্গে দেখা হইবে তাহাকেই সবিনয়ে প্রণাম করিয়া প্রভু বলিয়া সম্বোধন করা;—দূর!

এক একবার এক একটা ছবি কল্পনা করিল—আর সরবে 'দূর—দূর' করিল—পাগলের মত। তাহাতে কাক দুইটা পলাইয়া গেল।

দুলালের কল্পনা—মায়ের কল্পনার বিপরীত।

সে বাসের ড্রাইভার হইবে। মোটর চালানো ইতিমধ্যেই সে শিখিয়া ফেলিয়াছে। আজ চার বৎসর ধরিয়া গাড়ীর কাদামাটি ধুইয়াছে, ড্রাইভার মহাবীর প্রসাদের কত সেবা করিয়াছে, এঁটো বাসন ধুইয়াছে, পা টিপিয়াছে, তবে মহাবীর তাহাকে মোটর চালানো শিখিবার সুযোগ দিয়াছে। মনে আছে তাহাদের বাস্ একবার দুমকা রিজার্ভ গিয়াছিল। ফিরিবার পথে সাঁওতাল পরগণার সুন্দর নির্জন পথে মহাবীর খালি বাসখানা প্রথম তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ওঃ, সে কি আনন্দ—সে কি স্ফূর্তি। বিলকুল দুনিয়া যেন লাট্টুর মত তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। হু-হু করিয়া পাশের মাঠ পিছনে ছুটিয়া চলিল। অদ্ভুত একটা আনন্দ।

এ সব ছাড়াও আছে।

এ আখড়া হইতে বাহির হইয়া ডাহুকী বহুকী পার হইয়া ক্রোশ খানেক মাঠের পরে এক বিচিত্র পৃথিবীর সন্ধান সে পাইয়াছে, চঞ্চল দুরন্ত কোলাহল-মুখর উগ্র যুদ্ধমান এক পৃথিবী।

কিছু-না-কিছু সেখানে অহরহ লাগিয়াই আছে। এই শান্ত নির্জীব, দীনতায় নত, ভীরু গ্রামগুলি হইতে সে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ; একেবারে পৃথক পৃথিবী।

সেখানে প্রায় প্রত্যেকটি আবর্তের মধ্যে দুলাল আছেই। সেখানে দুলাল—দুলাল নয়, সে সেখানে বিরিঞ্জনন্দন ;—নামটা সে নিজেই লইয়াছে! ব্রজদাসীর বেটা সে বিরিঞ্জনন্দন।

—মা-জী! মা-জী রয়েছেন? মহেশ মণ্ডল আসিয়া আখড়ায় প্রবেশ করিল।

দুলাল চমকাইয়া উঠিল।—কে? পরক্ষণেই মহেশ মণ্ডলকে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই লোকটাকে সে দু-চক্ষে দেখিতে পারে না। এই মহেশ মণ্ডলকে আর ওই নরোত্তমদাস বাবাজীকে।

এক এক সময় মনে হয়—দুই জনকেই সে খুন করিয়া ফেলে।

লোক দুইটাকে লইয়া তাহার সম্পর্কে লোকে কুৎসিত কথা বলে। বলে, উহাদের একজন কেহ তাহার জন্মদাতা!

কথাটা শুনিলে কি মনে হইলে—তাহার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। একবার এই গ্রামের জগৎ মণ্ডলের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছিল। লোকটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিল—মটরের ড্রাইভারি শিখে একটা মটর কিনে ফেলবি—দুলাল।

দুলাল বলিয়াছিল—চাট্টিখানি কথা নয়—। মটর কেনা সোজা ব্যাপার বুঝি? দাম জান? ধান বেচে হয় না।

—হয় রে হয়। মহেশ মণ্ডলের ধান কত দেখেছিস তো? মোড়লকে বললেই মোড়ল দেবে একটা বাথার ছেড়ে, তোর মাকে বলিস—বলবে মোড়লকে—

সঙ্গে সঙ্গে দুলাল তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছিল।

দুলাল এই কারণেই ওই বাবাজীকে আর মণ্ডলকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। মনে হয় উহারাই তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু।

ব্রজদাসী ভাবে—মুখেও সে সকলের কাছে বলে—মানুষেরা এত ভাল যে সমস্ত জীবন তাহাদের দাসীত্ব করিলেও তাহাদের জীবনের ঋণ মিটিবে না। দুলালকে কোলে লওয়ার মত এত বড় অপরাধ—দুলালের জন্মের অপরাধ—ক্ষমা করিয়াছে মানুষেরা।

ব্রজদাসীর কথা আংশিক ভাবে সত্য।

ক্ষমা করিয়াছে, ব্রজদাসীকে স্নেহ সকলেই করে—তবু কথাটা তাহারা মধ্যে মধ্যে বলে।

ব্রজদাসী জানে সে কথা। জানিয়াও ঐ কথা বলে।

দুলাল কিন্তু ভাবে বিপরীত কথা। সে বলে হারামজাদার দল সব। শূয়ারের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা! সামনে বলতে সাহস নাই কিন্তু আড়ালে অহরহ ঐ কথা—ঐ চিন্তা ওদের। ক্ষমা! ক্ষমা না—ওই বোষ্টমী বেটীর মুণ্ডপাত। বেটীর মুণ্ড ধুলোয় লুটিয়েই আছে। লাথি মেরে যায় লোকে—বেটী ভাবে—আশীর্বাদ করছে। আমার কাছে কিন্তু ওসব চলবে না বাবা। হাম হ্যায়, ব্রিজনন্দন, মারে গা ডাণ্ডা—দনাদন্,—দনাদন্! দুনিয়া ছোটলোকের দুনিয়া, শেয়ালে ভরা জঙ্গল ; এখানে যারা বাঘ তাদেরই বিপদ। শেয়ালদের ভালবাসলেই সর্বনাশ। ফেলবে ফাঁদে, তারপর হুক্কাহুয়া করে মনের আনন্দে চেঁচাবে আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। মারো থাবা শেয়ালদের, ব্যাস ঠাণ্ডা রহেগা। হাম ব্রিজনন্দন—হাম বাঘ—কেয়া নাম হ্যায়—শের হ্যায়!

এ অহঙ্কার দুলাল করিতে পারে।

দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি। ষোল বছরের দুলালকে বিশ-বাইশ বছরের জোয়ান বলিয়া ভ্রম হয়।

মনে তাহার ভয় বলিয়া কোন উপলব্ধি নাই। শৈশব হইতে সে অন্ধকার ঘরে একা পড়িয়া থাকিত। ব্রজদাসী যাইত ভিক্ষায়। বাল্যকালটা তাহার বাগ্দীদের ছেলেদের সঙ্গে ভাহুকীর তীরের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া কাটিয়াছে। বাগ্দী বুড়া রতন ক্ষ্যাপার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে। বাগ্দীবুড়ার ক্ষ্যাপা মায়ের আশ্রমে মড়ার খুলি ছড়ানো থাকিত; সে তাহারই মধ্যে বসিয়া থাকিত, মড়ার খুলি লইয়া খেলা করিত, কতদিন ওখানেই ঘুমাইয়া পড়িত।

দেহে যাহার প্রচণ্ড শক্তি, মন যাহার ভয়-লেশহীন—সে নিজেকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করিলে —আত্মগৌরবের জন্য নিন্দনীয় হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা গৌরব করার জন্য উপহাসের পাত্র হয় না! লোকে দুলালের অহঙ্কারে ক্ষুব্ধ হয়—বিরক্ত হয় কিন্তু হাসিতে পারে না।

মহেশ মণ্ডল আসিতেই দুলাল ভুরু কুঁচকাইয়া ফিরিয়া চাহিল—বলিল, বাড়ীতে নাই।

মহেশ যেন একটু বেশী রকম নিরাশ হইল। বোধ হয় খুব বেশী উৎসাহ লইয়া কোন কথা বলিতে আসিয়াছিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল বেচারা, তাহার পর বলিল—গেলেন কোথা?

—কে জানে! ভিখারীর বেটী ভিখারী, 'স্বভাব যায় না মলে, ইল্লোত যায় না ধুলে'—ভিখ মাগতে বেরিয়েছে।

মহেশ আসিয়া দুলালের কাছে বসিল। সস্নেহে বলিল—আঃ—কি দেহ কি হয়ে গিয়েছে! বড় ফাঁড়া গেল তোর। যাক্—প্রভুর দয়ায় বেঁচে উঠেছিস—এই ভাগ্যি।

দুলাল শুধু বলিল—হুঁ।

মহেশ আবার একটু হাসিয়া বলিল—মা-জী তাহলে কন্যের খোঁজে বেরিয়েছেন!

—কিসের খোঁজে?

—কন্যের খোঁজে। কাল রাত্রে আমাকে বললেন—দুলালের আমি মালাচন্দন দোব—যোড়ল—আপনি একটি কন্যে দেখে দেন। আমি নিজেও খুঁজব—আপনিও দেখুন।

দুলাল ক্রোধে এবং বিস্ময়ে চোখ দুইটাকে বিস্ফারিত করিয়া একদৃষ্টে মহেশ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ বলিল—তা' আমি ভেবে দেখলাম—মা-জীর এ সংকল্প—ভাল,—খুব ভাল—

দুলাল অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাই-ও, তুমি চুপ কর বলছি।

মহেশ চমকিয়া উঠিল। মহেশ মণ্ডল বিশাল পুরুষ, তাহার দুর্দান্ত সাহস, ভয় পাইয়া চমকায় নাই সে, অতর্কিতে এমন চীৎকার শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—চলে যাও, চলে যাও—আখড়া থেকে তুমি চলে যাও বলছি।

—কি হ'ল কি তোর?

—কিছু হয় নি।

—তবে এমন চেঁচাস কেন?

—বিয়ে আমি করব না। খবরদার ওসব কথা বলবে না।

—বিয়ে করবি না?—অবাক হইয়া গেল মহেশ মণ্ডল।

—না—না—না।

পরক্ষণেই সে উঠিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া নিজের ঝোলাটা ঝুলাইয়া জামাটা গায়ে দিতে-দিতেই সে আখড়া ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মহেশ বিস্মিত বিব্রত দুইই হইল—জিজ্ঞাসা করিল—তা' চললি কোথারে বাপু ?

—মানগোবিন্দপুর।

—ওই! এই রোগা শরীর নিয়ে, দুলাল ওরে—

—এ্যার্থ্। পেছন থেকে মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করো না বলছি!

দুলাল আর দাঁড়াইল না। সে মাঠের পথে বাহির হইয়া গেল।

বিয়ে! বিয়ে একটা তিলক-ফোঁটা-কাটা বোষ্টুম মেয়েকে ? সে দুলাল কখনও করিতে পারিবে না। কখনও করিবে না। দুরন্ত, দুর্দান্ত, প্রচণ্ড, অবুঝ দুলাল। মানগোবিন্দপুরের ওই বিচিত্র পৃথিবীতে দিবানিদ্রার অবসরে ওই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে।

প্রথম দিকে মানগোবিন্দপুরের বাস ড্রাইভার মহাবীরপ্রসাদের চঞ্চলা মেয়েটাকে দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তারপর মানগোবিন্দপুর হইতে বাসের সঙ্গে জেলার শহরে যাইতে শুরু করিল। সেখানে দেখিল, মেয়েরা বেণী ঝুলাইয়া ইস্কুলে চলিয়াছে। অপরূপ মনে হইল। মনে হইল এ মেয়েরা বুঝি চাঁদের দেশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। দুলাল নিজের যোগ্যতা বিবেচনা করিল না, তাহার জাতি কুল মান মর্যাদা কোন কিছুরই বিচার করিল না, মনে মনে সংকল্প করিল এমনই একটি মেয়েকে সে বিবাহ করিবে! কেমন করিয়া এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর তাহাও সে ভাবিল না! শুধু সে মাথায় লম্বা চুল রাখিল, তেল না দিয়া সে চুলের বোঝাকে রুক্ষ করিল, মধ্যে মধ্যে মাথা ঝাঁকি দিয়া চুলগুলাকে নাড়া দিয়া বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনোহর মনে করিল। এবং প্রকৃতিতে সে আরও উগ্র হইবার চেষ্টা করিল ; প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল পৃথিবীতে সে-ই শ্রেষ্ঠ সাহসী।

তারপর একদিন ওই মেয়েগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল তার দৃষ্টিতে। সেদিন তাহার দৃষ্টিপটে এক নূতন ছবির ছাপ পড়িয়া গেল।

শোভাদিদি কলিকাতার ট্রেনে নামিয়া বাসে আসিয়া উঠিলেন। রুক্ষ চুলে এলো খোঁপা বাঁধিয়াছেন, দীর্ঘ ট্রেনের পথে চুলগুলি অবিন্যস্ত হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে কোন প্রসাধন-মার্জনা নাই, তবু সে মুখে যেন কিসের একটি দীপ্তি ঝলমল করিতেছে। চোখে নীল চশমা, পরনে খদ্দরের ব্লাউস, খদ্দরের শাড়ী, কাঁধে একটা রঙীন খদ্দরের ঝোলা, পায়ে ফিতা-বাঁধা চপ্পল। মেয়েটিকে দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। এ মেয়ে কোথা হইতে আসিল ? এ কেমন মেয়ে! গল্পে আছে রূপ-সরোবরের কথা। গাঁয়ের মেয়ে বনের ধারে কাঠ কুড়াইত, সেখানে ছিলেন এক মুনি ; তপস্যামগ্ন মুনির চারিদিকে উইপোকার ঢিপি বাঁধিয়াছে, চুলে জটা বাঁধিয়াছে,—সে জটার উপর মাকড়সার জাল বুনিয়াছে, তবু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। গাঁয়ের মেয়ে তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমটা অবাক হইল, তারপর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চারিপাশের আবর্জনা ঘুচাইয়া, আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া উইপোকার মাটি ছাড়াইয়া মুনির অঙ্গ ধুইয়া মুছিয়া দিল, মাথার জটার উপর হইতে ছাড়াইয়া দিল মাকড়সার জাল। তারপর প্রণাম করিয়া কাঠ কুড়াইয়া বাড়ী ফিরিল। পরদিন আবার আসিয়া আবার সব মার্জনা করিয়া প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। এমনি নিত্য সেবা করিতে লাগিল গাঁয়ের মেয়ে। তারপর একদিন মুনির ধ্যান ভাঙিল। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মুনি বলিলেন "তোমার সেবায় আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি বর দিলাম তুমি হবে দেশের রাজরাণী।" কালো গাঁয়ের মেয়ে লজ্জা পাইল। নিজের কালো রঙের দিকে চাহিয়া দীঘির জলে দেখা নিজের মুখের ছবি মনে করিয়া বড় দুঃখেও হাসিল। মুনি বুঝিলেন তাঁহার মনের কথা। বলিলেন—

"রূপের জন্য দুঃখ তোমার? যাও এই পথে নিবিড় বনে চলে যাও, দেখবে এক সরোবর। সেখানে গিয়ে স্নান কর। একবার স্নানে চাঁদের মত লাবণ্য ঝরে পড়বে তোমার রূপ থেকে। সে রূপ যদি তোমার মনোমত না হয় তবে তুমি দ্বিতীয়বার স্নান করবে, তোমার অঙ্গ থেকে সূর্যের আলোর দীপ্তি ঝরে পড়বে!" হইয়াছিলও তাই। তবে এ মেয়েও কি সেই মেয়ে? শ্যামলা রঙ—সামান্য সাধারণ বেশভূষা, কিন্তু এ কি দীপ্তি!

দুলাল বার বার মাথার চুলে ঝাঁকি দিয়া প্রচণ্ড উৎসাহে হাঁক দিতে শুরু করিয়াছিল—চলো—মানগোবিন্দপুর। চলে তুফান মেল!

একটা মণখানেক ওজনের ঝুড়ি লইয়া বাসের মাথায় তুলিতে স্টেশনের কুলিটা হিমসিম খাইয়া মাটিতে নামাইয়া বলিয়াছিল—একলা লারব বাবু! এই বোঝা কি আলগোছে উঁচু করে একলা তোলা যায়?

দুলাল ছাদের উপর হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া বলিয়াছিল—যায় না? এই দেখ! বলিয়া দাঁতে দাঁত টিপিয়া হেঁচকা টান মারিয়া বোঝাটা দুই হাতে উপরে ঠেলিয়া তুলিয়া মহাবীরকে বলিয়াছিল—পাকড়ো ভাই মহাবীর!

কিন্তু ভাগ্য দুলালের! মেয়েটি কালো চশমার মধ্য দিয়া যেমন সামনের দিকে স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন তেমনিই বসিয়া রহিলেন। একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

দুলালের ক্ষোভের সীমা ছিল না।

মানগোবিন্দপুরে আসিয়া তাহার সে ক্ষোভ মিটিল। নিজেই সেই সূর্যের দেশের মেয়ে বলিয়াছিলেন—তোমার নাম দুলাল তো! দুলাল বলেই তো ডাকছিল তোমাকে!

অবাক হইয়া গিয়াছিল দুলাল।—হ্যাঁ।

—তুমি রাধাচরণবাবুকে চেন?

উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল দুলাল। হ্যাঁ। আপনি সেখানে যাবেন? তাঁর বাবার আখড়ায়?

—না। তিনি যেখানে থাকেন।

নরোত্তম দাস বাবাজীর ছেলে রাধাচরণ।

বাপ সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ছেলে রাধাচরণ গুপ্ত মানগোবিন্দপুরেই বাসা করিয়া চরকায় সূতা কাটে, লোকজন জড়ো করিয়া সভাসমিতি করে। কংগ্রেসের পাণ্ডা। তাহার চেহারা এমনি রুক্ষ—এমনি দীপ্ত।

নরোত্তম দাস বাবাজীর প্রতি দুলালের দুরন্ত ক্রোধ কিন্তু রাধাচরণকে সে ভালোবাসে। এই মেয়ের সর্বাঙ্গে যেমন সূর্যের দীপ্তি তেমনি তাহার রুক্ষ চেহারাতেও আছে অগ্নিশিখার দীপ্তি এবং উত্তাপ। ভয়ও করে। গম্ভীর রাধাচরণ তাহাকে কটু কথা বলে না, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অত্যন্ত প্রখর।

মেয়েটি দুলালকে বলিয়াছিল—তোমার নাম রাধাচরণবাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তাকে বললেই সে ঠিক পৌঁছে দেবে।

দুলাল কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছিল—ওদিকে না—এই ঘাসে ঘাসে আসুন। বেজায় ধুলো এখানে। বর্ষার সময় এ সব জায়গায় যা কাদা!

—খুব কাদা হয়—না?

—খুব। পথে এক একদিন বাস নিয়ে জান বেরিয়ে যায়। একবার একটা গরু আধখানা ডুবে গিয়েছিল কাদায়। শেষে পেটের তলায় বাঁশ দিয়ে ঠেলে তুলি। একদিকে আমি আর একদিকে দুজন। আমার কাঁধের চামড়া ফেটে গিয়েছিল।

—তোমার গায়ে খুব জোর। আজও তুমি বোঝাটা যা তুললে—

—ওর আর কি ওজন! দু-মণে বস্তা ঘাড়ে নিয়ে ইষ্টিশান থেকে বাস পর্যন্ত দিব্যি চলে আসি। জানেন—আমার ইচ্ছা আছে—একদিন মটর আটকে দেখব। শুনেছি—সার্কাসে সব মটর আটকায়!

রাধাচরণের বাসায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটি তাহাকে পয়সা দিতে চাহিয়াছিল—একটি দু-আনি; দুলাল ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল—না—।

সেই দিন অপরাহ্নে আবার সে আসিয়াছিল—একটা মরা গোখুরা সাপ লইয়া। সাড়ে তিন হাত লম্বা—প্রকাণ্ড বিষধর। বাসের গ্যারেজে কখন ঢুকিয়া বসিয়াছিল, দুলালই সেটাকে মারিয়াছিল। রাধাচরণকে দেখাইতে আসিয়াছিল। রাধাচরণকে নয়—ওই মেয়েটাকে। মেয়েটির নাম শোভা। 'সকালে' রাধাচরণের মুখে নামটা শুনিয়াছিল—বিকালে আসিয়া সে নিজেই সম্পর্ক পাতাইয়া ডাকিল—শোভাদি, দেখুন কত বড় সাপ মেরেছি!

মেয়েটি রাধাচরণকে ইংরাজীতে কি কয়টা কথা বলিয়াছিল।

রাধাচরণ হাসিয়া ইংরাজীতে কি উত্তর দিয়াছিল। তারপরই মেয়েটি বলিয়াছিল—তোমার গায়ে খুব জোরও আছে—সাহসও আছে খুব, কিন্তু লেখাপড়া করেছ কতটা?

—লেখাপড়া?

—হ্যাঁ।

—লেখাপড়া বেশী জানি না।

—শিখবে লেখাপড়া?

—উঁহু। ও—হবে না আমার!

—হবে, হবে। আমার কাছে যখন হোক একঘণ্টা ক'রে পড়ে যাবে। কেমন?

রাজী হইয়াছিল দুলাল। আসিতও রোজ। কিন্তু লেখাপড়া হয় নাই। লেখাপড়া না-হোক, শোভাদিদির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। শোভাদিদি স্বর্গের দেশের মেয়ে।

শোভাদিদিকে সে ভক্তি করে, নাম উঠিলেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করে—বলে—ওরে বাপরে! এর চেয়ে স্পষ্ট এবং গভীর ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার মত ভাষা দুলালের নাই। শোভাদিদি নয়; কিন্তু বিবাহের কথা মনে হইলেই সে কল্পনা করে ওই শোভাদিদির মত একটি দীপ্তিমতী মেয়ে তাহার গলায় মালা দিতেছে!

দুলালের কল্পনা আকাশে ফুল ফুটাইয়া চলে। তাহার কাছে অসম্ভব কিছু নাই। বাস ছুটিয়া চলে, বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সে স্তব্ধ হইয়া যায়—কল্পনা করে—সে ওই রাধাচরণদাদার মত হইয়াছে; মাথায় গান্ধী-টুপী, পরনে খদ্দর, রুক্ষ চুল। রাধাচরণের চেয়েও সে বড় হইয়াছে। রাধাচরণ চরকা কাটিয়া মিটিং করিয়া জেল খাটিয়া এমন হইয়াছে—দুলাল চরকা কাটিবে না, ওসব নয়—সে বোমা পিস্তল ছুঁড়িয়া জেল খাটিয়া ফিরিয়া আসিবে। একদিন—শোভাদিদির মত কোন মেয়ে আসিয়া হাজির হইবে।—আপনি দুলাল-বাবু? আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

মা বলিবে—ওটি কে রে দুলাল?

দুলাল হাসিয়া বলিবে—উনি আমার কাছে এসেছেন মা।

সেদিন কয়েকজন মিলিটারী অফিসার আসিয়াছিল। রেল হইতে নামিয়া তাহাদেরই বাসখানা লইয়া একটা ডাঙ্গা দেখিয়া গিয়াছে। এরোপ্লেনের ঘাঁটি করিবার কথা হইতেছে। যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ—জাপানীর সঙ্গে যুদ্ধ। দুলাল পিছনে বসিয়া অদ্ভুত অসম্ভব

কল্পনা করিয়া চলিয়াছিল। এরোপ্লেনের ঘাঁটি হইবে। একদিন রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বোমা পিস্তল মারিয়া সব জখম করিয়া এরোপ্লেন দখল করিবে। উহাদের পোশাক পরিয়া এরোপ্লেন উড়াইয়া বোমা মারিয়া গিয়া নামিবে এক দুর্গম অরণ্যের মধ্যে। প্রতি রাত্রে হানা দিবে। ক্রমে সেই বনের মধ্যে আসিয়া জুটিবে রাধাচরণ, শোভাদিদি, তাহাদের সঙ্গে আরও কত তরুণ-তরুণী। ইংরাজকে কৌৎ করিয়া একদিন তাহারা দেশে ফিরিবে। বাড়ীতে আসিবে। মিলিটারী পোশাক তাহার পরনে, সঙ্গে তাহার বধূ। ওই সূর্যের দেশের মেয়ে। গ্রামের লোকে চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারিবে না। সবাই সবিস্ময়ে দূরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে। মা মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে—বলিবে—কে বাবা তুমি?

দুলাল কৌতুক করিবে—বলিবে—তুম্ ব্রজডাসী হ্যায়। ওই—উল্লু দুলাল তুমাহারা লেড়কা হ্যায়?

—হ্যাঁ বাবা।

হা হা করিয়া দুলাল তখন হাসিয়া উঠিবে। মাথার টুপিটা ছুঁড়িয়া দিবে বধূর হাতে। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে—মা গো, চিনতে তো পারলে না। আমিই সেই উল্লুক দুলাল।

—দুলাল! আমার দুলাল!

—হ্যাঁ গো। হ্যাঁ গো। হ্যাঁ গো!

—ওটি? ওটি-কে দুলাল? লক্ষ্মীর মত মেয়েটি কে বাবা?

—বউ, তোমার বউ গো।

—আমার বউ!

অবাক হইয়া যাইবে তাহার মা।

দুলালের কল্পনায় অসম্ভব কিছু নাই। তবুও একদিন বাস্তব সংসারবোধ সজাগ হইয়া উঠে। সেদিন ওই কল্পনা করিতে সঙ্কোচ হয়। সেদিন প্রচণ্ড উগ্রতায় সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। কিছুই ভাল লাগে না। অবসর পাইলেই সে সে-দিন সকলের কাছ হইতে দূরে যায়। শোভা-দিদির কাছেও যায় না। কোন নির্জন স্থানে গাছতলায় শুইয়া পড়ে। সেও ভাল লাগে না। বাহিরের প্রকৃতি তাহাকে বাস্তব সংসার মনে করাইয়া দেয়। সে তখন গামছায় মুখ ঢাকা দেয়। চোখ মুছিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কল্পনার অদ্ভুত রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া যায়। সে-দিন সে ভাবে 'কুছ পরোয়া' নেই হ্যায়। সে ডাকাত হইবে। ডাকাতি করিবে।—লাঠি হাতে ডাকাত নয়। মোটর ট্যাক্সি লইয়া ডাকাতি। রিভলবার দেখাইয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে ঘায়েল করিয়া নিজেই লইবে স্টিয়ারিং। তারপর—কোন জুয়েলারির দোকানে—কি কোন বড় গদীতে—কি ব্যাঙ্কে—হানা দিয়া লাখ টাকা লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিবে। হু-হু করিয়া ছুটিবে গাড়ী। কল্পনায় গাড়ী ছোটে। হঠাৎ চোখে পড়ে—পথ ধরিয়া আসিতেছে এক মেয়ে, চোখে কালো গগলস্, রুখু চুল, সর্বাঙ্গে ধূসর লাবণ্যের দীপ্তি। সে সজোরে ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামায়। খেলার পুতুলের মত মেয়েটিকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া আবার গাড়ী ছাড়ে। ছোটে গাড়ী, ছোটে, ছোটে! এক নির্জন স্থানে—বনের মধ্যে গাড়ী থামায়। প্রথমেই সে লুণ্ঠন করা সম্পদ আর রিভলবারটা ফেলিয়া দেয় মেয়েটির পায়ের কাছে। বলে—যা হয় কর তুমি! তোমার হাতেই আমার জীবন-মরণ।

মনে মনে উৎসাহে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়ে। নির্জন স্থানটায় অকারণে বিকৃত মস্তিষ্কের মত একটা চীৎকার করিয়া গাছের পাখী, কাঠবিড়ালীদের সচকিত করিয়া দেয়।

পাখীরা শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়, নিশ্চিন্ত বিচরণরত কাঠবিড়ালীগুলা লেজ উঁচু করিয়া চিক্ চিক্ শব্দ করিয়া লাফ মারিয়া গাছে উঠিয়া পড়ে—দুলালহা হা করিয়া হাসে।

সে দিন, একদিন ঠিক এমনই মুহূর্তে মানগোবিন্দপুরের একটা বসতি-ঘন পাড়া হইতে সচকিত কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—আগুন—আগুন!

মাথার লম্বা চুলে ঝাঁকি দিয়া দুলাল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—দূরে কুণ্ডলী পাকাইয়া কালো ধোঁয়া উঠিতেছে। এ্যা-র্ত—বলিয়া একটা চীৎকার করিয়া দুলাল ছুটিল। চৈত্রের শেষ অপরাহ্ণ বেলা। শীতান্তে আগুন জরা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের তেজে লেলিহান—প্রখর। লোকজন অনেক জমিয়াছে। রাধাচরণ, শোভাদিদি আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

—জল! জল! জল!

জল আসিয়াছে। কিন্তু আগুন যেখানে জ্বলিতেছে—সেখানে কেহ যাইতেছে না। লাফ দিয়া দুলাল চালে উঠিয়া পড়িল। নিজের মাথায় এক হাঁড়ি জল ঢালিয়া লইয়া আগাইয়া গেল।—লে আও জল। আর দা একখানা।

খানিকটা জল দিয়া নিভাইয়া, বাকীটা দায়ের কোপে কাটিয়া চালাখানাকে ঘরের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া আগুনকে ঘরের চারিখানা দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলিল। তারপর দেওয়ালে দাঁড়াইয়া বলিল—এইবার ঢালো জল।

একবার নয়, তিন-চারবার নিজেকে ভিজাইয়া লইয়াছিল সে। তবুও সর্বাঙ্গ ঝলসিয়া গিয়াছিল, বিশ-পঁচিশটা ছোট বড় ফোস্কা পড়িয়াছিল; তিন-চার জায়গা কাঁটিয়াও গিয়াছিল। শোভাদিদি নিজের হাতে ওষুধ লাগাইয়া দিয়াছিলেন; প্রসন্নতায়—বিস্ময়ে—প্রশংসায় শোভা-দিদিকে যে কি সুন্দর তাহার লাগিয়াছিল সেদিন! তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন—দুলাল সত্যিই একটা বীরপুরুষ!

দুলালের ইচ্ছা হইয়াছিল এ্যা-র্ত বলিয়া সে একটা চীৎকার করিয়া ওঠে!

বিয়ে! বিয়ে একটা তিলক-ফোঁটা-কাটা বোষ্টুম মেয়েকে!

রাগে মাথায় চুল ঝাঁকি দিতে দিতে সে মাঠের পথে মানগোবিন্দপুরের দিকে চলিল। নিজেও সে ওই ফোঁটা-তিলক কাটিয়া মাথা ন্যাড়া করিয়া খাটো থানকাপড়ের বহির্বাস পরিয়া মহান্ত সাজিতে পারিবে না।

অভ্যাসমত সে মাঠের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যা-র্ত।

আঃ! খুব সহজে পরিত্রাণ পাইয়াছে কিন্তু। অসুখে ভুগিয়া এক মুঠা ভাত খাইয়া এমনই তাহার মোহ হইয়াছিল যে মাকে সে বৈষ্ণব মহান্ত হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিয়াছিল।

—দুলাল! দুলাল! মহেশ মণ্ডল পিছন হইতে ডাকিল। মণ্ডল অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বেচারী একটি ভাল মেয়ের সন্ধান পাইয়া খুশী মনেই ব্রজদাসীকে খবর দিতে আসিয়া-ছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসেই সে দুলালের কাছে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে। দুলালের মনের এই অদ্ভুত কল্পনাবিলাসের কথা তাহার জানাও ছিল না। সে ভাবিয়াছিল দুলাল এ খবরে পুলকিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ কি বিপরীত কাণ্ড হইয়া গেল! মণ্ডল ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। হইল কি? দুলাল বাহির হইয়া গেল—সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর ব্যাকুল হইয়া ছুটিল—দুলাল—অ দুলাল!

দুলাল মাঠে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ওই লোকটা তাহার পিছনে ছুটিয়াছে! ওই লোকটা তাহার দুই চক্ষের বিষ! কার্তিক শেষের রবি-ফসলের চষা মাঠের চ্যাঙড় তুলিয়া লইয়া দুলাল

পাগলের মত ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

মহেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

একটা মাটির চ্যাঙড় আসিয়া লাগিল তাহার পায়ে। মহেশ মণ্ডলও প্রচণ্ড বলশালী ব্যক্তি। তাহার দেহও বিশাল দেহ। আঘাত কম হয় নাই, কিন্তু মহেশ শুধু একবার মুখ বিকৃত করিল মাত্র। যন্ত্রণায় রাগও হইল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ছেলেটাকে ধরিয়া হাতখানা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া দেয়। না—গলা টিপিয়া শেষ করিয়া দিয়া আদালতে গিয়া হাতজোড় করিয়া বলে—ধর্মাবতার—

কিন্তু মা-জীর মুখ মনে পড়িয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া ফিরিয়া আসিল। মা-জী ফিরিয়া আসুক!

ছয়

ব্রজদাসী পুলকিত চিত্তেই বাড়ী ফিরিতেছিল। একটি ভালো মেয়ের সন্ধান সে পাইয়াছে। এ মেয়ের সঙ্গে দুলালকে বাঁধিতে পারিলে দুলাল বাঁশীর সুরে মুগ্ধ সাপের মত স্থির হইয়া দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া পড়িবে—তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না।

আপন মনেই সে পথ চলিয়াছিল। আশপাশের দিকে লক্ষ্য পর্যন্ত ছিল না। মন তাহার আপনার মধ্যেই মগ্ন হইয়াছিল। ওই মেয়েটির কথাই সে ভাবিতেছিল। গোকুলবাড়ী গাঁয়ের ভোলাদাসী কলিকাতায় ঝি-গিরি করে। পনের-ষোল বৎসর আগে চার বছরের ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছিল, পেটের দায়ে স্থানীয় বাবুদের বাড়ী কাজ লইয়া তাদের সঙ্গে কলিকাতা গিয়াছিল। কলিকাতা ভাল করিয়া চিনিয়া শুনিয়া বাবুদের বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে, আজও করে। ছেলেটা না-থাকিলে হয়তো দেশের সঙ্গে সম্পর্কও রাখিত না। এখন ছেলে বড় হইয়াছে, গোকুলপুরে ঘরদুয়ার করিয়া সে এখন দেশেই থাকিতে চায়। কিন্তু বিপদ হইয়াছে একটা মেয়ে লইয়া। ভোলাদাসী বলে মেয়েটি তাহার নয়, তাহাদের ঠিকা-ঝিয়ের আস্তানার এক বান্ধবী সখির মেয়ে। সখিটি মরিবার সময় তিন মাসের মেয়েটিকে ভোলাসাদীর হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে—বলিয়া গিয়াছে—সই, তোমার ছেলে আছে, এটি তোমার মেয়ে হ'ল। এটিকে তুমি দেখো। সেই মেয়ের বয়স আজ বারো বছর। ভোলাদাসী এখন বিপদে পড়িয়াছে। ভোলাদাসী ওই মেয়ে লইয়া যে বৎসর প্রথম গ্রামে আসে—তখনই সমাজে নানা কথা উঠিয়াছিল। ভোলাদাসীর কথা শুনিয়া সাধারণ লোকে মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল। সমাজপতিরা মুখ গম্ভীর করিয়া হরিনাম স্মরণ করিয়াছিল। এইখানেই শেষ হয় নাই, ভোলাদাসীকে সমাজ একঘরে করিয়াছিল। সেদিন ভোলাদাসী সমাজকে গ্রাহ্য করে নাই। মেয়েটাকে লইয়া নাক উঁচু করিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল; ছেলেকে রাখিয়া গিয়াছিল নিজের বাপ-ভাইয়ের কাছে। এখন ভোলাদাসীর বড় বাসনা—ছেলের বিবাহ দিয়া বউ ছেলে লইয়া ঘরসংসার করে। ঘর সে করিয়াছে, ভাল কোঠা ঘর, টিনের চাল, পাকা মেঝে; কলিকাতা হইতে কত ছোটখাটো আসবাব আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে। কিন্তু বিপদে পড়িয়াছে ওই মেয়েকে লইয়া। মেয়ের মত পালন করিয়া আজ কোথায় ফেলিয়া দিবে? পরের মেয়ে—বুকে তুলিয়া মানুষ করিয়া

আজ যে আপন সন্তানের বেশী হইয়া উঠিয়াছে সে। অথচ ওই মেয়ে ঘরে থাকিতে সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না। তাহার ছেলের হাতেও কোন গৃহস্থ মেয়ে দিতে চাহিতেছে না।

সন্ধান পাইয়া সে গোকুলপুরের মণ্ডলকে গিয়া ধরিয়াছিল—এই সম্বন্ধটি আপনি ক'রে দেন মণ্ডল; প্রভু আপনার ভাল করবেন।

মণ্ডল মহাশয় মুখ ভার করিয়াছিল।

ভোলাদাসী আজ অনেকগুলি টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়াছে—মহাজনী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অহঙ্কার তার অনেক। চালচলন কথাবার্তায় সে গোটা গ্রামখানাকেই অবজ্ঞা করিয়া চলে। কথায় কথায় বলে—'টাকা বেটা, পাথর কাটা'। একমাত্র ওই মেয়েটির ঠেকায় সমাজে ঠেকিয়া আছে। মেয়েটিকে যদি কোনমতে কাহারও হাতে সমাজ-সম্মত উপায়ে তুলিয়া দিতে পারে তবে আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে না। তবে মুখভারের এইটাই একমাত্র কারণ নয়, আরও একটা কারণ আছে। মণ্ডল বৈষ্ণবী ব্রজদাসীকে শ্রদ্ধা করে—স্নেহ করে। সেই কারণে ওই ভোলাদাসীর মত বিলাসিনী গোপন-দেহপসারিনীর ওই পাপের ফলকে গ্রহণ করিতে দিতে তাহার আপত্তি আছে। সে মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল—আপনি এই কথা বলছেন মা-জী? আপনি ত সব জানেন।

ব্রজ সবিনয়ে হাসিয়া বলিয়াছিল—শুনেছি অনেক কথাই মণ্ডল মশাই, কিন্তু শোনা কথা—সব সময়ে সত্যি তো হয় না!

—আপনার শোনা কথা—আমরা যে চোখে দেখেছি। ও পাপ আপনি ঘরে ঢোকাবেন না। আপনারা অবিশ্যি বৈষ্ণব, আপনাদের ধর্মে মহাপ্রভুর দয়ায় সকল জনের ঠাঁই আছে; জাত-জন্ম সমস্ত কিছুর যত পাপই থাকুক না কেন—সবই ঘুচে যায় আপনাদের ধর্মের পুণ্যে, কিন্তু এ মেয়ের পাপ ঘুচবে না—এ আমি জোর গলা ক'রে বলতে পারি।

ব্রজ মিথ্যা কথা বলিয়াছিল—কিন্তু আমি যে স্বপ্নাদেশ পেয়েছি বাবা!

—স্বপ্নাদেশ!

—হ্যাঁ বাবা। কাল মহেশ মণ্ডল মশায়ের সঙ্গে দুলালের বিয়ের কথা বলেছিলাম। কিছুদিন থেকে ওর বিয়ে দোব-দোব ভাবছি। কিন্তু এত বড অসুখটা গেল, ও-কথা ভাববার সময় ছিল না। দুলাল পথ্যি করেছে, আবার কথাটা মনে হ'ল। মণ্ডল মশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম কাল। তারপর রাত্রে শুয়ে ঘুমিয়েছি—স্বপ্ন দেখলাম, একটি ছোট ছেলে, কালো রঙ, হাতে পাঁচন লাঠি, মাঠের ধারে বসে আছে, গরু চরাচ্ছে; আমি যাচ্ছি মেয়ে খুঁজতে। সেই ছেলেটি বললে—মা-জী, এই সামনের গাঁয়ে ভোলাদাসীর মেয়েটির সঙ্গে ছেলের বিয়ে দাও। বেশ মেয়ে গো। ভাল মেয়ে। তবে মায়ের আওতায় আছে, মায়ের 'ছোঁয়া' তার ওপর পড়েছে তাই মনে হচ্ছে খারাপ। তুমি ওকে নিয়ে যাও মা-জী, গোপালের প্রসাদ খাইও, তিন বেলা প্রণাম করিও—দেখবে ওর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। পতিতকে উদ্ধার করো, প্রভু তোমার ভাল করবেন!

এক বিশ্বাসে এতগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া ব্রজদাসী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—এর পর আমি কি না এসে পারি, আপনিই বলুন!

মণ্ডল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবীণ মানুষ; স্বপ্নাদেশ তাহার কাছে অবিশ্বাস্য নয় এবং দৈবলীলার প্রকাশ-বৈচিত্র্যেও তাহার গভীর বিশ্বাস, তাহার উপর এই ভক্তিমতী ভালমানুষ বৈষ্ণব মেয়েটি এ অঞ্চলে এমনই শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্রী যে তাহাকে সে মিথ্যাবাদিনীও ভাবিতে পারিল না। কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিতেও তার মন সরে না।

ব্রজ নিজেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া না থাকিয়া পারে নাই। মনে মনে নিজের কাছেই তাহার লজ্জার সীমা ছিল না। কিন্তু তাহার যে উপায় নাই। দুলালকে যে তাহার বাঁধিতেই হইবে! গোবিন্দ জানেন—অপরাধ তাহার নাই—কিন্তু দুলালের জন্ম যে অপরাধের মধ্যে। জন্মের অপরাধে সে পতিত; পাপ তাহার জীবনকে এমন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। মুক্তি আছে প্রভুর চরণাশ্রয়ে। সেই আশ্রয় তাহাকে গ্রহণ করাইতে হইবে। তাহার একমাত্র উপায় উহাকে তাহার ওই প্রভুর সংসার ওই আখড়ার ঘরকন্নায় আবদ্ধ করা। ভোলাদাসীর মেয়েটিও পতিত—একই অপরাধে অপরাধিনী সে। দুই পতিতকে একসঙ্গে বাঁধিয়া দিবে সে—ফেলিয়া দিবে তাহাদের প্রভুর চরণাশ্রয়ে। ইহার জন্য সে মিথ্যা কথাটা বলিয়া গেল—একেবারে পাকা মিথ্যাবাদিনীর মত; এতগুলা মিথ্যা বলিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া গেল—কেমন করিয়া এমন নিপুণভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া কথাগুলা বলিল! সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পাইল। কিন্তু উপায় কি? যে শাস্তি যে দণ্ড তাহার প্রভু তাহাকে দিবেন—সে পরমানন্দে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে, আক্ষেপ করিবে না—শুধু দুলাল উদ্ধার পাক। শুধু তো উদ্ধারই নয়, দুলাল একান্তভাবে তাহার হইয়া—তাহার সংসার—তাহার বুক জুড়িয়া থাক।

কিছুক্ষণ পর মণ্ডল বলিল—গোবিন্দের ইচ্ছা মা-জী। এর ওপর আমি আর কি বলব! তা হ'লে চলুন। আপনাকে নিয়ে যাই—ভোলাদাসীর বাড়ী। দেখুন—সে আবার কি বলে! আদেশ আপনার ওপর হয়েছে, তার ওপর তো হয় নাই। তা-ছাড়া সে তো আপনার-আমার মত নয়। সে কলকাতায় থাকে। সে—

মণ্ডল কথাটা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। এই ভক্তিমতী বৈষ্ণবীর সম্মুখে কুৎসিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া সঙ্কোচে জিভ যেন আপনি গুটাইয়া গেল।

ভোলাদাসীর অর্থের অহঙ্কার মণ্ডলের সহ্য হয় না—সেজন্য সে বেশ খানিকটা তাহার উপর বিরক্ত এ কথা সত্য—কিন্তু অন্য দিকটায় মণ্ডল মিথ্যা অপবাদ দেয় নাই। ব্রজ ভোলাদাসীর বেশভূষা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বৈধব্যের নিরাভরণতাকে যে এমন বিলাস-সজ্জায় পরিণত করা যায়—এ ধারণাই তাহার ছিল না। শৌখীনহাতা ধোয়া সেমিজের উপর চুল-পাড় মিহি ধুতি পরিয়া ঝকঝকে পানের বাটা পাড়িয়া পান সাজিতেছিল। চুলে পাক ধরিয়াছে ভোলাদাসীর—কিন্তু এমন ঢলকো করিয়া কান ঢাকিয়া এলোখোঁপা বাঁধিয়াছে যে ব্রজ লজ্জা অনুভব করিল। একবার মনেও হইল—না—কাজ নাই, ফিরিয়া যাই। কিন্তু ওপাশের দাওয়ায় রন্ধনরত কিশোরী মেয়েটাকে দেখিয়া সে সমস্ত বিতৃষ্ণা উপেক্ষা করিল। চমৎকার মেয়েটি। রূপ আছে, সে রূপে পারিপাট্যও আছে; ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল—রান্নার কাজে মেয়েটির ক্ষিপ্র নৈপুণ্যও আছে। শুধু তাই নয়—আচার আছে মেয়েটির। কাঁচা তরকারির পাত্রটা তুলিয়া কড়াইয়ে তুলিবার পূর্বে এঁটো হাতটা ধুইয়া লইল। আরও লক্ষ্য করিল—ভিজে হাত সে কাপড়ের আঁচলে মুছিল না। মণ্ডল এবং ব্রজদাসীকে দেখিয়া গায়ের কাপড় সে ঠিক করিয়া লইল কিন্তু হাতের হলুদ-মসলা-মাখা দিকটা দিয়া নয়, হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়া কাঁধের উপর ভাঁজ করা আঁচলখানা অনাবৃত হাতের উপর নামাইয়া লইল। বেশ মেয়ে। আচার যখন আছে, পরিচ্ছন্নতা যখন আছে তখন আশা আছে। আচার থাকিলে ভক্তি আসিবে। মাটি পরিমাটি করিয়া খুঁড়িয়া চষিয়া বীজ পুঁতিলে অঙ্কুর মেলিতে দেরি হয় না। ব্রজদাসীর বাউল গুরু বলিতেন—"মানুষের মন হ'ল মাটি—আচার হ'ল তার

চষা-খোঁড়া ; ওইটুকু না হ'লে ভক্তির সাধ্বী লতার বীজ গজায় না।"

ব্রজদাসী শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

মণ্ডল বলিল—ভোলাদাসী, ইনি হলেন গোবর্ধনপুরের গোপালজীর আখড়ার মা-জী।

ভোলাদাসী বলিল—কি ভাগ্যি আমার! ওঁর গানের কথা বলতে লোকে পঞ্চমুখ। আমার কপাল, আমি শুনি নাই। আসুন—আসুন। ওঁর কল্যাণে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল আমার বাড়ীতে—সে আমার আরও ভাগ্যি।

ভোলাদাসীর তরিবৎ কথা-বার্তা ভদ্রলোকের মত। সে আসন পাতিয়া দিল।

মণ্ডল বলিল, গান নয় ভোলাদাসী। কথা আছে।

মণ্ডল বলিল—তোর এতে ভালো হবে, ভোলাদাসী।

ভোলাদাসী বুদ্ধিমতী ; সে এক মুহূর্তে সব বুঝিয়া লইল। সে বলিল—সে তো আমার ভাগ্যি। মেয়ের ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি। মেয়েকে পেটে ধরিনি—কিন্তু একমাসের মেয়ে কোলে নিয়ে এত বড় করে তুলেছি। ওকে নিয়ে আমার কলঙ্কের সীমা নাই তবু ওকে ফেলতে পারি নি। ভেবে আকুল হচ্ছিলাম—কোথা কার হাতে দোব ওকে! তা দুখের শেষে সুখ—পারুলের আমার খুব কপাল।

তারপর হাসিয়া বলিল—তেমনি ভাল কপাল আমার, এমন বেয়ান পাব।

মণ্ডল বলিল—তা' হলে তোমরা দুজনে কথাবার্তা বল। আমি এখন যাই।

মণ্ডল চলিয়া গেলে ভোলাদাসী পান-দোক্তা মুখে পুরিয়া বলিল—এইবার ভাই খোলাখুলি কথা! কি বল?

পানের পিচ ফেলিয়া বলিল—কিছু মনে করো না ভাই ; কুচুকুরে মোড়ল চলে গিয়েছে—সোজাসুজি কথা বলব। রাগ কর—দোষ ধর—নিজের ঘরে গিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ো, প্রাণ-ভরে গাল দিয়ো আমাকে। আমার কথা তুমি জান, এ অঞ্চলে আমার নামে অনেক রটনা অনেক গুজব! আর—

বেশ একটু সরস হাসি হাসিয়া ভোলাদাসী বলিল—তুমিও ভাই আজ পনের-ষোল বছর এখানে এসেছ, তোমার কথাও লোকে বলে, বারো মাস দেশে না থাকি—মাঝে মাঝে আসি, সে সব কথা আমিও শুনেছি। রাগ ক'রো না যেন। তোমার দুলালের বাপের কথা নিয়ে সে-সব অনেক কথা! তা ভাই এক পথের রাহী আমরা—পথের ফেরের কথা দুজনেই জানি। মেয়ে আমারই—সে কথা তোমার কাছে লুকোব না! অল্প বয়সে বিধবা হয়ে খেটে খেতে পথে নেমেছিলাম, গায়ের জ্বালায় কাদা মেখেছি, সেই কাদায় শালুক ফুলের মত মেয়ে আমার অঙ্গে ফুটে উঠল। নিজে ভাই অনেক রোজগার করেছি, সুখও করেছি, কিন্তু মেয়েকে সে পথ দেখাতে মন সরে না। নইলে ও তো আমার নম্বুরী নোট—বাজারে ছাড়লে আমি তো আঁচল ভরে টাকা পাই!

কথাবার্তা শুনিয়া ব্রজদাসীর সমস্ত শরীর যেন কেমন হিম হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ভোলাদাসী তাহাকে যখন নিজের দলে টানিয়া তার পাপের সমান ওজনের পাপ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল—"এক পথের রাহী আমরা। পথের ফেরের কথা দুজনেই জানি,"—তখন তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহিল—না—না—না—চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। কিন্তু সে শুষ্ক হাসি হাসিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিল।

এ সমস্ত কথার জবাব সে দিল না। সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিল—হ্যাঁ মা—বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর ওপর তোমার ঘেন্না নাই তো?

মেয়েটি উত্তর দিল না—মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

ব্রজ এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইল। মেয়েটির লজ্জা আছে। সে আবার প্রশ্ন করিল—কপালে তিলক কাটতে হবে—নাকে রসকলি পরতে হবে—তুমি আবার কলকাতায় মানুষ হয়েছ—লজ্জা করবে না তো? মন উঠবে তো? হ্যাঁ—পারুল?

পারুল এবারও হাসিল, ওই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—কিন্তু এবার বোধ হয় হাসিটা বেশী, মুখে সে কাপড় চাপা দিল।

ব্রজ আরও খুশী হইল। আসলে সে খুশী হইবার জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে বুঝিতে পারিল না, মেয়েটি মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল ইঙ্গিতের জন্য এবং সেখানকার ইঙ্গিত-মতই সে নীরব হইয়া থাকিল, হাসিটা অবশ্য ইঙ্গিতে নয়—মনের কৌতুকে।

ব্রজ ভাবিল—ঠিক আছে, বিবাহ দিয়া ঘরে তুলিতে পারিলে আবার কি? ভোলাদাসীর ছায়া মাড়াইতে দিবে না। বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষা দিয়া জাত্যন্তর ঘটিলে ভোলাদাসীর আর কোন্ দাবী থাকিবে! আর মায়ের স্নেহ দিয়া মেয়েটিকে সংসারের সুপথের আনন্দ আস্বাদ করাইতে পারিলে—ওই মেয়েই কি আর মায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিবে? যে শুঁয়াপোকা পাতা খায়—গাছ নির্মূল করে, সে যখন গুটি কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া আকাশে পাখা মেলে—সে তখন আর গাছের পাতার স্বাদে আকৃষ্ট হয় না—সে তখন সেই গাছেরই মধু আস্বাদন করিয়া ধন্য হয়। মেয়েটির শুঁয়াপোকার অবস্থা হইতে সে তাহাকে রেশম কীটের মত সযত্নে পালন করিয়া প্রজাপতি করিয়া ছাড়িয়া দিবে। 'জয় গোবিন্দ' বলিয়া সে সকল মান, অপমানবোধ দূরে সরাইয়া ভোলাদাসীর হাত দুটি চাপিয়া ধরিল—বলিল—তা হলে এই কথা ঠিক রইল।

ভোলাদাসী হাসিয়া বলিল—ঠিক রইল বই কি ভাই। না হলে কি তোমার কাছে নিজের কলঙ্কের কথা এমন করে বলতাম! আমি খুব খুশী—আমি খুব রাজী। মেয়েটাকে তোমার ঘরে পাঠালেই আমি খালাস। ছেলের বিয়ে দোব। মনে মনে এমনিই খুঁজছিলাম। তোমার ছেলের জন্মে কলঙ্ক—আমার মেয়েরও জন্মে কলঙ্ক। কেউ কাউকে ছোট ভাববে না, ঘেন্না করবে না। তার চেয়েও ভাই বড় কথা—একেই আমি মেয়ের মা, তার ওপরে এই কলঙ্ক—ছেলের মায়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হবে না। তুমি আমার মুখে কালী দিলে আমি তোমার তোমার মুখে চুন-কালি দোব।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরে বিনয় করিয়া বলিল—কিছু মনে করো না বেয়ান—আমার কথাবার্তা ওই এক রকম! রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না। পারলে—। একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পারলে ভাই রাজরাণী হতে পারতাম। বুঝেছ না!—সে বলব একদিন। পাকাপাকি বেয়ান হই—তারপর বলব। ওরা দুজনে একঘরে শোবে—আমরা দুজনে শুয়ে সে-সব গল্প বলব।

আবার হাঁ হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজ মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিল—তুমি আমার মান রাখ। আমাকে তুমি ধৈর্য দাও, সহ্য করবার শক্তি দাও। দুলালকে আমি ঘরে বাঁধব। তোমার চরণাশ্রয়ে ফেলে দোব।

ওখান হইতে বাহির হইয়া সে ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু মন তাহার একটি

প্রবল বাসনাকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে ঘুরপাক খাইয়াই ফিরিতেছিল—কেন্দ্রটির মায়া ছাড়িয়া সোজা চলিবার শক্তি তাহার ছিল না। থাকিলে ভোলাদাসীর কথাবার্তা শুনিয়া তাহারই গর্ভের ওই কন্যাটির বাহ্য সুশীলত্ব সম্পর্কে তাহার অন্ততঃ সন্দেহ জাগিত। ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিত সে। ভোলাদাসীর মেয়েটি সুশ্রী—মেয়েটি রূপের মার্জনা জানে; তাহার রূপের একটা আকর্ষণ আছে। এ মেয়ের সঙ্গে দুলালকে বাঁধিলে দুলাল বাঁধা পড়িবে!

গোবিন্দ ভরসা! গোবিন্দের প্রতি যদি তাহার ভক্তি থাকে তবে বিষ অমৃতে পরিণত হইবে। তাহার ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাসী মন কত কল্পকাহিনী স্মরণ করিল। মনকে ওই বিশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া একটি সুখের সংসার গড়িবার কল্পনায়—মধুচক্র রচনারত মধুমক্ষিকার মত বিভোর হইয়া উঠিল।

* * * *

পথে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় বসিয়া ছিল বাগ্দীবুড়ী। বটগাছ-তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল আর বাঁ হাতের আঙুলে টানিয়া ভুরু ছিঁড়িতেছিল। আপন মনেই হিসাব করিতেছিল—কার্তিক গেল—আগন মাস এল—আউশ ধান কাটা শেষ হ'ল, খাঁ খাঁ করছে আউশের মাঠ; আমার মরণ, কাজ নাই কর্ম নাই—তাই এসেচি ধানের শীষ কুড়োতে। এইবার সব গম বুনবে, কলাই ফেলবে, আলু লাগাবে, সরষে বুনবে, আগনের শেষ থেকে হেঁওত কাটা আরম্ভ। এ মাসটা কি করব তাই ভাবছি'! কি আর করব? খাল-ডোবা দেখে মাছ কাঁকড়া ধরব। তা আবার মাছ কাঁকড়া ধরতে সঙ্গী চাই। সঙ্গী আবার কোথা পাই? আঃ—দুলাল ছোঁড়া যে বড় হয়ে গেল! এমনি সঙ্গী হয় তবে তো সুখ। শক্ত ডাঁটো ছেলে, কপাকপ মাছ ধরে, ভাগ নেয় না, দুটো রাঁধা মাছ খেয়ে খুশী। আমারও রেঁধে সুখ। তা বিধেতার যেমন বিচের, ছোঁড়া আবার বড় হয়ে গেল। এমন তেমন বড় নয়—এ্যাই বড়। শুধু বড় নয়—পাখনা গজালো। আজকাল আবার মাছ ধরবার কথায় হাসে। তেমনি কি রাগ! কুমীরে ধরল—সেই রক্তারক্তি শরীল নিয়ে আমার ঘরে এল। তা-পরেতে যমে মানুষে টানাটানি। বাঁচলি যদি তো—দশদিন চুপ করে থাক, খা—দা, শরীলটা তাজা কর! তা' না—এই শরীলে মায়ের ওপর রাগ করে—। কে গো সাদা মতন—কে গো? ভারী ত্বরিত পায়ে চলেছ, লাগছে। অ—মা-মাথায় কাপড় রয়েছে যেন? মেয়ে লোক—কে গো? আঃ—হেলে দুলে খুব হরষপরশ হয়ে চলেছ যে গো? ওগো—অ—মেয়ে! বলি এত হরষপরশ হয়ে চলেছিস কোথা গো? কে গো তুই?

ব্রজ চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। বুড়ীকে সে লক্ষ্যই করে নাই, বুড়ীকে দেখিয়া সে খুশী হইল, বুড়ী দুলালের শৈশবের সঙ্গিনী। কতদিন ব্রজ রহস্য করিয়া ছেলেমানুষ দুলালকে বলিত—ওই বাগ্দী বুড়ীর সঙ্গে তোর বিয়ে দোব!

বুড়ী হাসিত। দুলাল রাগ করিত।

পুলকিতচিত্ত ব্রজ রহস্য করিয়া বলিল—চিনতে পারছ না?

—না। তবে গলাটা চেনা-চেনা মনে লাগছে। কে গো তুই?

—চিনলে তো খুশী হবে না বাছা—মনে হবে এ আবাগী কোথা থেকে এল আমার মাথা খেতে।

—কে লা? তুই আমার মাথা খাবি, তোকে আমি ভয় করব! বলি তোর ঘর কোথা লো?

—আমি তোমার শাউড়ী গো!

—শাউড়ী? অ! বেশ মা! তা—। আশ্চর্য হইয়া গেল বাগ্দীবুড়ী, ব্রজর কণ্ঠস্বরে এমন আনন্দোচ্ছ্বাস কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়ে। দুলাল যে এই প্রথম দুপুরে তাহার চোখের সামনে দিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। সে তো সেই অবধি মাঠেই আছে—কিন্তু কই দুলালকে তো সে ফিরিতে দেখে নাই।

ব্রজ কাছে আসিয়া বুড়ীর পাশে বসিয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল—তোমার সতীনের খোঁজে গিয়েছিলাম পিসী, তুমি তো বাছা আমার ঘরেও এলে না, সেবা-যত্নও করলে না। তাই নতুন বউয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলাম। বেটার আমার আবার বিয়ে দিচ্ছি। তুমি যেন রাগ-রোষ ক'র না বাপু।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ব্রজর মুখের দিকে চাহিয়া বুড়ী বলিল—বেটার বিয়ে দেবে, কনে খুঁজতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ পিসী। তা ভালো মেয়ের খোঁজ পেয়েছি।

—তাই দাও, কোন রকমে সাতপাক ঘুরিয়ে দাও। ছোড়া ফাঁদে-পড়া ঘুঘুর মত মজাটা দেখুক। তা সে ফিরল কখন? কি রাগ মা? মাঠে তখন ধান কুড়ুচ্ছি। হন হন ক'রে যাচ্ছে, বললাম—কে রে? কে? তা বললে তোর যম! ফের ফ্যাচ ফ্যাচ করবি তো তোকে মেরেই ফেলব। গলার আওয়াজে বুঝলাম—দুলাল। বললাম—হ্যাঁরে দুলো, এত বড় অসুখ গেল, এই সাতদিন আগে তোকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে এলাম, এর মধ্যে যাবি কোথা? তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন রাগ করে যাচ্ছিস! আমার মুখের কাছে দু'হাত নেড়ে দাঁত-কষকষ ক'রে বললে—বেশ করছি। তোর কি? আমি বললাম—তা বেশ ভাই, বেশ। আমার কিছু না নয়। কিন্তু রোগা শরীল নিয়ে যাবি কোথা রাগ ক'রে, চল—আমার বাড়ী চল। সে তো তোর গোঁসাঘর। বললে—নাঃ। ব'লে মা হন হন করে চলে গেল। কিন্তু ফিরতে তো দেখলাম না!

ব্রজর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে কি? দুলালকে খাওয়াইয়া নিজে দুটো মুখে দিয়া বাহির হইয়াছে। প্রসন্নমুখে দুলালকে সে সিগারেট খাইতে দেখিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে দুলাল রাগ করিবে কার উপর? সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—কি বলছ পিসী? দুলাল? দুলাল রাগ ক'রে গিয়েছে? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ! দেখা হয় নাই? আমি কি বসে ব'সে ঘুমাচ্ছিলাম নাকি—স্বপন দেখছিলাম নাকি?

ব্রজ তবু বলিল—তা দেখ নাই, তবে তুমি কাকে দেখে কাকে ভেবেছ! দুলাল নয়?

—আমি কাকে দেখে কাকে ভেবেছি? আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে? আমায় বাহাত্তুরে ধরেছে? আমাকে কানা বলছ নাকি? তা কানা না হয় হয়েছি, চোখে না হয় ঝাপসাই দেখি, কিন্তু কালাও হয়েছি নাকি? বলি—হ্যাঁ গো—দুলালের পিছু পিছু মোড়ল এল, ডাকলে—

—কে? মহেশ মণ্ডল মশায়?

—হ্যাঁ গো। ও মা—পায়ে ঢেলা মেরে মোড়লের পা একবারে কাটিয়ে দিয়েছে। মোড়লকে শুধালাম—কি হ'ল মণ্ডল মশায়! মোড়ল কথা ভাঙলে না, বললে—ও একটা কাণ্ড হয়ে গেল। একেই রাগী ছেলে—তার ওপর রোগা শরীল—কথায়-কথায় রাগ, বুঝলে না বাগ্দী-বউ! হেসে বললে—দেখ না—ডাকলাম—তো কেমন ঢেলা মেরেছে দেখ না! মোড়ল আরও

খানিকটা গেল। তা' পরে ফিরে এল। কই দুলাল তো ফেরে নাই!

ব্রজ আর অবিশ্বাস করিল না।

সে বুঝিয়াছে। সে যে জানে। মণ্ডলের সঙ্গে দুলালের আক্রোশ সে জানে। বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার মুখে। মণ্ডলের সঙ্গে দুলালের কিছু হইয়াছে। মণ্ডল আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা—তাই দুলাল রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় ঢেলা মারিয়া মণ্ডলের রক্তপাত করিয়া গিয়াছে। মণ্ডলের অদৃষ্টে হয়তো আরো আঘাত পাওনা আছে দুলালের হাতে।

ব্রজকে নীরব দেখিয়া বুড়ী সবিস্ময় প্রশ্ন করিল—তুমি কিছু জান না তা হ'লে? হ্যাঁ মা?

ব্রজ নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

ক্ষীণ-দৃষ্টি বুড়ীর কাছে ইঙ্গিতের উত্তর নিরর্থক, সে মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ মা? তুমি কিছু জান না—নয়?

ব্রজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুড়ী বলিল—চললে মা?

—হ্যাঁ।

—যাও তাই, বাড়ী যাও। ভেবো না, সনদে নাগাদ সে ফিরবে। নিশ্চয় ফিরবে। আমি তো তাকে ভাল ক'রে জানি। সনদে লাগলে আর মায়ের কাছ ছাড়া ভাল লাগে না, ঘুম আসে না মা। এই তো সেদিন গো, কুমীরে ধরেছিল যেদিন—সেদিন 'দিনোমান'টা বেশ রইল—বললে তোর কাছেই থাকব আমি দিদি। যা রোজগার করব তোকে দোব। সে রাক্ষুসী মায়ের মুখ দেখব না। তা পরে মা—যেই নাকি সনদে হওয়া—অমনি ওঃ-আঃ আরম্ভ করলে। আমি যত শুধাই—হ্যাঁরে দুলাল—হ'ল কি? কষ্ট হচ্ছে? তা জবাব দেয় না কথার। শেষমেষ ঝেড়ে উঠে বললে—চললাম আমি মানগোবিন্দপুর। আমি ধরতে গেলাম—তো ঝাঁকি মেরে হাত ছাড়িয়ে চলে এল! কি করব—আমিও চললাম পিছু পিছু ওই মণ্ডলের মত। গাঁ থেকে বেরিয়ে ওদিকে থাকল মানগোবিন্দপুর—দুলাল পথ ধরল এদিকে চাঁদরায়ের বাঁধের দিকে। বুঝলাম মা—চলল বাড়ী। বাঁধ পার হয়েই তোমার সঙ্গে দেখা। সে সাঁঝ লাগলেই ঠিক ফিরবে। বুঝেছ না?—আমার বয়স অনেক হ'ল অনেক দেখলাম মা! মায়ের এক ছাওয়াল হলেই ওই ধারা। মায়ের ওপর যত টান তত রাগ—দিনে রাগ করবে রাতে সুড়সুড় করে এসে কোলের কাছটিতে ঢুকে—।

বুড়ী আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছিল হঠাৎ এতক্ষণে খেয়াল হইল—কই শ্রোতার সাড়া-শব্দ কই? মুখ তুলিয়া সে আশপাশে চাহিয়া দেখিল। কই, কে কোথায়?

সে গোবর্ধনপুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—বেজ মা!

ছানিপড়া চোখের সম্মুখে পৃথিবীটা যেন কুয়াসাময় ঢাকা, কাছে মানুষ থাকিলে মনে হয় খানিকটা কুয়াসা যেন জমাট বাঁধিয়া নড়িতেছে। কই—তাই বা কই? সাড়াও তো দিল না ব্রজ মা!

সে এবার মানগোবিন্দপুরের দিকে মুখ ফিরাইল। এই বটগাছতলাটাকে পাঁচ-মুড়ির বটতলা বলে। এখান হইতে আলপথ গিয়াছে গোবর্ধনপুর, আরও তিনখানা গ্রামের দিকে তিনটা আলপথ চলিয়া গিয়াছে। এবার বুড়ীর যেন মনে হইল জমাটবাঁধা কুয়াসা খানিকটা নড়িতে

নড়িতে দূরের গাঢ় জমাট কুয়াসার মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে।

ব্রজ সত্যই মানগোবিন্দপুরের পথ ধরিয়াছিল। ধৈর্যের ভিত্তি যেন নড়িয়া গিয়াছে। আর সে পারিতেছে না।

সাত

মানগোবিন্দপুরে দুলালের আড্ডা মোটরবাসের গ্যারেজে। চারিপাশে খুঁটি পুঁতিয়া তাহার উপর খড়ের চাল বাঁধিয়া প্রকাণ্ড একটা চালাঘর। চারিপাশে খুঁটির গায়ে বাঁশের খলপা বাঁধিয়া দেওয়ালের কাজ সারা হইয়াছে। মেঝেটা বাঁধানো বটে কিন্তু তাহার উপর তেল-ধূলায় আধ-ইঞ্চি পুরু একটা আস্তরণ পড়িয়াছে। পা দিলে চট্‌চট্ করে, একটা তৈলাক্ত গন্ধ ওঠে। দিনে গ্যারেজটা খালিই থাকে, রাত্রে থাকে দুইখানা মোটরবাস; আর থাকে দুলালের তিনজন সঙ্গী—দুজন কণ্ডাক্টার একজন ক্লীনার। বাস দুইখানার দুইপাশে খানিকটা করিয়া ফালি জায়গায় তিনখানা খাটিয়া খাড়া করা থাকে। গ্রীষ্মকালে খাটিয়াগুলাকে বাহিরে আনিয়া খোলা জায়গায় পাতিয়া শুইয়া পড়ে। বর্ষা ও শীতকালে খাটিয়াগুলা দেওয়ালের পাশে খাড়া করিয়া রাখিয়া দিয়া ঘুমাইতে যায় বাসের ভিতর। একটা ঢোলক আছে, প্রত্যেকের এক একটা বাঁশের বাঁশী আছে, দুই জোড়া মন্দিরা আছে আর আছে এক জোড়া ঘুঙুর। রাত্রি সাতটায় শেষ ট্রিপ দিয়া সদর শহর হইতে ভায়া জংসন স্টেশন মোটরবাস মানগোবিন্দপুরে ফিরিবার পর তাহাদের কনসার্ট পার্টি বসে। প্রত্যহ একজন পালা করিয়া বাঁশী বাজায়—একজন ঢোলক একজন মন্দিরা একজন ঘুঙুর হাতে বাজাইয়া সঙ্গত করে। দুলালও কনসার্ট পার্টির একজন সভ্য। কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটায় তাহাকে বাড়ী রওনা হইতে হয়। না হইলে মা বেটী ঘর বাহির করিয়া সারা হইবে, বেশী দেরি হইলে শেষ পর্যন্ত মাঠের প্রান্তে আসিয়া অন্ধকার মাঠের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। মধ্যে মধ্যে ডাকিবে—দুলাল! মৃদুস্বরে ডাক। দুলাল জানে অন্ধকারের মধ্যে মায়ের চোখের দৃষ্টিতে ছায়া-দুলাল ভাসিয়া উঠে। মাও সে কথা জানে, তাই মৃদু স্বরে ডাকে—দুলাল! উত্তর পায় না, আবার ডাকে, দুলাল! মা জানে দুলাল চুপ করিয়া আসে না। দুলাল আসে গোটা মাঠখানা চকিত করিয়া গান গাহিয়া; অন্ততঃ আধ মাইল দূর হইতে তাহার কর্কশ কণ্ঠের গান শোনা যায়; যেদিন ঠিক সময়টিতে দুলাল ফেরে সেদিন আখড়ায় বসিয়া মা তার গান শুনিতে পায়—তবুও মা অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঠের দিকে তাকাইয়া—চোখের ভ্রমে পড়িয়া মৃদুস্বরে ডাকিতে থাকে—দুলাল! দুলাল!

দুলাল অবশ্য এক-আধদিন নীরবে আসে।

যেদিন শোভাদিদিকে প্রথম দেখিয়াছিল সেদিন কল্পনায় বিভোর হইয়া নীরবে আসিয়াছিল। সেদিন কল্পনা করিতেছিল ওই রাধাচরণদাদার চেয়েও সে বড় স্বদেশী লোক হইয়াছে। সাহেবদের উপর বোমা মারিয়া সে কালাপানি পার হইয়া আন্দামান যাইতেছে। এ সমস্ত গল্প সে অনেক শুনিয়াছে, সেই শোনাগল্পের পথকে সে প্রশস্ততর করিয়া কল্পনার চতুরশ্ব রথ ছুটাইয়া দিয়াছিল। সেদিন গান গায় নাই। হঠাৎ তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল মৃদু স্বরের ডাক—দুলাল! সে চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল—আবার ডাক আসিল—দুলাল! দুলালের আর ভুল হয় নাই। সে উত্তর

দিয়াছিল—মা!

—এত দেরি করে? ছি! কত রাত্রি হয়েছে বল তো?

—কত?

—প্রহর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গিয়েছে দুলাল। কি করছিলি এতক্ষণ?

দুলাল শোভাদিদির কথা বলিতে পারে নাই, বলিয়াছিল, তোর মাথা করছিলাম। চল্ বাড়ী চল্। এই আঁধারে একলা ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ!

—ভূতের মা যে আমি, ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকব না! মানুষ যারা হয় তারা মাকে এমন করে ভাবায় না, তাদের মাকে এমন করে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকতেও হয় না।

দুলাল সেদিন কল্পনায় নিজেকে এমন উঁচুতে তুলিয়াছিল যে ভূত বলিলেও রাগ করিতে পারে নাই। একটু লজ্জিতই হইয়াছিল, বলিয়াছিল—তোর খুব কষ্ট হয়েছে মা। হুঁ, অনেকটা রাত হয়েছে বটে! তারপর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দেরি হলে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকিস তুই?

—থাকি বইকি, ঘরে বসে কত ভাবব? দাঁড়িয়ে থাকি এইখানে—আর কিছু নড়লেই নাম ধরে ডাকি। মনে হয় তুই আসছিস। যেদিন আসতে দেরি হবে—বলে গেলেই পারিস!

—তাই ভাল, তাই বলে যাবো।

দুলাল সেই অবধি জানে—মা তাহার মাঠের মধ্যেই দাঁড়াইয়া থাকে তাহার প্রতীক্ষায়। তাই ঠিক সাড়ে আটটায় আড্ডা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। আড্ডার সকলেরই তাহাতে আপত্তি। দুলাল গানবাজনায় পারদর্শী নয়। ওই বিদ্যাটা তাহার গলায় মগজে হাতে কোথাও আসে না। কিন্তু তাহার মত গান বা বাজনা জমাইতে কেহ পারে না। সে যা মুখে তেহাই মারে, তালের মাথায় লম্বা চুল একবার সামনে কপালে মুখে ফেলিয়া একবার পিছনে ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া সর্ব শরীর নাচায় যে—গান বা বাজনা, যাই হোক না কেন, একটা প্রবল জোর পাইয়া জমজমাট হইয়া সব কিছুতে নাচন জাগাইয়া দেয়। আড্ডার ছোকরারা বলে—শা-লা, জলে গেল একেবারে।

দুলাল বলে—জলবে না? কার ফুঁ দেখতে হবে!

সকলেই সে কথা বিনা প্রতিবাদে মানে। ঠিক এই কারণেই তাহাদের দুলালকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি। তাহারা বলে—রোজ বাড়ী যাবি কেন?

কথাগুলো তাহারা ভাঙা হিন্দীতে বলে। মহাবীরপ্রসাদ এখানকার বাস-ব্যবসায়ের প্রধান ড্রাইভার, মালিকও একজন ছাপরার লালা কায়স্থ। তাহারা এ ব্যবসায়ে লোকজন যাহা রাখিয়াছে তাহারা অন্ততঃ নামে হিন্দী-ভাষাভাষী। জন্মকর্ম সবই এ দেশে, বাপ বা পিতামহের আমল হইতে এখানেই বাস করিতেছে—তবুও তাহারা ভাঙা হিন্দী বলে, নামও রাখে ও দেশের অনুকরণে। এক দুলালই এ মাটির খাঁটি মানুষ। মহাবীরপ্রসাদ ছেলেটির তাগদ এবং হিকমত দেখিয়া উহাকে কাজ দিয়াছে। মহাবীরের গোপন উদ্দেশ্যও একটা আছে। মহাবীর এখানে যাহাকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছে সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, দেশে তাহার জমজমাট ঘরসংসার, স্ত্রী পুত্র মেয়ে জামাই জোতজমা অনেক কিছু আছে। এখানে কাজ করিতে আসিয়া একটি মেয়েকে লইয়া একটা ছোট সংসার পাতিয়াছে—তাহার ফল হইয়াছে একটি কন্যা। মহাবীর জানে দুলালেরও নাকি জন্মপরিচয়ে এমনি একটি গল্প আছে।

সেই হেতু তাহার নজর পড়িয়াছে দুলালের উপর। দুলাল কথাটা জানে না, মহাবীর এখনও কথাটি ভাঙে নাই। কিন্তু সে কথা যাক। আড্ডার সকলের প্রতিবাদে দুলাল খুশী হয়, তাহার থাকিতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু আশ্চর্য, তাহার অন্তরের অন্তরে যেন বিপরীত একটা প্রবলতর ইচ্ছা ঠিক সময়টিতে তাহার ঘাড় ধরিয়া আড্ডা হইতে টানিয়া তুলিয়া দেয়।

দুলাল বলে—না ভাই। মা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে। জানিস না তাকে।

শিউচরণ বলে—জানছে রে বাবা জানছে, সব জানছি আমরা। কেন বাবা বিলকুল ঝুটমুট বাত বলছ! যাও ঘর যাওরে বাবা, বিরিজনন্দন—সাঁও লাগল—আঁধার নামল, শিয়াল ডাকল—বহুত রাত হল—তুমি ঘর যাও, মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে পড়, বাস—শুয়ে শুয়ে মায়ের মেহু খাও।

শিউচরণের কথার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়া ফেলে, দুলালও হাসে; হাসিয়াই বলে—এ শালা কোনদিন মরবে রে আমার হাতে! দোব একদিন এক ডাণ্ডা বসিয়ে। ডিম ফাটা করে ফাটিয়ে দেব।

শিউচরণ মাথা নোয়াইয়া দিয়া বলে—মারো দাদা, ফাটায় দেও আমার মাথা। লেকেন তুমি ঘর যাও, তুমার ছাতি ফাট্ যাচ্ছে—দাদা হো—মায়ের মেহু খানেকেলিয়ে, ও আমি জানছে রে দাদা, তুমি ঘর যাও। তারপর সে শিশুর মত কাঁদিতে শুরু করে—ও মা গো! ওগো—মা গো! কোলে নে গো! আঁধার হল গো! কোথা গেলি গো!

শিউচা না হইয়া অন্য কেহ হইলে দুলাল মারামারি করিত, কিন্তু ওই ছোট ছেলেটার কথাবার্তা ধারাধরণ এমনি মিষ্ট যে কোনমতেই উহার উপর রাগ করা যায় না, উহার ওই কথাগুলি অন্য কেহ বলিলে ব্যঙ্গ হইয়া উঠিত—সূচের মত ধারালো সূক্ষ্ম মুখে অতর্কিতে বিঁধিয়া চকিত ক্রোধে বিচলিত করিয়া তুলিত, কিন্তু শিউচার কথাবার্তা বলার ধরণ তাহার কণ্ঠস্বর এমন যে কথাগুলি নিছক রঙ্গ হইয়া উঠে, কথাগুলির মুখ সূক্ষ্ম হইলেও এমনি নমনীয় যে গায়ে বেঁধে না—বাঁকিয়া যায়, সুড়সুড়ি দিয়া যেন হাসাইয়া দেয়। শিউচার রহস্যের রঙ্গে হাসিয়াই দুলাল সাড়ে আটটায় বাড়ী চলিয়া যায়।

আজ আড্ডায় শিউচা এবং দুই নম্বর বাস 'জয়-মা-তারা'র ড্রাইভার উপস্থিত ছিল। 'জয়-মা-তারা' চাকা খোলা অবস্থায় ইট এবং কাঠের মোটা টুকরার তোলানের উপর পড়িয়া আছে। কি-কি সব পার্টস খারাপ হইয়াছে সেগুলা না হইলে আর তাপ্পি মারিয়া চালানো অসম্ভব। স্বয়ং লালাজী কলিকাতায় গিয়াছেন পার্টস কিনিতে। ইতিমধ্যে চাকা খুলিয়া জয়-মা-তারাকে—ইট-কাঠের তোলানের উপর চাপাইয়া তলার ময়লা মাটি ছাড়ানো চলিতেছে। শিউচা গাড়ীর তলায় শুইয়া লোহার টুকরা দিয়া মাটি ছাড়াইতেছিল আর তারস্বরে গান জুড়িয়া ছিল। ড্রাইভার রামধনিয়া একটা খাটিয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে, মুখে রাজ্যের মাছি বসিয়াছে; সম্ভবত মদ খাইয়াছে। লোকটার চেতন নাই। দুলাল দুর্বল শরীরে ক্রোশ দেড়েক পথ হাঁটিয়া আসিয়া গ্যারেজের সামনে বসিয়া পড়িল। ডাকিল—শিউচা!

গাড়ীর তলা হইতে শিউচা জিজ্ঞাসা করিল—কে?

কণ্ঠস্বর দুর্বল হইলেও দুলালের কণ্ঠস্বর চিনিতে তাহার কষ্ট হয় নাই কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিল না। এত বড় অসুখ হইতে এই সবে উঠিয়াছে দুলাল, সে সংবাদ তাহারা খুব ভালো করিয়াই রাখে; সুতরাং দুলাল এখন এখানে আসিবে কেমন করিয়া? তাই সে সবিস্ময়ে

প্রশ্ন করিল—কে? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর তলা হইতেই যথাসম্ভব ঘাড় উঁচু করিয়া দুলালকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—আরে তুম্! ব্রিজনন্দন!

—হাঁ। বেরিয়ে আয়, জল দে দিকিনি এক গেলাস।

পিঠ ঘেঁষড়াইয়া শিউচা বাহির হইয়া আসিল। দুলালের শরীরের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—আরে এমনি হালত্ হয়েছে তুহার—আঁ! এহি হাল লিয়ে বাড়ীসে আসলি কি ক'রে? আরে নিকলালি কাহে রে ভাই?

—আগে জল দে।

—আরে নেহি। এই ধূপে এত্না পথ; এহি হালত্ তুহার। আবি পানি না। থোরা ঠার্ যা।

—ওরে শালা—তেষ্টায় আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে!

—তব, চা পিয়ো।

—না। জল দে। দিবি কি না বল্?

—সোডা পিয়ো তব। ছুটিয়া চলিয়া গেল শিউচা। দুলাল চালাঘরটার ভিতর গিয়া একখানা খাটিয়া বাহির করিয়া দড়ির ছাউনির উপরেই শুইয়া পড়িল।—আঃ! এইবার নিশ্চিন্ত। উঃ—কি বিপাকেই সে পড়িয়াছিল! এই সব ফেলিয়া সে ওই পাড়াগাঁয়ের আখড়ার জঙ্গলের মধ্যে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া—কণ্ঠী পরিয়া—মাথা ন্যাড়াইয়া—মালা জপ করিবে!

শিউচা সোডার বোতলটা ভাঙিয়া তাহার হাতে দিল—পিয়ো।

ঢক ঢক করিয়া গিলিয়া সোডার বোতলটা শেষ করিয়া দুলাল বলিল—দূরো—ঝাল্ ঝাল্—ধেৎ! তারপর বলিল—আখড়া ছোড়কে আয়া শিউচা—আর নেহি যায়ে গা।

শিউচা অবাক হইয়া গেল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—নেহি যায়ে গা?

—নেহি! কভি নেহি! হিঁয়াই পাক্কা ডেরা গাড়েগা। বাস্। সমুচা রাত চালাও খচাখচ—ঝমাঝম্ পিঁ-পিঁ-পিঁ-পিঁ পোঁ! ধেনেকেটে—ধেনেকেটে—তা ধিন—তা ধিন—ধা!

—বহুত আচ্ছা। শিউচা নাচিয়া উঠিল। শিউচার কল্পলোকের নায়ক হইল দুলাল; সবল পরিপুষ্ট শরীর, দুর্দান্ত সাহস—এই দুইটা শিউচার নাই। দুলালের আছে প্রচুর পরিমাণে। তাহার উপর দুলাল তাহাকে ভালবাসে। সত্যসত্যই ভালবাসে।

এক সময়—অর্থাৎ পরিচয়ের প্রথম দিকে দুইজনের মধ্যে ছিল প্রবল আক্রোশ। মহাবীর ড্রাইভারের মেয়ের প্রেম লইয়া দুজনে দুজনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু দুলাল যেদিন প্রথম সদর শহরে গিয়া বেণী দুলাইয়া শহরের মেয়েদের ইস্কুলে যাইতে দেখিয়া ফিরিল সেইদিনই তাহার মহাবীরের কন্যার উপর আকর্ষণ ঘুচিয়া গেল এবং সেইদিনই সে শিউচাকে ডাকিয়া বলিল—এই শিউচা শোন!

হেঁট হইয়া শিউচা গাড়ীর যন্ত্রপাতি গুছাইয়া তুলিতেছিল—সেই অবস্থাতেই মাথাটা মাটির দিকে রাখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—কেয়া?

দুর্বল শিউচার ওই দৃষ্টি দুলাল কখনও বরদাস্ত করিতে পারে না, অনেকবার এমন ক্ষেত্রে সে লাফাইয়া গিয়া শিউচার মাথাটা মাটিতে ঠুকিয়া দিয়াছে, অথবা পিছনে মারিয়াছে লাথি। শিউচাও সঙ্গে সঙ্গে হাঁকড়াইয়াছে—চাকা হইতে টায়ার খোলা ইস্পাতের চেপ্টা ভাঙাটা।

সেদিন দুলাল সে সব কিছু করিল না—তাহার পরিবর্তে গম্ভীরভাবে শিউচাকে ডাকিয়া বলিল—শুনে যা বলছি। এদিকে আয়। শোন। ভয় নাই। শুনে যা।

বিস্মিত হইয়া শিউচা কাছে আসিল এবং দুলালের অভয় দেওয়াকে তুচ্ছ করিবারই জন্যই বোধ হয়—একেবারে মুখের কাছে বুকটা উঁচাইয়া দিয়া বলিল—কি ?

এক কথায় দুলাল মহাবীরের কন্যাকে শিউচাকে দান করিয়া দিল—যাঃ তোকে দিলাম।

—কি ?

—ড্রাইভার সায়েবের বেটীকে। যা, তুই ওকে বিয়ে কর গে।

শিউচা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুলাল একটা সিগারেট তাহার হাতে দিয়া বলিল—নে খা।

শিউচা সিগারেট ধরাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—তুই ? তোর কি হ'ল ?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি বিয়ে এখন করছি না।

—এখন বিয়ে করছিস না ?

—না।

—কখন করবি ?

—সে বলব না। যখন করব তখন দেখতেই পাবি। তবে তুই পারিস তো ড্রাইভার সায়েবের মেয়েকে বিয়ে করগে। আমি ওকে বিয়ে করব না।

—তুই তো করবি না, লেকিন—ড্রাইভারের বহু যে বাঙালীন, ও যে ছাড়বে না তোকে। আর ওই মেয়েটা যে আমাকে দেখতে পারে না।

—ওরে শালা—সে তোর হাত। আমি ওকে পষ্টাপষ্টি বলে দোব। ওই যে, দাঁড়া—এখুনি বলে দিচ্ছি। এই—এই রঙ্গি—এই !

রঙ্গির ভাল নাম পুষ্পলতা। তাহার বাঙালীন মায়ের রাখা নাম, বাপ মহাবীর ছেলেবেলা হইতে রঙ্গিলা নাম রাখিয়া রঙ্গি বলিয়া ডাকে ; রঙ্গি এখন বড় হইয়া রঙ্গি নামটা আদৌ পছন্দ করে না। সে মনেপ্রাণে ভাবে-ভঙ্গিতে আধুনিকা বাঙালিনী হইতে চায় ; জংশন স্টেশনে মধ্যে মধ্যে সিনেমায় গিয়া ফ্যাসান শিখিয়া আসে, গান শিখিয়া আসে। রঙ্গি বলিয়া ডাকিলে সে ভয়ানক চটিয়া যায়।

রঙ্গি আড়চোখে তাকাইল—কিন্তু উত্তর দিল না।

দুলাল আবার ডাকিল—এই। এই।

—কি ? কাকে ডাকছ ? আমাকে ?

—নয় তো কাকে ? শুনতে পাও না ?

—কেন পাব না ? কিন্তু রঙ্গি কি আমার নাম ?

—আরে গেল যা !

—আরে গেল যা কিসের ? আমার নাম পুষ্পলতা। রঙ্গি বলে ডাকলে উত্তর দেব কেন আমি ?

—আচ্ছা—আচ্ছা। শোন।

—কি ? বল।

—শিউচা তোমাকে খুব ভালবাসে।

—ভাগ্।

—ভাগ্ নয়। আমি তাই বিয়ে-টিয়ে করব না, বুঝলে ? তুমি ওকেই বিয়ে কর। আমি বলছি। বুঝলে ?

—মরণ ! বলিয়া রঙ্গি চলিয়া গিয়াছে।

রঙ্গি কথাটা কানেই তুলে নাই। সে আপনার গরবেই আছে। তাহার বিশ্বাস মুখে দুলাল যা-ই বলুক—তাহার হাসিকান্নায় দুলাল মানিক মতি কুড়াইয়া পায়, ও কথাটা দুলাল শিউচাকে বোকা বানাইবার জন্য নেহাত ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছে। মহাবীর ড্রাইভারের আদরিণী মেয়ে সে, দুলারিয়া বেটীয়া, তাহাকে উপেক্ষা করে এমন সাধ্য দুলালের কি হইতে পারে? অন্ততঃ বাপের 'দুলারিয়া বেটী' রঙ্গি সে-কথা বিশ্বাস করে না।

রঙ্গি যে বিশ্বাস লইয়াই থাকুক, তাহাতে দুলালের কিছু আসে যায় না। সেও দুলাল—ব্রিজনন্দন, সে সাড়ে তিন হাত গোক্ষুর সাপ ছোট্ট একটা লাঠি দিয়া ঠেঙাইয়া মারে, সে আগুনের সঙ্গে লড়াই করে, সে এখানে কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করে না। সে জানে স্বয়ং মালিক লালা সাহেব তাহার কাজ দেখিয়া খুশী। মহাবীরের কথায় তাহার কাজ যাইবে না। সে শিউচাকে সরল অন্তঃকরণে সুস্থ শরীরে রঙ্গিকে দান করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ফেলিল। প্রাণের বন্ধু করিয়া তুলিল।

তাই শিউচা আজ দুলালের সংকল্প শুনিয়া নাচিয়া উঠিল। দুলাল এখানে থাকিলে আড্ডা তাহাদের এখন জমিয়া উঠিবে।

এইবার তাহা হইলে দুলাল মদ খাইবে, গাঁজা খাইবে। মায়ের আঁচল ধরিয়া থাকিয়া দুলাল এখনও পুরা মরদ হইল না। ঘরেই আছে অথচ মদ খাইবে না। বলিবে—না ভাই—ওটি পারব না। একে বোষ্টুমের ছেলে—তার ওপর মা ভাই বড় খারাপ লোক। বকবে-ঝকবে না—কাঁদবে শুধু।

তারপর শিহরিয়া উঠিয়া বলে—কে জানে ভাই, গলায় দড়ি-কড়ি দিলে—মরে যাবে। আমার আর তখন পাপের সীমা থাকবে না।

জোর করিলে—দুলাল শক্ত হইয়া উঠে; কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে—না! সে 'না'-এর প্রতিবাদ দলের কোন লোক করিতে পারে না। শিউচা খুশী হইল, এবার আর দুলাল না বলিবে না।

* * *

লম্বা একটা ঘুম দিয়া দুলাল যখন উঠিল তখন অগ্রহায়ণের দিন গড়াইয়া আসিয়াছে। অপরাহ্ণ বেলার আলো কেমন নিষ্প্রভ লালচে হইয়া উঠিয়াছে। রাঢ়ের লালমাটির দেশ, লাল ধূলা উড়িয়াছে আকাশে। দুলাল আকাশের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এমনি সমারোহের গোধূলি ফুটিলেই তাহার মায়ের মনে গান সাড়া দিয়া ওঠে। গুন গুন করিয়া আপন মনেই গান গায় আর কাজ করিয়া ফেরে। শুধু তাই নয় ছেলেবেলায় এমন গোধূলির ক্ষণে শত অপরাধ করিয়া ফিরিলেও মা তাহার উল্লেখই করিত না। ছেলেবেলায় সে খেলিয়া বাড়ী ফিরিত—একেবারে ধূলায় ভূত হইয়া বাড়ী ফিরিত; নূনদাঁড়ি, হাডু-ডু-ডু বারচিক্ খেলায় সে ছিল সকলের ওস্তাদ; হাডু-ডু-ডু খেলায় সে যাহাকে ধরিত সঙ্গে সঙ্গে সে ধূলার উপর আছাড় খাইয়া পড়িত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেও পড়িত; যাহাকে ধরিত সে পড়িত চিত হইয়া আর সে পড়িত উপুড় হইয়া। নখের ডগা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত ধূলার একটা প্রলেপ পড়িয়া যাইত। বাড়ী ফিরিবামাত্র মা প্রায় প্রত্যহ একটি কথা বলিয়া আক্ষেপ করিত—হয় তো পুত—নয় তো ভূত। আমার যেমন কপাল তেমনি হবে তো!

গরমের দিন কোন কথা না বলিয়া দুলাল লাফাইয়া গিয়া পড়িত খালের জলে। জল তোলপাড় করিয়া—ব্রজদাসীর তিরস্কার শুনিয়া তবে উঠিত। শীতের দিন—মায়ের সঙ্গে ঝগড়া

বাধিত। জল গামছা নামাইয়া দিয়া ব্রজ বলিত, বেশ ভাল ক'রে মুছবি, এতটুকু ময়লা যেন না থাকে গায়ে।

নাকিসুরে দুলাল কাঁদিত—যে ঠাণ্ডা, মা-গো!

ব্রজ বলিত—কেন, ধুলো মাখবার সময় মনে পড়ে নাই মাকে?

সর্বাঙ্গ ভিজা গামছায় মুছিয়া সেই গামছা কাচিয়া তবে পরিত্রাণ পাইত দুলাল। তারপর ব্রজদাসী তাহাকে নারিকেল তেল মাখাইত। নহিলে শীতের দিন সর্বাঙ্গ ফাটিবে যে! কিন্তু রক্তসন্ধ্যা করিয়া যেদিন মনোরম গোধূলির সমারোহ ফুটিয়া উঠিত সেদিন ঘটিত অন্যরূপ। খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই খেলার উত্তেজনা কাটে না, সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার ভুলচুকের উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে দুলাল বাড়ী ফিরিত—আশেপাশে দিকে-দিগন্তরে কোথায় কি ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে খেয়াল থাকিত না, কিন্তু বাড়ীর দুয়ারে আসিয়াই বুঝিতে পারিত—আজ পৃথিবী রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শুনিতে পাইত আখড়ার মধ্যে তাহার মা গুন গুন করিয়া গান করিতেছে। যখন সে খুব ছোট ছিল—তখন মা তাহার এমন দিনে তাহাকে বুকে তুলিয়া ছড়া কাটিত—

ধুলোয় ধূসর নন্দকিশোর ধুলো মেখেছে গায়!

সেদিন মা নিজেই তাহার গায়ের ধূলা মুছাইয়া দিত। তারপর পড়িত তাহাকে সাজানোর পালা। স্নানের পর যেমন মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দেয়—তেমনি আর একদফা সাজাইয়া চোখে কাজল দিয়া তবে ছাড়িত। এই সমাদরের স্বাদটি তাহার কাছে মধু অপেক্ষাও মধুরতর। চোখে যেন একটা রঙ ধরিয়া যাইত।

এমন সন্ধ্যা দুলালের কাছে আজও কাম্য হইয়া আছে। মানগোবিন্দপুরে আসিয়া নূতন পৃথিবীর রঙ লাগিল তাহার মনে। মোটরবাসে চাকরি লইল। কিন্তু শীতের অপরাহ্নে যেদিন রক্তগোধূলির সমারোহ জাগিত সেদিন তাহার মন উতলা হইয়া উঠিত। কতদিন এমন হইয়াছে যে মোটরবাসের পাদানিতে দাঁড়াইয়া দুলাল গতির উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া চীৎকার করিতেছে "তুফান মেল—তুফান মেল—হট যাও—মুসাফির হট যাও; বন-বন দুনিয়া সন্ সন্ তুফান, দব্ দব জান, চলো জোয়ান";—মনের উচ্ছ্বসিত উল্লাসে; স্বতস্ফূর্ত অর্থহীন সঙ্গতিহীন ছড়া আওড়াইয়া চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ চোখে ধরা পড়িল—শীতের অপরাহ্নের ধূলিধূসরতায় সর্বাঙ্গে ধরিয়াছে লাল রঙ, সঙ্গে সঙ্গে দুলাল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, মনে পড়িয়াছে মাকে, মোটরের শব্দের মধ্যে সে সেদিন মায়ের গুন গুন গান শুনিয়াছে—

"গোধূলি-ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমালা।"

এমন অপরাহ্নে মানগোবিন্দপুরে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সে লাফ দিয়া উঠিত। তার পরেই ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথায় অথবা পেটে হাত দিয়া যন্ত্রণাকাতরতার ভান করিয়া বলিত—উঃ—হঠাৎ এ কি হ'ল? ওঃ—মাথার মধ্যে চিড়িক মেরে উঠল! তারপর শুইয়া পড়িত, কয়েক মিনিট পর উঠিয়া বলিত—আজ আর ডিউটি দিতে পারব না। বড্ড যন্ত্রণা। বাড়ী চললাম।

আজও রক্ত-সন্ধ্যা-রঞ্জিত গোধূলি ক্ষণটি দুলালের মনে মায়ের মুখ ভাসাইয়া তুলিল। মা এতক্ষণ বাড়ী ফিরিয়াছে নিশ্চয়, মহেশ মণ্ডলের কাছে সমস্ত কথা সে শুনিয়াছে, শুনিয়াছে—দুলাল বলিয়া গিয়াছে একটা তিলক-ফোঁটা কাটা বৈষ্ণবের মেয়ে বিবাহ করিয়া মাথা মুড়াইয়া সে বৈরাগী বাবাজী হইতে পারিবে না। শুনিয়া মা তাহার কি করিবে?

দুলাল হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। মা কি করিবে সে কল্পনা করিতে পারিতেছে না।

এতকাল মায়ের সঙ্গে তাহার কত ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া সে কোন দিন ঘর ছাড়ে নাই।

শিউচা গরম জল করিয়া সাবান দিয়া হাত-পা-মুখের তেল কালি ধুইতেছিল—সে বলিল—ওঃ, বহুত খটমল আছে উয়ো খাটিয়ামে। নেমে বোঠ ওহি বাসকে সিটের গদীটো লে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুলাল বলিল—তবিয়েৎ বহুত খারাপ করছে শিউচা। একটু চা খাওয়াবি ভাই!

পিছনের দিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়া জয়তারার ড্রাইভার একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়াছিল, মদ পেটে পড়িলেই লোকটা গুরুগম্ভীর হইয়া উঠে, ঘোর-মাখানো চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সঙ্গীরা হাস্যপরিহাস করে—সে তাহাতে যোগ দেয় না, হঠাৎ পরিহাসের কথা লইয়াই এমন একটা গভীর ভাবের কথা বলিয়া ওঠে যে সমস্ত মজলিসটাই স্তব্ধ হইয়া যায়। শিউচা কিছু বলিবার পূর্বেই সে গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—তুম বহুত খারাব কাম কিয়া বিরিজনন্দন!

দুলাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া চিন্তা-স্তিমিত দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া দেওকীনন্দন বসিয়া রহিয়াছে, ঠোঁট দুইটা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দুই কোণ বাঁকাইয়া যেন উদ্বেলিত বেদনার উচ্ছ্বাসকে চাপিয়া রাখিয়াছে কোনমতে। দুলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি? কি খারাব কাম করলাম? এ খাটিয়াটা তোমার নাকি?

দেওকী দৃষ্টি তুলিল না—ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—বহুত খারাবি কিয়া ভাই। সীয়ারাম, সীয়ারাম!

দুলাল আপন মনেই বলিল—মরেছে—পেটে পড়েছে আর—

দেওকী বলিয়াই চলিয়াছিল—তুমরা টাইফয়েড হুয়া, বহুত খারাব বেমার, বহুত খারাব। আঃ—আওর তুম এইসা শরীরকে হালত লেকে তুম চলা আয়া এতনা পথ, এহি ধূপ মে! বহুত খারাব।

—ভাগ্। তিক্তচিত্তে দুলাল উঠিয়া পড়িল। দোকানে গিয়া চা খাইয়া ওই খোলা মাঠটায় বসিবে। আকাশে রক্তসন্ধ্যা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

দেওকী বলিল—কাঁহা যাতা হ্যায়?

দুলাল বিরক্ত হইয়া আর একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

দেওকী বলিল—মৎ যাও। টাইফয়েড বহুত খারাব বেমার। হম জানতা হ্যায়। অব দশ রোজ তো তুম শোত রহো।

—ওরে বাবা, আমি চা খেতে যাচ্ছি। তুমি এত ভেবো না আমার জন্যে।

—আরে সীয়ারাম—সীয়ারাম, চা কেয়া পিয়েগা? মৎ পিয়ো চা। বহুত খারাব। টাইফয়েডমে চা বহুত খারাব। অম্বল হোগা—উসসে ফিন জ্বর চলা আয়েগা। বাস্, টাইফয়েড যব রিপীট করে গা—তো বাস্ হো যায়েগা খতম। মৎ পিয়ো চা।

—যাঃ গেল! এ তো বড় ফ্যাসাদে ফেললে রে বাবা। দুলাল খানিকটা ভয় বোধ হয় পাইয়াছিল। না হইলে কোন কথা না বলিয়াই সে অনেক আগেই চায়ের দোকানে গিয়া বসিত। দেওকী বলিল—এক কাম করো। দোঠো কুইনিন পিল মাঙা লেও, আওর থোড়া দারুকে সাথ খা লেও। বাস্। তবিয়ৎ ভি আচ্ছা হোগা।

—মদে আর কুইনেনে?

—হ্যাঁ। খা লেও—বাস্—তবিয়ৎ আচ্ছা হো যায়েগা।

—না।

শিউচা এতক্ষণ নীরবে মজা দেখিতেছিল, তাহার মুখ-হাত ধোওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; মুখে মাথায় সাবান মাখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া—পিট্ পিট্ করিয়া চাহিয়া সব দেখিতেছিল।

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শিউচার এই খিল খিল হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ আছে। দুলাল এই হাসিতে জ্বলিয়া যায়। দেওকীকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু শিউচার ব্যঙ্গভরা হাসি সে সহ্য করিতে পারিল না। যাহা অসহ্য তাহা উপেক্ষাও করা যায় না। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটা গর্জন করিয়া উঠিল—শিউচা!

শিউচা বলিল—কি? চিল্লাচ্ছিস কেন?

—হাসছিস কেন তুই?

—তোকে দেখে আমি হাসি নাই। দেওকীর কথা শুনে হাসছি। ও জানে না, খোখারা মদ খেলে মায়েরা গোস্তা করে কান পাকড়কে।

—খবরদার!

রঙ্গিকে লইয়া আজ আর দুলালের উপর কোন অভিযোগ বা আক্রোশ না থাকিলেও দুলাল তাহাদের একজন হইয়াও বন্ধু হইয়াও তাহাদের সঙ্গে মদ খায় না—এ লইয়া একটা অভিযোগ শিউচার আছে। কিন্তু দুলালের গায়ের জোরকে শিউচা ভয় করে—তাই সাধারণতঃ চুপ করিয়া থাকে, কখনও কখনও আক্রোশটা বেশী হইলে এমনি ধারার ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া দুলালকে 'খোখা' বলিয়া ঠাট্টা করে। দুলালও এমনি গর্জন করিয়া শিউচার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিল-চড়-ঘুষি চালায়; শিউচা বেচারী রসিক হইলেও দুর্বল মানুষ, দুলালের শক্তহাতের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতে পারে না, হাত জোড় করিয়া বলে—মাফি। মাফি মাংতা হ্যায়। এই ভাই নওজোয়ান—এ দুলাল!

জয়-পরিতৃপ্ত দুলাল শিউচার ভঙ্গি দেখিয়া এবং নওজোয়ান সম্বোধন শুনিয়া হাসিয়া ফেলে, এবং ছাড়িয়া দিয়া বলে—বলবি আর?

—নেহি। আরে বাপ্—কান পাকড়তা। কভি নেহি বোলে গা!

—দেখিস! মনে থাকবে তো?

—থাকবে রে বাবা—থাকবে। আঃ, দেখ তো ক্যায়সা জখম কিয়া! কপালে হাত বুলাইয়া ঘুষির আঘাতটা দুলালকে দেখায়।

দুলাল অনুতপ্ত হইয়া শিউচার কপালে হাত দিয়া সস্নেহে বলে—এঃ—জোর মার হয়ে গিয়েছে। তারপর বলে—তুই তো জানিস—আমার রাগ, কেন এমন ধারা রাগিয়ে দিস্ বল দি-নি? চল টিংচার আইডিন লাগিয়ে দি!

ডাক্তারখানা হইতে আইডিন আনিয়া শিউচার কপালে লাগাইয়া দেয়। তারপর কয়েক আনা পয়সা তাহাকে দিয়া বলে—যা আধপো মালের দাম দিলাম, খেয়ে গায়ের বেথা মেরে আয়।

শিউচা কিন্তু আজ দুলালের খবরদার গর্জনকে গ্রাহ্য করিল না। রোগশীর্ণ দুলাল আজ যদি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তবে সে আজ শোধ লইবে। সে আরও তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—আরে বাপ্—খোখেয়াকে বহুত গোস্তা হো গিয়া। আও না—আও!

দুলালের আর সহ্য হইল না। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেল, লাফাইয়া পড়িল শিউচার উপর। এই মুহূর্তে শিউচা এইটাই চাহিতেছিল। সে আজ অনায়াসে প্যাঁচ কষিয়া ঘাড়ের উপর হইতে দুলালকে উল্টাইয়া আছাড় মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিল। বলিল—আব্—মেরে খোখোয়া! বিরিজনন্দন দুলালোয়া! হা—হা!

দুলাল চীৎকার করিতেছিল উন্মত্ত ক্রোধে। শিউচা ঘুষি তুলিল। সে আজ শোধ তুলিবে। সাধ মিটাইয়া শোধ তুলিবে।

হঠাৎ দেওকী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—লেও, পিলাও দারু।

শিউচা উল্লসিত হইয়া উঠিল—ব্যাস্ ব্যাস্, পিলাও, মারো বোষ্টোমোরাকে জাত, খোখোয়াকো জোয়ান বনা দেও! পিলাও!

শিউচা দুলালের হাতখানা পা দিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। দুই কাঁধে দুই হাত দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া দেওকীকে বলিল—লে—লে লে তু পিলা।

দুলালের দুই কষ চাপিয়া ধরিয়া দেওকী তাহার মুখে অনেকটা মদ ঢালিয়া দিল। না গিলিয়া উপায় ছিল না। শিউচা কাঁধের হাত ছাড়িয়া দিয়া নাক টিপিয়া দুলালের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিল। দুলাল গিলিল।

দেওকী বলিল—বস করো—ছোড় দো।

শিউচা বলিল—আওর থোড়া।

—নেহি। ছোড় দো।

শিউচা দুলালকে ছাড়িয়া দিয়া হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। আজ তাহার পরম আনন্দ। দুলালের জাত মারিয়াছে।

দুলাল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শিউচা এবার কাছে আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আরে কাঁদছিস কাহে? আঁ? ক্যয়সা লাগতা দেখ তো!

—ছাই লাগছে!

—নেহি। ঝুট বোলতা তুম্।

দেওকী বলিল—আওর থোড়া পি লে ভেইয়া। সব ঠিক হো যায়েগা।

দুলাল উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি বাড়ী যাব।

বাড়ী সে চলিয়াছিল।

বাজারের পথ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই চলিয়াছিল। মনে মনে সে মায়ের নামই করিতেছিল ছোট ছেলের মত।—মা—মা গো!

মানগোবিন্দপুর আধা শহর, গ্রামের চেয়ে শহরের প্রভাবটাই বেশী। বাজারটা বড়ই ছিল, এবার যুদ্ধের মরসুমে সেটা আরও বাড়িতে শুরু করিয়াছে। ধানচালের দর চড়িতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বাজারটা ফাঁপিতেছে। নতুন দোকান বসিতেছে। মাইল খানেক লম্বা হইয়া উঠিতেছে বাজারের পথ।

অর্ধেকটা পথ আসিয়া দুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ মনে হইল তাহার দুর্বল শরীর যেন যাদুমন্ত্রে সবল হইয়া উঠিয়াছে। মাথার মধ্যে ক্রোধ আক্রোশ যেন বৈশাখের আগুনের মত উত্তপ্ত লেলিহান হইয়া জ্বলিতেছে। শিউচার টুঁটিটা ছিঁড়িয়া না দিয়া তাহার শান্তি নাই। সে ফিরিল।

হঠাৎ একটা মোড়ের মাথায় পথের ভিড়ের মধ্যে হইতে কে তাহার জামার পিছনটা চাপিয়া ধরিয়া টানিল।

—কে? এ্যার্ত! দুলাল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—ওরে শত্রু—ওরে—।

ব্রজদাসী!

ব্রজদাসী পথে পথে আসিতেছে দুলালের খোঁজে। মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়াই দেখিল—দুলাল। সে তাহার জামার পিছন দিকটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল—ওরে শত্রু—ওরে রাক্ষস—! কিন্তু কথা তাহার শেষ হইল না, জিভে আটকাইয়া গেল। একটা কদর্য উৎকট গন্ধ তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া দিল, কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল, বোধ করি হৃৎপিণ্ডটাও মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

পরমুহূর্তেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—দুলাল!

সে চীৎকারে পথের জনতা চকিত হইয়া উঠিল; মনে হইল কেউ যেন আকস্মিক মৃত্যুর অতি নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় সংসারের আপনতম জনটির নাম ধরিয়া শেষ চীৎকার করিয়া উঠিল।

—কি হ'ল? কে? কে? কার কি হ'ল?

কেহ উত্তর দিল না। কেহ বুঝিতে পারিল না কে চীৎকার করিয়াছে। ব্রজদাসী পরমুহূর্তেই দ্রুতপদে যেন ছুটিয়া পলাইয়া চলিয়াছিল।

দুলাল দাঁড়াইয়া ছিল অসাড় নিস্পন্দ—একটা মাটির পুতুলের মত।

দুলাল এখানে সকলের পরিচিত।

দুলালের নামটাও সকলের কানে গিয়াছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল—কি রে দুলাল?

দুলাল অকস্মাৎ অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল, একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিয়া বসিল।

জনতা তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল। কিন্তু ব্রজদাসী ফিরিয়া চাহিল না।

আট

ছুটিয়া পলাইয়াছিল।

ব্রজদাসী যেন সংসার হইতে ছুটিয়া পলাইবে। দুলাল মদ খাইয়াছে। বৈষ্ণবীর অন্তর হাহাকার করিতেছিল। ইহা অপেক্ষা দুলাল মরিল না কেন? হায় ভগবান, হায় রাধা-গোবিন্দ—এত বড় অসুখ, দীর্ঘ দেড়মাস দিন রাত্রি শিয়রে বসিয়া এই দেখিবার জন্য ওই রাক্ষসকে—ওই শত্রুকে সে বাঁচাইয়া তুলিল! আজ ষোল বৎসর ধরিয়া তাহার ধর্ম কর্ম ইষ্ট সাধনার অবসর খণ্ডিত করিয়া একটা মাংসপিণ্ডকে সে লালন করিয়া এত বড় করিয়া তুলিল—ইহারই জন্য! চোখ দিয়া তাহার বন্যা বহিতেছিল। হে ভগবান! কি করিবে সে? কোথায় যাইবে সে? এ লজ্জা কোথায় রাখিবে সে?

—ব্রজ! ব্রজদাসী! ব্রজ!

—অ্যাঁ! ব্রজ বুঝিতে পারিল না কার কণ্ঠস্বর। সে হাঁপাইতেছিল।

—ব্রজ!

ডাকিতেছিলেন—মানগোবিন্দপুরের বাবাজী। ব্রজদাসী চলিয়াছিল মাঠের পথ ধরিয়া। বাবাজীর আখড়া মাঠখানার উপরেই, এখান হইতে অল্প খানিকটা দূরে। ব্রজদাসীর গ্রামে ফিরিবার পথ কাঁচা সড়কটা ওই মাঠের ওপরেই—আখড়ার কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্রজদাসীর খেয়াল ছিল না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই আখড়ার সান্নিধ্য এড়াইয়া মাঠে মাঠে চলিয়াছিল—সে ব্রজদাসীও জানে না, সে শুধু চলিয়াছিলই। বাবাজী মাঠের মধ্যে কি যেন করিতেছিলেন, ব্রজদাসীকে এইভাবে মাঠের পথে আত্মহারার মত ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন।

ব্রজ বুঝিতেই পারিল না কাহার কণ্ঠস্বর।

সম্ভবতঃ চরম লজ্জায় সে বুঝিতে চাহিতেছিল না। কি বলিবে সে বাবাজীকে!

—ব্রজ!

এবার ব্রজ ফিরিয়া চাহিল।

—কি হ'ল ব্রজ? এমন ক'রে—? কথা শেষ করিতে পারিলেন না বাবাজী। ব্রজদাসীর মুখের চেহারা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কি হ'ল? তবে কি রোগের হঠাৎ কোন নূতন আক্রমণে দুলালের কিছু হইয়াছে?

—কি হয়েছে ব্রজ? দুলাল—

ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ব্রজদাসী।

বাবাজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—দুলাল ভাল আছে ব্রজ?

ব্রজ সেই মাঠের মধ্যেই বাবাজীর পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিল—দুলাল কেন মরল না প্রভু? সে কি—

—কি হ'ল ব্রজ? এ কি বলছ তুমি?

—দুলাল মদ খেয়েছে প্রভু! সে এর চেয়ে মরল না কেন? এ আমি কি করব?

চোখের জলের আর বিরাম ছিল না।

বাবাজী যেন অকস্মাৎ একটা কঠিন আঘাত পাইলেন, চমকিয়া উঠিলেন, কথা বলিতে পারিলেন না।

ব্রজ আকুল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল—বলুন, আমি কি করব? আমার পরিত্রাণের উপায় বলে দিন! সে প্রত্যাশাভরা নির্নিমেষ করুণ দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাবাজী বলিলেন—পরিত্রাণ হয় তো আছে ব্রজ, কিন্তু তা তুমি পারবে?

—পারব—খুব পারব। আপনি বলুন।

—ব্রজ—গাছ জীবনের সকল রস জমিয়ে তাকে জলে রোদে পাক ক'রে বহু কষ্টে ফুল ফোটায়—সেই ফুল থেকে হয় ফল, সেই ফল বাড়ে—তারপর একদিন পাকে—খসে পড়ে; সেদিন গাছের দুঃখটা বুঝতে পার? কিন্তু ফলের সেদিন পরমানন্দ। সে স্বাধীন জীবন পেলে মাটির বুকে—নিজের বীজকে ফাটিয়ে গাছ হবে। এ সংসারের নিয়মই এই। ওর আশা তুমি ছেড়ে দাও। ওকে যেতে দাও নিজের পথে।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্রজ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাবাজী দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—বৃন্দাবনে যাবে ব্রজ? যাও যদি, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সন্তানের দুঃখ বড় দুঃখ ব্রজ, আমার দুঃখ তো তুমি জান। পারবে—যাবে?

ব্রজ এ কথার জবাব দিল না, মনের আবেগে বলিল—আপনি তো অনেক জানেন, অনেক বোঝেন—বলতে পারেন এ আমার কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত? আমি তো কোন পাপ করি নাই। তবে, তবে আমার এ শাস্তি কেন?

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—শাস্তি তো নয় ব্রজ!

—শাস্তি নয়?

—না। এই তো নারীজন্মের পরমানন্দ ব্রজ। বেদনার মধ্যে দিয়েই সন্তানের জন্ম, সে বেদনায় মনে হয় ত্রি-সংসার বিলুপ্ত হয়ে গেল—অন্ধকারে, নিজের আত্মা দু'খানা হয়ে সন্তান পায় তার আত্মা!

ব্রজ অধীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—না-না—প্রভু আমি জানি না, ও আনন্দ যদি পেতাম ও যদি আমার গর্ভের সন্তান হ'ত তবে যে আজ আমি নিজেকে বুঝাতে পারতাম আমার পাপে ওর এই মতি—আমার রক্তের দোষে—ওর—

সে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ ষোল বছর এ কথা আপনার কাছেও প্রকাশ করি নি। ও আমার গর্ভের সন্তান নয়—।

দিগন্তের দিকে চাহিয়াই সে বলিল—দিগন্তের পটভূমিতে যেন ষোল বৎসরের ইতিহাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বেরিয়েছিলাম বৃন্দাবনে। পদব্রজে। বড় মনের দুঃখেই বেরিয়েছিলাম—। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। প্রভু শ্যামচাঁদ আমাকে রূপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন গান গাইবার কণ্ঠ। মা বলতো—আমার কোলে এসেই তোর সোনার কপালে ধুলো লাগলো রে ব্রজ, ভিখেরী বাউল বৈষ্ণবের মেয়ের গর্ভে জন্মালি—ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে ভিখারিণী তোকে সাজতেই হবে। নইলে যে রূপ তোর—যা তোর গানের কণ্ঠস্বর—তাতে রাজপুরীতে সোনার পালঙ্কে বসে তোর বীণা বাজিয়ে গান গাইতিস মা!

মেঘে ঢাকা শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের মত বেদনাচ্ছন্ন এক টুকরা হাসি ব্রজদাসীর ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিল—সম্ভবতঃ মনে পড়িয়া গেল আপনার সে রূপের কথা। বলিল—তা রূপ আমার ছিল প্রভু। কপালে চাঁদ ফুটে উঠত পূর্ণিমার রাত্রে যখন চাঁদের পানে চাইতাম।

বাবাজী বলিলেন, তুমি যে দিন দুলালকে কোলে নিয়ে নবীন ক্ষ্যাপার আঙিনায় বসে গান শুনিয়েছিলে ব্রজ, সে দিন পূর্ণিমা ছিল না—সে দিন ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী, সে দিনও তোমার কপালে চাঁদ আমি দেখেছিলাম।

—না প্রভু দেখেন নি। আপনি যখন দেখেছেন তখন রূপে আমার কার্তিকের রাত্রির ধোয়া ধুলোর মত কুয়াসার মত একটা ঝাপসা ছিল্‌কে পড়ে গিয়েছে। যখনকার কথা বলছি তখন কপালে আমার ফুটে উঠত শরতের চাঁদের আলোর মত ঝলমলানি। প্রভু আয়নায় নিজের মুখ দেখতাম—দেখে নিজেরই আমার আশা মিটত না। কিন্তু বিশ্বাস করুন বাউল বৈষ্ণবের মেয়ে আমি, আমি মায়ের কথা শুনে সুখ পেতাম না। আমার এক গুরু ছিলেন সাধক বৈষ্ণব—তাঁর কথায় মন আমার ভরপুর হয়ে থাকত। আমার মায়ের কথা শুনে তিনি বলতেন—এ কি কথা গো ব্রজর মা! তুমি না বাছা বৈষ্ণবী! এমন রূপ কি অকারণে পেয়েছে!

বৈষ্ণবের ঘর যমুনা তটের নিকুঞ্জ, নিকুঞ্জের ধারে যমুনার বুকে ফুটেছে শ্বেত কমল—ওতে হবে প্রভুর পূজা! ও হ'ল কৃষ্ণপূজার কমল, তাই জন্মেছে সাধন পথের পথিক বৈষ্ণবের ঘরে, ও যদি রাজার ছেলের গলার মালাই হবে তবে রাজবাড়ীর সরোবরে ফুটল না কেন? প্রভু তিনি গান গাইতেন "কৃষ্ণপূজার কমল কলি রাখব আমি মাথায় করে।" আমি সেই স্বপ্ন দেখতাম। মহাজনের পদাবলী তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। ওই লীলার স্বপ্ন আমাকে বিভোর করে তুলেছিল। হায় রে দুর্ভাগা মানুষ! মানুষের মধ্যে দুর্ভাগা হ'ল মেয়ে জাত প্রভু। গুরু বলতেন "কৃষ্ণপূজার কমল" কিন্তু ভাবতেন না যমুনার জলে যে কমল ফুটত—সে কখনও শুকাত না, কিন্তু মানুষের রূপ-যৌবন যায়, কমল ফুলও শুকিয়ে যায়, সেদিন প্রভুর চরণ থেকে ধুলোয় গিয়ে পড়ে! প্রভু ভালবেসেছিলেন—ওই লীলাগানের কিশোরীর ভালবাসার মত একজনকে সেই বয়সে ভালবেসেছিলাম। মনে হয়েছিল—ওর কাছে লজ্জা পায় রাজার ছেলে, ওই আমার রাজার রাজা, ওই হ'ল সকল গুণীর সেরা গুণী, ওই হ'ল—সকল পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম। সেও আমাকে সেদিন বলেছিল, বৈষ্ণব সে—সব মহাজনের সেরা মহাজন—প্রভু চণ্ডীদাসের পদ গেয়ে আমাকে শুনিয়েছিল। গেয়েছিল—"ও দুটি—।"

ব্রজদাসী চুপ করিয়া গেল। আজ এই বেদনার্ত মনেও সে লজ্জা পাইল। সে সেদিন বলিয়াছিল—"ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।"

কিছুক্ষণ পর ব্রজ বলিল—বিশ্বাস করেছিলাম। অকপটে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু শ্যামচাঁদ হয়তো হেসেছিলেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। তারপর বলিল—শ্যামচাঁদকে তো চাই নি, চেয়েছিলাম তাকে, তাই প্রভু হেসেছিলেন, হয়তো বলেছিলেন—তোর কর্মফল, আমার দোষ কি? নারী হয়ে জন্মেছিস, মহাজনের পদাবলী গান করেও চোখ তোর ফুটলো না, সামান্য পুরুষে করলি পুরুষোত্তম বলে ভ্রম, তার ফল তোকে পেতে হবে—জানতে হবে মাটির পৃথিবী নারীজন্মের কোন্ দাম দেয়, সেই দাম তোকে নিতে হতে। সে দাম নিতে হ'ল, বুঝতে হ'ল একদিন। বয়স বেড়ে আসছিল—আটাশ বছর বয়স, দুলালকে পাবার মাস কয়েক আগে আমাকে সে ত্যাগ ক'রে নতুন বৈষ্ণবী নিয়ে এল ঘরে। বললে—আমার সাধনার সামনে—রূপ চাই, যৌবন চাই, তা' আজ তোমার নাই। লুকিয়ে আয়নায় মুখ দেখলাম ভাল ক'রে—দেখলাম সে মিথ্যে বলে নাই, রূপের ওপর আমার কার্তিকের সন্ধ্যার কুয়াসার ছিল্‌কের মত ছিল্‌কে পড়েছে। প্রভু—কমল ফুল শুকিয়ে গিয়েছে। তাকে কি দোষ দেব? আমিই তো নিত্য আমাদের আখড়ায় শ্রীমন্দির মার্জনা করতাম, বাসি ফুলগুলি আমিই বের ক'রে ফেলে দিতাম, বাসি ফুলের দাগ লেগে থাকলে ঘষে পরিষ্কার করতাম, নিজের হাত তাও ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলতাম, দাগ উঠে গেলেও হাত শুঁকে দেখতাম—কোন গন্ধ উঠছে কি না। তখন বুঝলাম—নারীজন্মের দাম। এ পৃথিবীতে নারীজন্মের দাম রূপ আর যৌবন। ফুলের দল খসে যায়, তাতে ফল ধরে, বীজ হয়। সে বীজে গাছ হয় কিন্তু যে ফুল অন্তর শুদ্ধ দেবতার পায়ে না দিয়ে সেখানে ওঠে—তার না-হয় দেবতাকে পাওয়া, না হয় ফলে বীজে নূতন করে বাঁচা, তাকে ধুলোয় মিশিয়ে যেতে হয়। সেই দিনই আমি মনের ধিক্কারে বেরিয়ে পড়লাম। পৃথিবী তখন অন্ধকার। স্থির করলাম যে পুরীতে অক্ষয় চাঁদ বিরাজ করেন—যেখানে যাব। যাব বৃন্দাবনে। পদব্রজে যাব, ভিক্ষা করতে করতে চলে যাব।

নয়

তখন মনে পড়িয়াছে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের—সকল দুঃখের সকল সুখের পরমাশ্রয়কে। দেবতাকে ইষ্টকে মনে পড়িতেই সে তাঁহার আশ্রয় লইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। একা চলিয়াছে। রূপ যৌবন থাকিতেও পথ চলিতে ভয় করে নাই। কাঁধে শুধু একটি ঝুলি—বগলে একটি ছোট পোঁটলা—আর একটি ঘটি।

বেদনায় মানুষ যখন আপনাকে হারায়, তখন এমন করিয়াই হারায়।

মাস খানেক পথ চলিবার পর হঠাৎ একদিন সে বিপদে পড়িল। পথ চলিতে চলিতে বড় একটা রেল স্টেশনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। ভিক্ষায় ভিক্ষায় কিছু টাকা তাহার ইতিমধ্যে জমিয়াছিল—সেই টাকায় একটা টিকিট করিয়া খানিকটা আগাইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। যত দিন যাইতেছে—ততই পদব্রজে বৃন্দাবনে পৌঁছিবার উৎসাহে ভাটা পড়িতেছে। তাহার উপর সামনেই আছে বড় একটা নদী এবং জঙ্গল-সমাকীর্ণ কতকটা স্থান। জায়গাটা সম্পর্কে চুরি ডাকাতি রাহাজানির গল্প কাহিনীর মত এ-অঞ্চলে প্রচলিত। খানিকটা ট্রেনে চড়িবার সঙ্কল্প করিয়া সে নিজের উপরেই খুব খুশী হইয়া উঠিল। পথ চলিয়া ক্লান্তও হইয়াছিল। মনের ক্ষোভ, সংসারের উপর তিক্ততার পরিমাণ যতই হোক—দেহ তো রক্ত-মাংসের মানুষের।

সমস্ত দিনটা স্টেশনের বাজারটায় গান গাহিয়া ভিক্ষাও মিলিল প্রচুর। অপরাহ্ণে সে আসিয়া মুসাফেরখানায় উঠিল; স্টেশনের যাত্রীশালা। সেখানেও একদফা সে খঞ্জনী বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল, সামনে পাতিয়া দিল নিজের ভিক্ষা-পাত্রটা।

গান শেষ হইতে ভিক্ষাপাত্রটায় পড়িল অনেক, পয়সা হইতে সিকি পর্যন্ত। হঠাৎ একটা টাকা ঠং করিয়া পড়িল। সকলেই চমকিয়া উঠিল—দাতাকে দেখিবার জন্য, বৈষ্ণবীও মুখ তুলিয়াছিল। একজন তকমা-আঁটা আর্দালি, সে বলিল—সাব বকশিশ দিয়া। আপিস মে বইঠকে গীত শুনা। সে হাসিতে লাগিল। বৈষ্ণবী টাকাটা কপালে ঠেকাইয়া সাহেবকে নমস্কার জানাইল। চাপরাসী বলিল—সাহেব হুকুম দিয়া কি—

কে একজন বলিল—বাংলাতে বল বাবা। বষ্টুমী বষ্টুমী হ্যায়—ব্রজধামের আহিরিণী নয়। হিন্দী-মিন্দি বুঝবে না।

—হাঁ হাঁ। সাহেব হুকুম দিলো কি—উসকে বাংলোমে লিয়ে আও, গানা শুনাও!

—সাহাব বাংলা গান শুনবে? পরমুহূর্তেই বষ্টুমী প্রশ্ন করিল—সায়েব বাঙালী নাকি তোমাদের?

মুসাফেরখানার স্টলের একটা ছোকরা বলিয়া উঠিল—আমার চেয়েও রঙ কালো গো বষ্টুমী। রোজ ওই আর্দালিটা বাজার থেকে পুঁইডাঁটা কুমড়োর ফালি নিয়ে যায় আমি দেখেছি।

বষ্টুমী হাসিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল—চল।

এদেশের মানুষ হইলে তাহার ভয় কি? তাহার কণ্ঠে প্রভুর লীলার মোহন মন্ত্র, সে মন্ত্রে, সে গানে পাষাণ গলে, পশু বশ মানে! পথে বাহির হইয়া দেখিল সে অনেক। গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া শুধু তো মুষ্টিভিক্ষাই পায় নাই—ওই একমুষ্টি চালের সঙ্গে তাহাদের কত ভালবাসাই না পাইল সে।

সাহেব? সাহেবও সে দেখিয়াছে। সদর শহরে দিন কয়েক ভিক্ষা করিয়াছে—সেখানে খাঁটি সাহেব মেকী সাহেব দেখিয়া আসিয়াছে এই দিনকয়েক আগে। মেকী সাহেবের বাংলোয় সে দেখিয়াছে—সাহেব সাজিয়া মুখে চুরুট চাপিয়া কর্তা বলিয়াছে—কেয়া মাংটা, বাগো। দিব্যি আলতা পায়ে গরদের শাড়ী পরিয়া গিন্নী বাহির হইয়া আসিয়া বলিয়াছে—মরণ! ফকীর বষ্টুম ভিক্ষে চাইতে এসেছে—তাদের কাছেও হিন্দী চালাচ্ছে? এসো গো বাছা—এস ভিক্ষে নিয়ে যাও!

বষ্টুমী বলিয়াছিল—প্রণাম মা-ঠাকরুণ, গান শুনবেন?

—গান? গান জান? গাও, গাও। শুনব বই কি?

বষ্টুমীর মনে দুর্বুদ্ধি জাগিয়াছিল। খঞ্জনীতে ঘা দিয়া বলিয়াছিল—ব্রজেশ্বরী রাধা মান করেছেন—শ্রীগোবিন্দ নাপতানী সেজে আলতা পরাব বলে পায়ে ধ'রে মান ভাঙাচ্ছেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতিদর তিমিরমতি ঘোরং।

গানটা সে জমাইয়া ধরিয়াছিল। বাংলোর যত চাকর আর্দালি আসিয়া আনাচে কানাচে দাঁড়াইয়া গান না শুনিয়া পারে নাই। সে যাহা চাহিয়াছিল, তাহা হইয়াছিল। খোদ সাহেব আসিয়া নিজেই একটা বেতের চেয়ার টানিয়া গিন্নীর পাশে গান শুনিতে বসিয়া গিয়াছিলেন। গিন্নী নাকে কাপড় দিয়া বলিয়াছিলেন—উঃ! সাহেব চমকাইয়া উঠিয়া—ওঃ! বলিয়া হাতের চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন! বষ্টুমী গান গাহিতে গাহিতেও না হাসিয়া পারে নাই, মুহূর্তে বুঝিয়া লইয়াছিল—চুরুটের গন্ধ গিন্নীর সহ্য হয় না। সাহেবকে চুরুট খাইতে হয়—গিন্নীর সঙ্গে আলাপের সময় বাদ দিয়া।

শেষ 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'—কলিটি গাহিয়া গান শেষ করিতেই খাঁটি বাংলায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—বাঃ, চমৎকার! যেমন তোমার গলা তেমনি তোমার শুদ্ধ ক'রে গাইলে। কার কাছে গান শিখেছ?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—বাউল গুরুর কাছে প্রভু; তিনি নিজেই ছিলেন মহাজন। গুরুর নাম স্মরণ করিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কৌতুক বোধ—রসিকতার ইচ্ছা—সব ওই দুই ফোঁটা চোখের জলের মধ্যে দুই বিন্দু অগ্নিকণার মত পড়িয়া নিবিয়া কোথায় তলাইয়া গেল; বিন্দু সিন্ধু হইয়া উঠে সময়ে সময়ে, দুই বিন্দু চোখের জল তাহার দুই সমুদ্র হইয়া উঠিল যেন!

সেদিনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে গুরুকে স্মরণ করিয়া সে পা বাড়াইল। জয় গুরু—জয় রাধেশ্যাম! তারপর একটু হাসিয়া বসিয়াছিল—চল দেখি তোমার সাহেব কেমন? চাপরাসীটাও কথা শুনিয়া হাসিয়াছিল।

রেলের লাইন দেখিয়া বেড়ান সাহেব। স্টেশন হইতে লাইন ধরিয়া খানিকটা গিয়া সাহেবের বাংলো। কেমন নির্জন, গাছ-পালায় ছায়াঘন। আগে আগে লাইন-দেখিয়ে সাহেবেরা ছিলেন খাঁটি সাহেব, অথবা আধা সাহেব অর্থাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এখন এদেশী লোক ওই চাকরি পাইতেছে। কিন্তু আসনের বা পদের একটা মহিমা আছে। স্টেশনের ছোকরা মিথ্যে বলে নাই—বাড়ীতে পুঁইডাটা কুমড়োর ফালি আসে, কিন্তু সাহেব টেবিলে বসিয়া খান। বারান্দার দরজার পাশে একটা আশ্চর্য রকমের কুকুর ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইতেছিল। পায়ের শব্দে কুকুরটা মুখ তুলিয়া দেখিয়া আড়মোড়া ছাড়িয়া লইল। আর্দালিটা বলিল—যাও—যাও!

বষ্টুমী থমকিয়া দাঁড়াইল

—চলো-চলো—ডর নেহি হ্যায় !

—না।

ঠিক এই মুহূর্তে সাহেব বাহির হইয়া আসিল। আর্দালি বলিল—কুত্তা দেখকে ডরতি হ্যায় হুজুর।

সাহেব হাসিয়া কুকুরটাকে ডাকিয়া তাহার ঘাড়ে চাপড়াইয়া বলিল—দেও—সেলাম দেও !

কুকুরটা একটা পা তুলিয়া মাথাটা ঈষৎ নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—একেবারে নিরীহ ভেড়ার বাচ্চার মত। সাহেব বলিল—এস—তোমাকে কিছু বলবে না, সেলাম দিচ্ছে তোমাকে।

—মা-ঠাকরুণ কই ?

—আছেন—আসছেন, ভেতরে এস।

নিঃশঙ্ক মনেই বষ্টুমী বারান্দায় উঠিয়া বলিল—এইখানেই বসি।

—না, এই সামনের বসবার ঘরে !

চমৎকার সাজানো ঘর। কত আসবাব। বষ্টুমী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—গিন্নী মায়ের জয় হোক। আসুন মা।

সাহেব একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—বস।

—কই, মা-ঠাকরুণ কই ?

—তুমি গান ধর না ! আসবেন, গানের সাড়া পেলেই আসবেন।

বলিয়া কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মারিয়া ইংরাজীতে কি বলিলেন। কুকুরটা পাশেই দিব্য শ্রোতার মত বসিয়া গেল।

বষ্টুমী আবার বলিল—মা-ঠাকরুণ কই ? কণ্ঠস্বর তাহার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। এমন নিস্তব্ধ বাড়ীটায় সূচ পড়িলেও শব্দ ওঠার কথা, কিন্তু মানুষের কোন সাড়া নাই। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা পাখী শুধু ডাকিয়া উঠিতেছে।

সাহেব এবার বলিলেন—মা-ঠাকরুণ বাড়ী নেই। তাতে কি হয়েছে ? তুমি গান শোনাও না !

—না। আমাকে তবে মিথ্যে বলে ডেকে আনলে কেন আপনার লোক ?

—উঠো না, বস।

—না। সে মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওই প্রকাণ্ড কুকুরটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে যেন চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া নিম্ন স্বরে একটা হিংস্র গর্জন করিয়া উঠিল—গোঁ— ! গোঁ— !

সাহেব হেসে উঠল হি-হি করে। বললে—এবার নড়লেই ও তোমার কাঁধে পা তুলে দিয়ে দাঁড়াবে। বস—বস। গান শোনাও।

ভয়ে বষ্টুমীর সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে। সে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সাহেব আবার একবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া সে নিজেকে সম্বরণ করিল। তারপর খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গানও শুনাইল। গান শেষ করিয়া বলিল, এইবার আমি যাই। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার গোঙাইয়া উঠিল।

সাহেব হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—আজ তোমাকে রাত্রিটা এখানে থাকতে হবে। বুঝেছ না? খালি বাংলো, মেয়েরা কেউ নেই, রাত্রে থাকবে—গান শোনাবে—নাচতে পার—নাচতে?

সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—না!

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও বার-দুই গম্ভীর আওয়াজ করিয়া ডাক দিল—হাউ—হাউঁ!

সাহেবও কুকুরটার সুরে সুর মিলাইয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর আবার বলিল—দেখলে তো! জ্যাকের মত কুকুর আর হয় না। বুঝলি জ্যাক, এ রইল। খবরদার—চেঁচাতে দিবি না, নড়তে দিবি না। আমি চললাম এখন।

নৃশংস লোকটা—লোকটা নয়, পশুটা—ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

ষোল বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। আজ ষোল বৎসর পরেও সেই ঘটনার কথা মনে করিয়া ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। বলিল—সে দিন আমার মনে—

বাবাজী বলিলেন, থাক—ব্রজ—থাক—

—না। আজ ষোল বছর কলঙ্কের পসরা মাথায় করে লুকিয়ে রেখে এসেছি—সে কথা আজ না বলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।—জানে দুজনে—আপনিও শুনুন। নইলে শান্তি পাব না—স্বস্তি পাব না আমি। ম্লান হাসিতে বাবাজীর মুখ সকরুণ হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন তিনি।

আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিয়া ব্রজ বলিল—কি করব? মনে মনে শ্যামকে ডাকলাম। বললাম—এই তোমার মনে ছিল? শেষে কি এমন ভয়ঙ্কর সাজা দেবে আমাকে? আমার গুরু একটি গল্প বলতেন। তাঁর গুরুর গল্প। তাঁর গুরুর আখড়াটা ছিল নাকি খুব জমজমাট! মহাপ্রভুর শ্রী-অঙ্গে ছিল অনেক অলঙ্কার। লোকে বলত টাকাও নাকি অনেক। একদিন রাত্রে ডাকাত পড়ল। দরজা ভাঙছিল তারা, আমার গুরুর গুরু নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে বললেন—এলে—এলে—শেষে এই রূপেই এলে? তারা কথা শুনতে আসে নাই—এসেছিল ডাকাতি করতে, তারা প্রথমেই তাঁকে মারলে, মাথায় লাঠি মারলে। চাইলে কোথায় কি আছে দে। তিনি হেসে বললেন—নাও, সঞ্চয়ের মতি হয়েছিল—তোমার নামে করেছি—সে সঞ্চয় নিতে তোমার এই রূপেই তো আসার কথা। এসেছ—নাও। তিনি মন্দিরের দরজা খুলে একে একে খুলে দিলেন—সব অলঙ্কার। তারা বললে—টাকা! কিছু টাকা পুঁতে রেখেছিলেন—তাও দেখিয়ে দিলেন। তারা বললে—আর? তিনি হাত জোড় করে বললেন, আর তো নাই প্রভু। তারা তা বিশ্বাস করলে না, জ্বলন্ত মশাল দিয়ে মেরে সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। তাতেই তিনি দেহ রেখেছিলেন। আমার গুরুকে বলেছিলেন—বাবা—এই না হ'লে আমার মুক্তি ছিল না, তাঁর চরণ পেতাম না আমি। আমার সাধনের ফাঁকি যেটুকু ছিল—সেটুকু তিনি নিজে হাতে ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন ওই মূর্তিতে এসে। ইদানীং আমিও এই রকম ভাবছিলাম। বড় মমতা ছিল আমার। ঘুচে গেল, ঘুচিয়ে দিলেন, এইবার তাঁর মদনমোহন রূপ দেখতে পাব আমি।

ব্রজ বলিল—সেদিন ওই গল্পটি মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল—দিতে তো পারি নি নিজেকে ভুলে—নিজেকে তুলে—দিতে যদি পারতাম তবে কি আর একজনকে ঘরে আনলে বলে—এমন করে চলে আসতে পারতাম? তাই কি শেষে এই ভয়ঙ্কর বেশে প্রভু আমার এই সাজা দিচ্ছেন? কেঁদে উঠেছিলাম ফুঁপিয়ে, কেঁদে গলা ছেড়ে ডেকেছিলাম—দয়া কর

গোবিন্দ—! সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা উঠল গর্জে। ভয়ে গলা বন্ধ হয়ে গেল—আমি যেন কাঠ হয়ে গেলাম।

আবার সে শিহরিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে সে দিন আবার ভাসিয়া উঠিল।

* * *

জীবনে সে এক যন্ত্রণার দিন। এমন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সে জীবনে কখনও ভোগ করে নাই। নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড বাড়ী, চারিদিকে গাছপালার মধ্যে শুধু ঝিঁ ঝিঁ ডাকিয়া চলিয়াছে ওই একটানা নিম্নস্বরের ডাক—যেন একটা কান্নার প্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে। ঠিক যেন তার অন্তরের কান্নার প্রতিধ্বনি। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়াই চলিয়াছে। মুখের সামনে স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রকাণ্ড কুকুরটা বসিয়া আছে বিভীষিকার মত। তৃষ্ণায় তাহার বুক হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্যন্ত শুকাইয়া যেন বৈশাখের বালুচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও ডাকিবার উপায় নাই, চীৎকার করিবার উপায় নাই।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। অতি সামান্য—কিন্তু বৈষ্ণবীর চোখে সেটা অঘটন বলিয়াই মনে হইল। বাড়ীর পাশের জঙ্গল হইতে সামনের ঘরটার খোলা জানালা দিয়া লাফাইয়া ঘরে ঢুকিল একটা বড় বেজীর মত জানোয়ার। বৈষ্ণবী দেখিল, কিন্তু কুকুরটা দেখিতে পাই নাই। জানালাটা যে ঘরের—সেই ঘরের দিকে সে পিছনে ফিরিয়া বসিয়া আছে। শুধু নাকটা তুলিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল;—গন্ধ বৈষ্ণবীও পাইয়াছিল—সে বুঝিল—খাদ্যলোভে কোন লোভী খটাশ আসিয়া ঢুকিয়াছে। হতভাগ্য খটাশ। ও ঘরের কোন একটা জিনিস ঝন-ঝন শব্দে উল্টাইয়া ফেলিল। এবার কুকুরটা লাফ দিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিল। খটাশটা ছুটিয়া পলাইতেছে। কুকুরটাও ছুটিয়াছে। খটাশটার উপর একটা লাফ দিয়া পড়িল। কিন্তু খটাশটা তাহার পূর্বেই লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল একটা আলমারির মাথায়—সেখান হইতে লাফ দিয়া খড়ো-বাংলোটার চালের কাঠ নখ দিয়া আঁচড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল।

কুকুরটাও লাফ দিতে শুরু করিল। মুহূর্তে বষ্টুমীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণে দেহের কম্পন—মনের ভয়কে লঙ্ঘন করিয়া উঠিয়া পড়িল। দুইটা ঘরের মাঝের দরজাটা টানিয়া ধরিল; বৈষ্ণবীর ভাগ্য, বন্ধ করিয়া দিতেই বিলাতি ঢংএর ছিটকানি খট্ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল। ওদিকে কুকুরটা তখন খটাশটাকে লইয়া মাতিয়া আছে, ঘরময় লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে, গোঁয়াইতেছে। খটাশটাও বোধ হয় চালের কাঠে কাঠে ছুটিয়া ফিরিতেছে। খর-খর শব্দ উঠিতেছে ঘরের চালের কাঠামোয়।

বৈষ্ণবী কোন্ পথে পলাইবে? পথ? পথ কই? পিছনের দিকে সে একটা জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালাগুলার শিক নাই। প্রাণপণ চেষ্টায় সে জানালার উপর উঠিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল! এইদিকেই তাহারা ঢুকিয়াছিল বাংলোয়, এটা পিছনের দিক। ছোট একটা ফটক। ফটক খুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে অন্ধকারের মধ্য দিয়া সামনে যে দিকটা পড়িল—সেই দিকেই ছুটিল।

ছুটিয়াই চলিয়াছিল।

কতক্ষণ চলিয়াছিল—হিসাব নাই। হিসাব রাখিবার মত মনের অবস্থাও নয়। শুধু সে পলাইয়া চলিয়াছে। কুকুরটা যদি জানিতে পারিয়া ছুটিয়া থাকে পিছন-পিছন! মধ্যে একবার সে থামিয়াছিল; মাঠে একটা পুকুর দেখিয়া না থামিয়া পারে নাই। তৃষ্ণায় বুকখানা ফাটিয়া যাইতে বলিয়া মনে হইতেছিল। ছুটিয়া গিয়া ঘাটে নামিয়াছিল সে। অঞ্জলিতে ভরিয়া জলপানের বিলম্ব সহ্য হয় নাই। জন্তুর মত জলের উপর মুখ রাখিয়া চৌ-চৌ শব্দ তুলিয়া সে

জলপান করিয়াছিল। তাহার পর আবার চলিয়াছিল। মাঠে মাঠেই চলিয়াছিল। চলিতে চলিতে সামনে পড়িল একটি নদী। এ দেশের নদীতে বর্ষার সময় ছাড়া জল বড় একটা থাকে না। সময়টা বর্ষা নয়—ফাল্গুনের শেষ, কিন্তু তবু সে নদী পার হইল না। পা-ও আর তাহার চলিতেছে না। আর সে পারিতেছে না—আর সে পারিবে না। সে ভয়ঙ্কর কুকুরটা যদি এখানে আসিয়াও তাহাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে! ফেলুক ছিঁড়িয়া—আর সে পারিবে না। পাশেই একটা জঙ্গল। সে সেই জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। একটা গাছতলায় মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। দুলালের জন্মতিথি। সে তিথি কি ভুলিবার! বাইশ দণ্ডেরও বেশী রাত্রি তখন চলিয়া গিয়াছে। কারণ আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ঘুম ভাঙিয়া গেল বষ্টুমীর। ক্লান্তির মধ্যেও আতঙ্কের প্রভাবে চেতনা তাহার সজাগ ছিল। ফাল্গুনের ঝরা পাতার উপর কাহার ভারী পায়ের শব্দে সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—কে?

মুহূর্তে কে যেন খানিকটা দূরের গাছতলায় হেঁট হইয়া কি করিতেছিল, বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বষ্টুমীও উঠিয়া দাঁড়াইল; আতঙ্কে তাহার সর্বশরীর থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চন্দ্রালোকের রহস্যময় স্বচ্ছতার মধ্যে একটা সাদা মূর্তি দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আবার প্রশ্ন করিতে চেষ্টা করিল—কে? কিন্তু গলার স্বর বাহির হইল না। ওদিকে মূর্তিটাও একটা অস্ফুট ভয়ার্ত চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল, সামনে নদী, নদীতে ঝাঁপ দিতে ভয় করিল না। বষ্টুমী দেখিল, জ্যোৎস্নায় আলোকিত ওপারের বালুচরের উপর দিয়া মূর্তিটা চলিয়া গেল—ক্রমে বালুচরের শেষে স্থির কালো একটা কিছুর মধ্যে মিশিয়া গেল। ওটা একটা গ্রাম, গাছপালাগুলি স্থির কালো মূর্তি লইয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এদিকে একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য শব্দ!

কান্নার শব্দ! শিশু-কণ্ঠের কান্নার শব্দ! গাছতলা হইতে এক-পা-এক-পা করিয়া আগাইয়া গেল বষ্টুমী। আকাশে চাঁদ—বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; জঙ্গলের ভিতরেও মধ্যে মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না আসিয়া মাটির উপর পড়িয়াছে। সাদা আলোর মধ্যে কালো কালো এগুলো কি? কয়লা, কাঠ-কয়লা! ওটা কি? খালি কলসী কাত হইয়া পড়িয়া আছে। রাজ্যের কাপড়-বিছানা ওই—ওই—দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এবার বেশ সতর্ক হইয়া হেঁট হইয়া দেখিল—নজরে পড়িল—হাড়; টুকরা টুকরা হাড়ও ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাই বটে! শ্মশানই বটে! কিন্তু এখানে শিশু কাঁদে কোথায়, কাঁদিবে কি করিয়া! ভয়ে তাহার শরীর আবার কাঁপিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু তা-ও সে পারিল না। ভয়েই পা উঠিতেছে না। একটা গাছের ডাল সে সজোর মুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল; তাহার পায়ের কাছেই কান্নাটা যেন মাটি হইতে উঠিয়া আসিতেছে। একেবারে পায়ের তলায়। সভয়ে সে বসিল। তীক্ষ্ণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গাছের ছায়ার তলে—একটা পোঁটলা; কান্না বাহির হইয়া আসিতেছে তাহারই ভিতর হইতে। হাত কাঁপিতেছিল; সেই হাতেই কোনমতে সে পোঁটলাটা তুলিয়া লইল। সেক্ষণের সে মন, মনের সে উদ্বেগ—সে যন্ত্রণা—সে ভয়—জীবনে তাহার অনাস্বাদিত; মন চীৎকার করিতেছিল—না—না চাই না। হাত দুইটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু ওই পোঁটলার বাঁধন খুলিয়া শিশুটিকে না দেখিয়া তাহার পরিত্রাণ নাই, চুম্বকে এবং লোহাতে যেমন জড়াইয়া যায়—তেমনি ভাবেই হাতের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল, হাত কাঁপিতেছিল। পোঁটলা কাঁপিতেছে, পড়িতেছে

না ; পড়িলে পোঁটলার সঙ্গে সে-ও উপুড় হইয়া মাটির উপর পড়িয়া যাইবে। কোনক্রমে পরিপূর্ণ চাঁদের আলোতে আনিয়া মাটিতে নামাইল—বাঁধন খুলিল।

* * *

ব্রজদাসী বলিল—প্রভু, সেদিনের সে শেষরাত্রি আমার আজও মনের মাঝে জ্বল-জ্বল করছে। চোখ বুজলে মনে হয়—আমি যেন সেই নদীর পাড়ে শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছি ; চারিদিকে বড় বড় গাছের বন, মাটির উপর জ্যোৎস্নার টুকরো টুকরো আলো পড়েছে। আমি ছেলেটিকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বুকে ধরে থর থর করে কাঁপছি। অন্ধকার চোখে দেখতে পাইনি প্রভু—তবু ছেলেটিকে জড়ানো কাপড় আর ছেলেটির শরীর নেড়ে বুঝতে পারলাম—তার অঙ্গে তখনও মায়ের রক্ত মাখানো রয়েছে। কি যে হল, কি যে করব ভেবে পেলাম না। শুধু কাঁদলাম। বলুন তো প্রভু—মানুষের শিশু, কেমন করে সেই শ্মশানে তাকে ফেলে দিই ? কিন্তু আমি বৈষ্ণবী বৃন্দাবনের পথে পা বাড়িয়েছি—আমিই বা এই জীবটিকে নিয়ে কি করি ? মনে মনে বললাম—গোবিন্দ তুমি পথ বলে দাও ! গুরুকে স্মরণ করলাম—বললাম—গুরু, তুমি আমাকে রক্ষা কর !

বাবাজী বলিলেন,—গোবিন্দ তোমাকে ঠিক পথই দেখিয়েছিলেন ব্রজদাসী। গুরু তোমাকে রক্ষা করেছিলেন ; হতভাগা শিশু—মা-বাপ যাকে পরিত্যাগ করে শ্মশানে ফেলে দিলে—তাকে দেখেও যদি তুমি তুলে না নিতে—চলে যেতে বৃন্দাবনের পথে—তবে বিগ্রহই তুমি দেখতে, গোবিন্দকে তুমি পেতে না ! এ তুমি ঘরে ব'সে গোবিন্দকে পাবার পথ করেছ ব্রজ।

ব্রজ তীব্র আক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়া কথাটা অস্বীকার করিয়া বলিল—না—না—না। এ জীবনে পেলাম না, পাব না, পাব না। তা হ'লে—ওই দুলাল—তার মতি এই হয় ? আমার দুর্মতি প্রভু, আমার লোভ বাবাজী—মনে মনে আমার বোধ হয় ছিল সন্তানের লোভ—তাই ছলনা করে গোবিন্দ আমার কোলে ফেলে দিলেন—ওই অসুর শিশুটাকে ! মুক্তির পথ আমার সামনে খোলা পড়ে ছিল, চোখে আঙুল দিয়ে—কানে খোঁচা দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তো এর জন্মদাতার হাতে জোর করে তুলে দিয়ে মুক্তি নিতে পারতাম।

বৈষ্ণবী নীরবে চোখ বুজিয়া সেই সব কথাই স্মরণ করিল। বাবাজী সস্নেহে তাহার মাথার কোঁকড়ানো চুলের রাশির উপর হাত বুলাইয়া দিলেন—বলিলেন—এমন ভাবে ভেঙে পড়ো না ব্রজ !

ব্রজ আবার ঘাড় নাড়িল।—না—না—না। বোধ হয় সান্ত্বনাকে অস্বীকার করিল, আজ সে নিজের কথা নিজের দুঃখ নিজের উপলব্ধি ছাড়া সব কিছুই অস্বীকার করিতেছে।—কেন সে সেদিন মুক্তি লয় নাই ?

* * * *

ক্লেদাক্ত শিশুকে বুকে লইয়া সে নদীর ঘাটে গিয়া নামিয়াছিল।

আঁচল ভিজাইয়া শিশুর অঙ্গের ক্লেদ মুছাইয়া দিবে। আবরণ-মুক্ত শিশুটি তখন একদিকে পৃথিবীর বায়ু-স্পর্শে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, অন্যদিকে তারস্বরে কাঁদিতেছে। সবল শিশু !

কৃষ্ণপক্ষের একাদশী সেদিন। বৈষ্ণবী একাদশী করিয়া আছে। সামান্য ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়াছে—সেই বেলা দ্বিতীয় প্রহরের শেষে। তিথিটা তাই অক্ষয় হইয়া রহিল তাহার মনে। একাগ্র মনে সযত্নে অনভ্যস্ত অপটু হাতে ভয়ে-ভয়ে সে শিশুর অঙ্গের ক্লেদ মুছাইতেছিল। হঠাৎ

কল-কল রবে পাখী ডাকিয়া উঠিল, বৈষ্ণবী চমকিয়া উঠিল।

আকাশে চাঁদ—পূর্বার্ধের চতুর্থ পাদ অতিক্রম করিয়াছে। পূর্ব-দিগন্তে পাণ্ডুরাভা দেখা দিয়াছে। পাখীরা প্রথম ধ্বনি দিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। শিশুটির মুখ অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবী বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। সারা বুকের ভিতরটা গুরু-গুরু করিয়া উঠিতেছে। এ কি হইল? সে কি করিবে?

—কে গো? কে ওখানে? মানুষের সাড়া! বৈষ্ণবী আবার চমকিয়া উঠিল। প্রথমেই সে শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু তাও পারিল না, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সভয়ে সে চোখ তুলিয়া ওপারের দিকে চাহিল। শেষ-রাত্রির কাকজ্যোৎস্নার মত পাণ্ডুরাভার মধ্যে একটি মূর্তি ওপারে দাঁড়াইয়া আছে। চকিতের মত হইলেও—বৈষ্ণবীর মনে হইল—আকার অবয়ব ঠিক তেমনি—তাহারই মত—যে শ্মশান হইতে ছুটিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। হ্যাঁ—ঠিক তেমনি।

বষ্টুমী বুঝিল, এ সেই লোক, যে এই শিশুকে বিসর্জন দিতে আসিয়াছিল। নিশ্চয় সে-ই ভয়ে পলাইয়া গিয়াও পলাইতে পারে নাই—আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে সাহস ফিরিয়া আসিল।

বষ্টুমী বলিল—ভূত-প্রেত নই। আমি মানুষ। রাহী।

লোকটি আগাইয়া আসিল—রাহী! মেয়ে লোক—এই রাত্রে?

বষ্টুমী বলিল, এস তো এপারে। শোন তো একটু। তাহার কণ্ঠস্বরে আদেশ ছিল; সে আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ওই লোকটির নাই—সে বষ্টুমী জানে।

লোকটি নদীর জল ভাঙিয়া এপারে আসিয়া উঠিল। আসিয়াই বলিল—এ কি—তোমার সন্তান হল?

—হ্যাঁ। কিন্তু একটু সাহায্য করবে আমাকে? একটা গর্ত ক'রে দিতে পারবে? এটা তো শ্মশান, এটাকে—

'পুঁতে দেব' বলিতে সে পারিল না। ও-কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া কঠিন তিরস্কার-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি পশু—না পাষাণ?

এমন প্রশ্নের জন্য লোকটি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। সে চমকিয়া উঠিল।

বৈষ্ণবী আবার বলিল, এই বস্তুকে তুমি—। তাই শুধাচ্ছিলাম, তুমি পশু না পাষাণ?

জীবন্ত সমাধি দিতে আসিয়াছিলে, এ কথা তাহার জিভে বাধিয়া গেল।

এবার লোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি যা বলছ তা ঠিক। আমি দুই-ই। আমি পশু—পাষাণ দুই-ই বটে।

বৈষ্ণবী শিশুটিকে তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—নাও ধর।

লোকটি দু'পা পিছাইয়া গেল। কথা বলিল না, ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল—না।

* * * *

এই লোকটি মহেশ মণ্ডল।

নদীর ঘাটে বালুচরের উপর বষ্টুমীর পাশে বসিয়া অকপটে সমস্ত বলিয়া গেল।

এখানে হইতে 'দু' ক্রোশ দূরে তাহার বাড়ী। গ্রামের মণ্ডল সে। সে বলিল—লোকে আমার ভাগ্যের হিংসে করত। স্ত্রী—দুটি সন্তান নিয়ে সংসার। পনের বিঘে জমির জোত, লাখরাজ পুকুর, বাগান, গাঁয়ের মণ্ডল;—তুমি বিশ্বাস কর, আমি আমার জ্ঞানে অন্যায় করি নাই, কারও কখনও 'হ'রে-হর্মে' নিই নাই—এক ছুঁচ মাটি না, একটি কানাকড়ি না। কখনও

মিথ্যে সাক্ষী দিই নাই, কোন অখাদ্য খাই নাই। লোকে আমাকে মান্য করে। কাজেই পাঁচ-জনের চোখ আমার ওপর পড়বে যে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। তার পর বলিল—লোকের দৃষ্টির দোষ আমি দিই না। লোকের দৃষ্টিতে কিছু হয় না সংসারে—সে আমি জানি। হয় এক নিজের কর্মফলে, আর হয় ভাগ্যদোষে। কর্মফলের আমার দোষ ছিল না, দোষ আমার ভাগ্যের। আর আমার পূর্ব-জন্মের শত্রুর দেওয়া শাস্তির ফল। সে আমার শত্রু ছিল—পূর্বজন্মে ঘোর শত্রু ছিল। সে-জন্মে অনেক দুঃখ আমি তাকে দিয়েছিলাম।

—কে? কার কথা বলছ?

—আমার পরিবার! সর্বনাশী দু'টি শিশু-সন্তান দিয়ে আমাকে হাতে-পায়ে বেঁধে হঠাৎ চলে গেল। এত বড় মানুষটা ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর চোখ মুছিয়া আবার বলিল—লোকে আমাকে আবার সংসার করতে বললে। আমি বললাম—না। বলেছিলাম বষ্টুমী,—তোমরা বরং আমার ছেলে দু'টির ভার নাও, আমি চলে যাই যে দিকে দুই চোখ যায়। সেদিন আমি মিছে কথা বলি নাই, সেদিন আমি তা যেতে পারতাম।

হুঁ:—বলিয়া নিজের কথাকেই ব্যঙ্গ করিয়া সে খানিকটা হাসিল।

—জান—। সে আবার আরম্ভ করিল। জান, সর্বনাশী গেল—আমি মাছ খাওয়া ছাড়লাম, নিরামিষ্ খেতে আরম্ভ করলাম। থানকাপড় পরতে ধরলাম। বয়স আর আমার কত হবে? তিরিশ হ'ল এই বছর। দু' বছর আগের কথা। লোকে বললে, মহেশ সত্যি সত্যিই কোন দিন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে। আমারও মনে তাই ছিল, ভেবেছিলাম, ছেলে দু'টো একটু ডাঁটো হলেই দুটোরই বিয়ে দোব একসঙ্গে, এক-ঘরে দুই বোন দেখে বিয়ে দোব; তার পর বেরিয়ে পড়ব একদিন ভগবানের সন্ধানে। তখন কি জানি ছাই আমি এক-জনা নই, আমি দু'জনা। একজন হিসেবী আমি—আর একজন বেহিসেবী আমি। ও দু'জনে আপোস হয় না। বুঝেছ! আপোস করতে গেলেই ওই বেহিসেবী জন মরে। হিসেব করে যুক্তি ঠিক করছিলাম। দু'জনের এক-ঘরে দুই বোনকে বিয়ে দিলে ঘর আমার একখানা ভেঙে দু'খানা হবে না, আর দু'জনের একজন শ্বশুর হলে তার হাতে সম্পত্তির ভার দিয়ে গেলে আমারই মত দু'জনের সম্পত্তি রক্ষে করবে। বেহিসেবী জন ঠকল। তার পর আর কি, যত দিন যায়—তত ঘাটা পড়তে লাগল আমার বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার বাসনায়। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের উপর হ'ল ভীষণ আক্রোশ। অন্ন তেতো মনে হ'তে লাগল, ছেলে দুটো চোখের বিষ হয়ে উঠল। বষ্টুমী, মনের মধ্যে—বুকের মধ্যে হু-হু করতে লাগল; কি যে হু-হু করতে লাগল—তা প্রথমে বুঝতে পারি নাই। বুঝলাম ক্রমে। বুঝলাম—একদিন এই নদীর চরে একজনকে দেখে। নীচু জাতের মেয়ে, বাড়ী এখান থেকে ক্রোশ-চারেক দূরে, এসেছে কুটুম-বাড়ী। আশ্চর্য মেয়ে সে। জলে চোখ দুটো যেন দুটো জল-ভরা দীঘির মত টলমল করছে। আমি একটা গাছের তলায় বসেছিলাম আর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম—এই কথাই, কি হল আমার? সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে আমার কি হয়ে গেল। সব যেন এক নিমেষে পাল্টে গেল। দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল—মনে হল, সে রোদে যেন সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

সে-ও এসে বসল গাছতলায়। শুধালে—"চরণপুর কতটা পথ?"

আমি জবাব দিলাম কলের পুতুলের মত—শুধু চেয়ে রইলাম তার দিকে। দেখলাম—

দেখলাম—দেখলাম। দেখলাম আর বুঝলাম ;—পাপ বল পাপ, বুঝলাম, আমার সর্ব দেহ-মন ওরই জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে। মাটি যেমন মেঘের জলের জন্যে তপ্ত হয়, ফেটে চৌচির হয় —আমিও হয়েছি তাই।

সে অবাক হয়ে আমার দেখা—দেখছিল। বষ্টুমী, এক ধারার মানুষ সংসারে আছে— যারা ভাল বোঝে না—মন্দও বোঝে না, শুধু অবাক হয়। সে সেই ধারার মানুষ।

লোকটি কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিল—সেদিন যদি আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ত!

বষ্টুমী অবাক হইয়া গেল, লোকটির চোখের জল বাঁধভাঙা নদীর বানের মত অকস্মাৎ তাহার মুখ বুক ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—গাছতলায় ব'সে তাকে কত কথা শুধালাম। সে রাগ করলে না, সন্দেহ করলে না, হাসলে না, সামনের খাঁ-খাঁ করা মাঠের দিকে চেয়ে রইল—আর আমার কথার জবাব দিয়ে গেল। একবার শুধালাম—সামনের দিকে এমন ক'রে চেয়ে কি দেখছ বল তো? সে বললে—ও—ই—গাঁ, ও—ই মাঠ চলে গিয়েছে, ঝির ঝির ক'রে কেমন সব কি কাঁপছে!—গরু চরছে—হু—ই হোথা! গাছের মাথা নড়ছে হিল-হিল ক'রে। এই সব দেখছি। এই মানুষ সে। পরিচয় নিলাম। নিরাশ্রয় মেয়ে। বিধবা হওয়ার পর—ক'জন দুষ্টু লোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারাই আবার পুলিশের ভয়ে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। এখন কোথাও আশ্রয় নাই। তাই আশ্রয়ের জন্যে চলেছে—কুটুম্ববাড়ী—চরণপুর।

কিছুক্ষণ পর সে উঠে চলে গেল। বললে—তারা হয় তো ঠাঁই দেবে না। তবু দেখি।

আমি কিন্তু উঠতে পারলাম না। সে চলে গেল। তবুও আমি তাকেই দেখলাম চারি-দিকে। এমন রূপ, এমন কালো জলের মত কালো রূপ আমি আর কখনও দেখি নি। বুকের মধ্যে কালবৈশাখীর গুমোট জমে উঠল। আমি বুঝলাম আমার মন কি চায়। তবু তোমাকে বলছি—আমি মনকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। নিজেকে শুধু নিন্দে করলাম—তিরস্কার করলাম—কত বুঝালাম। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। একবার ভাবলাম—বিয়ে করি। ওই যে হিসেবী জন—সে বললে—ছি! এত কথা বলে শেষে লোক হাসাবে? লোকে বলবে কি? লজ্জায় মাথাটা যে কাটা যাবে! আজ তোমাকে লোকে যে প্রশংসাটা করে—তাই আর করবে? তা ছাড়া বিয়ে করলে—যাকে দেখে এমন পাগল হয়েছ—তাকে তো পাবে না।

হঠাৎ ঝড় উঠল মনে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। গাছতলা থেকে উঠে—সেই রৌদ্রে ছুটতে আরম্ভ করলাম। তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তাকে ডাকলাম—শুনছ—দাঁড়াও! ও—। নাম জিজ্ঞাসা করিনি। ভুলে গিয়েছিলাম। তবু সে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল। আমি তখন পাগল—।

সে থামিল—তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

'মানুষ বড় অসহায় বষ্টুমী। জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গ—ওদের বাসনা আছে লজ্জা নাই, সৃষ্টিকর্তার বেঁধে-দেওয়া নিয়ম আছে, কিন্তু নিজেদের তৈরী করা হাজার মাঝার বেড়াজাল নাই। সেইদিন সেই মাঠের উপর আমার সব ভাসিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে এলাম।'

বষ্টুমীর আর শুনিতে রুচি হয় নাই, সে অধীর হইয়া উঠিল। একটা পাষণ্ড—গলায় কান্নার সুরের মত সুর ফুটাইয়া নিজের পাপের সাফাই গাহিয়া চলিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—থাক। ও পাপ কথা শুনে আমার কাজ নাই। তুমি যাও—তুমি যাও আমার সামনে থেকে।

লোকটি উঠিয়া মাথা হেঁট করিয়া নদী পার হইবার জন্য জলে নামিল।

বষ্টুমী বলিল—কাল এই ছেলে বুকে ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে গেরস্তের দোরে-দোরে তোমার কীর্তি দেখিয়ে—কাহিনী বলে বেড়াব আমি।

মুহূর্তে লোকটি ওই জলের মধ্যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইল। চোখ দুইটা তাহার ধ্বক-ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে, দাঁতে দাঁতে টিপিয়া গিয়া চোয়ালের হাড় দুইটা শক্ত এবং উঁচু হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। সে মূর্তি দেখিয়া যে কোন মানুষের ভয় পাইবার কথা। অপরিচিত দেশ—রাত্রি-কাল—একা নারী—বষ্টুমী ভয় পাইল।

দুই পা আগাইয়া আসিয়া লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল। সে চেহারাটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া সে করুণ কণ্ঠে বলিল—বলো। আমাকে মরতে হবে। আত্মহত্যা করব।

—না। তার চেয়ে তোমার ছেলে তুমি নিয়ে যাও।

—দাও।

ছেলেটিকে লইয়া সে আবার শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইল।

বষ্টুমী চীৎকার করিল—না।

—আমার উপায় নাই—লোকটি হাসিল। সে হাসি কান্নার চেয়েও মর্মান্তিক। ব্রজ এবার মিষ্ট কথা না কহিয়া পারিল না—বলিল—ওর মাকে গিয়ে বল—ওকে কোলে ক'রে চলে যাক দেশ ছেড়ে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ বলিল—ওর মা চলে গিয়েছে। তা নইলে আর এ পাপ করতে হবে কেন আমাকে? সে উপরের দিকে চাহিয়া গভীর বেদনায় মাথা দোলাইয়া যেন মৃত হতভাগিনীর উদ্দেশেই কিছু বলিতে চাহিল।

—চলে গিয়েছে?

—হ্যাঁ। তার কাছেই পাঠাচ্ছিলাম। মাঝখান থেকে তুমি পড়েই সব গোলমাল করে দিলে। কি করব ওকে নিয়ে আমি বলতে পার? নীচ জাতের মেয়ের গর্ভে জন্মেছে—ঘরে নিয়ে গেলে আমার মান যাবে, জাত যাবে। তা ছাড়া কে ওকে মানুষ করবে? ওর মায়ের জাতের লোকেরা—তারাও ওকে নেবে না। ও তো তাদের জাতেরও নয়।

—তুমি পশু—তুমি পাষাণ।

—হাজার বার বল। আমি নিজেও গলায় দড়ি দোব। কিন্তু একে রেখে তা তো পারব না! ওপারের গাছের ডালে দড়ি আমার বাঁধা আছে। তোমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে—তাই করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এলাম ওরই মায়ায়। দেখতে এসেছিলাম সাহস করে—কে ওকে নিলে!

—তুমি ওকে আমাকে দাও।

—নেবে?

—হ্যাঁ। চল তোমার গাছের ডালে বাঁধা দড়ি আমি দেখব।

ওপারের সেই স্থির কালো পুঞ্জটার দিকে সে আগাইয়া গেল। বৈষ্ণবী তাহাকে অনুসরণ করিল।

প্রাচীন কালের ঘন বাঁশবনে ঘেরা আমের বাগান একটা।

পূর্ব দিক তখন পরিষ্কার হইয়াছে। আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকটি একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বলিল—ওই দেখ!

একটি গাছের ডাল হইতে দড়ির ফাঁস সত্যই ঝুলিতেছিল।

লোকটি বলিল—সংসারে যে কলঙ্ক নিতে ভয় পায়—তাকে ওই গলায় দড়িই নিতে হয় বষ্টুমী। হয় কলঙ্কের ভয়ে কামনার গলায় দড়ি দিতে হয়—নয় কামনার তাড়নায় ছুটে শেষ পর্যন্ত কলঙ্কের ভয়ে গলায় দড়ি দিতে হয়।

বষ্টুমী বলিল—তোমার কলঙ্ক আমি নিলাম—তুমি নির্ভয়ে বাড়ী চলে যাও।

—তুমি যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে যেয়ো না। ভগবানের দিব্যি রইল। গোবিন্দের দিব্যি। আমি হাত জোড় করে মিনতি ক'রে বলছি। দোহাই তোমার।

—আচ্ছা।

—সকাল হলেই এই গাঁয়ে যেয়ো। বাগ্দীদের গাঁ। ঘরে ঘরে গরু ছাগল—দুধ কিনতে পাবে—এই—এই—

—না। তোমার টাকা তুমি রাখ। তবে অপেক্ষা আমি করব। এই বাগানেই থাকব।

ব্রজদাসী বলিল—হায়—সেদিন যদি এ বাঁধন আমি যেচে না পরতাম!

বাবাজী বলিলেন—কেন এত ভেঙে পড়ছ ব্রজ? লোকে শুনলে হাসবে!

—হাসবে? তা হয়তো হাসবে। হাসুক তারা। কিন্তু আপনিও কি হাসছেন প্রভু?

—না ব্রজ, আমার অন্তর তোমার মতই হায়-হায় করছে! কিন্তু দুলাল আজ মদ খেয়েছে। তাকে সাবধান কর—বুঝিয়ে বল—

—প্রভু, তাকে আপনারা জানেন না। তাকে চেনেন না। আমি—। ব্রজদাসী হাসিল—আক্ষেপ যখন রাখিবার ঠাঁই থাকে না—তখনই মানুষ আক্ষেপে ক্ষোভপ্রকাশের বদলে হাসে; হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল—আমি ওকে জানি। চেনার যেটুকু বাকী ছিল—সেটুকু আজ পূর্ণ হ'ল। আজই আমি ওকে খাইয়ে দাইয়ে—গিয়েছিলাম ওর জন্যে কনে খুঁজতে। আমার কপাল! ও গাঁয়ের ভোলাদাসী, কলকাতায় পাপবৃত্তি করে পয়সা করে ঘরে এসেছে—পাপের ফল একটা মেয়ে নিয়ে। দুলালের জন্ম-কলঙ্ক মাথায় তুলে নিয়েছি, পাঁচজনে পাঁচকথা বলে আড়ালে, সে আমার অঙ্গের চন্দন করেছি। কিন্তু আজ ভোলাদাসী—তার পাপের সঙ্গে সমান ওজনের পাপের কালী অঙ্গে মাখিয়ে দিয়ে—গা ঘেঁষে ব'সে বললে—বেশ হবে ভাই, তোমার সঙ্গে বসে গোপন কথা বলব আর হাসব! তবুও আমি দমি নি প্রভু। ওই ওর জন্যে। কথা কয়ে বাড়ী ফেরার পথে বাগ্দীবুড়ী বললে—দুলাল পালিয়ে এসেছে। ছুটতে ছুটতে এখানে এলাম—চৌমাথায়—।

আবার সে আক্ষেপে হাসিল।—অথচ প্রভু—সেই রাত্রি পোয়াল—ওকে কোলে নিয়ে সেই বাগানে ব'সে ব'সে শুধু ভাবলাম—। কি ভাবলাম জানেন? বৃন্দাবনে যেদিন বের হই, আমার ঘর যেদিন ছাড়ি—পথে পা দিই—সেদিন মনে মনে বলেছিলাম—বৃন্দাবনে যাব—তবে তোমার ওই বংশীধারী ছলনাময় প্রেমিকের রূপ তো দেখব না! ও সাধ আমার মিটেছে। তাই—, তাই কি গোবিন্দ—

—সত্য—।

বৃন্দাবনের পথে চলিতে চলিতে আপন মনেই কত দিন বলিয়াছে—বৃন্দাবনে যাইব কিন্তু তোমার বংশীধারী প্রেমিক রূপ আমি দেখিব না। ও রূপ দেখার সাধ আমার মিটিয়াছে।

ঝর-ঝর করিয়া চোখে তাহার জল নামিয়া আসিত, পশ্চিমে বাতাসের স্পর্শে বিগলিত বর্ষার মেঘের মত। তাহার অতীত দিনগুলির স্মৃতিই ছিল যেন পশ্চিমের বাতাস। মনে পড়িত, কত ভাল সে বাসিয়াছিল সেই মানুষটিকে। নিজেই সে আশ্চর্য হইয়া যাইত, ভাবিত, এত ভালবাসা কি করিয়া বাসিল সে! তাহার অঙ্গস্পর্শে সে থরথর কাঁপিত, দেহের অভ্যন্তরে—প্রতিটি লোমকূপের মুখ দিয়া বাহির হইত কম্পিত অগ্নিশিখার মত শিহরণ, মরণের স্বাদের মত অপরূপ বিবশতায় সে ঢলিয়া পড়িত; মনে হইত, ইহার পর আর বুঝি পৃথিবী নাই, দিন-রাত্রি নাই, এই মানুষটি ছাড়া আর দ্বিতীয় জন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কোথাও নাই! সেই মানুষ এক দিন তাহাকে একখানা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরার মত পরিত্যাগ করিল। অভিমানে, দুঃখে, আক্ষেপে অধীর হইয়া হইয়া সে পথে পথে বাহির হইল। সেদিন সে মুক্তির মূল্য বুঝিতে পারে নাই।

বুঝিতে পারে নাই তাহার শ্যাম তাহার মানুষের স্বরূপ দেখাইয়া—মুক্তি দিয়াছিলেন। সে অভিমান করিয়াছিল, দুঃখ পাইয়াছিল—তাই তিনি ছলনা করিয়া ওই শিশুকে কোলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অলক্ষ্যে হাসিয়াছিলেন। ব্রজর চোখ তো প্রভুর দিকে ছিল না, তাই সে দেখিতে পাইল না। সকালের আলোয় ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল—তোমাকে প্রণাম—তোমাকে প্রণাম। সমবয়সীদের কোলে সন্তান দেখিয়া কতদিন এ সাধ তাহার হইত; সে সাধ তুমি মিটাইয়া দিলে!

তারপর সে সেই গাছতলাতেই সূতিকাগৃহ রচনা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজের কাপড় ছিল মাত্র তিনখানা। একখানা পরনে, একখানা গাছের ডালে শুকাইতে দিয়াছিল, একখানা ছিল পোঁটলায়—সেইখানা ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া ছেলেটির বিছানা তৈয়ারী করিল। আটাশ-তিরিশ বৎসরের জীবনে সন্তানের জননী হইবার ভাগ্য তাহার হয় নাই। শিশুকে কোলে লইয়া বিব্রত হইল, কাঁদিলে তাহার দুগ্ধহীন স্তনবৃন্ত তাহার মুখে দিতে গিয়া অস্বস্তিতে যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হইয়া উঠিল, তবু সে সেদিন বুঝিতে পারে নাই। মনে পড়িতেছে—ছেলেটি বেশী কাঁদিলে সে সন্তানবতী সখী কাদু মোল্যানীর দৃষ্টান্ত মনে করিয়া তাহাকে বুকে লইয়া উঠিয়া বাগানময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার গান-সাধা অপরূপ কণ্ঠস্বর গানের বদলে ছড়ায় গুঞ্জন উঠিয়াছিল।

"ও রে আমার ধন ছেলে—পথে পড়ে পড়ে কাঁদছিলে—মা বলে বলে ডাকছিলে—গায়ে ধুলো মাখছিলে।"

ছড়াটা যেন এই শিশুটিকে গাহিয়া শুনাইতে তাহারই জন্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—ইহার পদকর্তা!

"সে যদি তোমার মা হ'ত,
ধুলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত!"

তাহার পরিবর্তে ধূলায় ফেলিয়া দিয়া সে পলাইয়াছে; সে তো তোমার মা নয়! আজ যে তোমাকে ধূলা ঝাড়িয়া কোলে লইয়াছে সে তোমার মা! আমি তোমার মা! আমার সোনা! আমার মানিক! আমার গোপাল!

বাগানের প্রান্তেই বাগ্দীদের গ্রাম। লোকটি তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল—বাগ্দীদের গাঁয়ে—ঘরে-ঘরে গরু ছাগল। সে শিশুকে কোলে লইয়াই গাঁয়ের দিকে চলিল।

একটি মেয়ে আসিতেছিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল দৃষ্টিতে।

—কে গো বাছা ? এমন চেহারা—এই বেশ ?

—আমি বাছা বষ্টুমী !

—বষ্টুমী ? তা—তোমার কাপড়ে-চোপড়ে রক্তের ছোপ !—এ ছাওয়াল—তোমার কোলে ?

ব্রজ থতমত খাইয়া বলিয়াছিল—পথেই এল মা ও কোলে।

সে গালে হাত দিয়া বলিল—ও মা-গো ! পথেই পেসব হয়েছ ?

—হ্যাঁ।

পিছনে তখন আরও কয়জন আসিয়া জমিয়াছিল।

একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—অ !

তাহার দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর বিচিত্র, তাহাতে যত কৌতুক—তত শ্লেষ ! ব্রজর গায়ে লাগিয়াছিল—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল—কেন ? এমন বললে কেন ?

এক বুড়ী দন্তহীন মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল—তা' বলে মা, তা' বলে। ওতে 'আগ' করতে নাই ! ভদ্দনোকের মেয়ে, এমন রূপ তোমার, ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছ, পাপের কাঁটা পেটে নিয়ে—পথেই সে কাঁটা ফুল হয়ে কোলে খসেছে ; তাই বলছে আর কি ! তা বলবে মা, দশ জনে দশ রকম বলবে।

ব্রজ একেবারে থ' হইয়া গিয়াছিল। কথাটা সে ভাবে নাই। অথচ এত সহজ, এত স্বাভাবিক যে ইহার প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। অন্য কেহ যদি আজ এমনি ভাবে এই শিশুটিকে বুকে লইয়া তাহাকে এই কথাগুলি বলিত—তবে সে হয়তো এমন কৌতুক ও শ্লেষ মিশাইয়া 'অ বলিয়া উঠিত না, হয়তো অন্য রকম কিছু বলিত—সান্ত্বনা দিয়া সহানুভূতির কথাই বলিত—কিন্তু অনুমানে কোন পার্থক্য হইত না, ঠিক এই অনুমানই করিত।

শিশুকে কোলে তুলিবার প্রথম ক্ষণ হইতে এ পর্যন্ত তাহার এ কথাটা বারেকের জন্যও মনে হয় নাই। নিষ্পাপ অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত করুণায় তুলিয়া লইয়াছিল—এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনে মনে শুধু পাপের সাজা দিয়াছে ওই লোকটিকে। একবারও ভাবে নাই শিশুর অঙ্গেও পাপের ছাপ লাগিয়া আছে, উহাকে কোলে তুলিলে—সে ছাপ তাহার অঙ্গেও লাগিবে। থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল সে।

একজন হাঁ-হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল—আহা-মা। পড়ে যাবে—পড়ে যাবে !

আর একজন বলিল—লজ্জা কি মা ? ভগবান দিয়েছেন—পেটে এসেছে—কোলে ধরেছ। কি করবে বল ? তোমার চেয়ে—যে তোমার সর্বনাশ করে পথে এমন ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলে—লজ্জা তারই বেশী, পাপ তারই।

একজন বলিল—এই হয় মা ! এ পথের এইই হল নিয়ম। ভুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে পথে বার করবে—তার পর যখন দেখবে ফুল এইবার ফল হল—তখন পেজাপতির মত একদিন ড্যানা মেলে উড়বে। আহা-মা ! তা' যে তুমি অকালে ওকে নষ্ট করনি—এই তোমার পাপের মধ্যে পুণ্যি। বেশ করেছ। ভাল করেছ। ওই তোমার এখন সম্বল হল !

একজন বলিল—আহা-হা মা, কাঁপছ তুমি বস, বস।

যে কথা বলিতেছিল—সে তখনও বলিতেছিল—ওকে যত্ন করে মানুষ কর, ওই দেখবে তোমার অন্ধের নড়ি হবে একদিন।

বুড়ী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল অকস্মাৎ—বলিল—দেখ না মা আমার বরাত ! একটা পা আমার ভেঙে গেল এই বয়সে, আজ হাঁটবার ক্ষমতা নাই। পোড়া অদৃষ্টে এ জন্মে

কাউকে কোলে পাই নাই, আমার আজ দুঃখ দেখ, হাত ধরে আমাকে নিয়ে যায়—এমন কেউ নাই। 'ওজগার' করে খাওয়ায় এমন কেউ নাই। মরব—ভাবছি—সেখান গিয়েও 'পরিত্তান' পাব না, কে দেবে মুখে আগুনের ছেঁকটি—কে দেবে এক গণ্ডুষ জল ?

বোষ্টুমীর চোখ দু'টি যেন আপনা হইতে বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চোখের কোণ হইতে জলের দু'টি ধারা নামিয়া গড়াইতেছিল গাল বাহিয়া। ধীরে ধীরে গড়াইতেছিল, ব্রজ নিজে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিল উষ্ণ জলবিন্দুর গতি। কিন্তু সে তা মুছিল না।

একজন বলিল—কেঁদো না মা! নাও, দুধ নাও। পয়সা তোমার লাগবে না। নোব না আমরা।

ব্রজ অসঙ্কোচে তাহার ঘটিটি পাতিয়া তাহাদের দান দুধটুকু গ্রহণ করিয়াছিল। একটি মেয়ে বলিয়াছিল—দেখে লাগছে বাছা এই তোমার প্রথম, তা বলে দি, একেবারে খাঁটি দুধ—জল মিশিয়ে দিও। নইলে প্যাট খারাপ হবে।

ব্রজ বাগ্দীপাড়া হইতে ফিরিল অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ মন লইয়া। মেয়েগুলি যে কলঙ্কের নিকষ কালো কালি সহস্র ধারায় তাহার মাথায় ঢালিয়া দিল—সে কালি যেন জন্মাষ্টমীর উৎসবের উজ্জ্বল প্রসন্ন হলুদ রঙের মাধুরী লইয়া তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। যে কলঙ্কের কথা শুনিয়া সে প্রথমটা শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সে কলঙ্ককে তার কলঙ্ক বলিয়া আর মনে হইল না। মনে হইল, এইবার সে সত্য সত্যই এই শিশুর মাতৃত্বের অধিকার লাভ করিল, এটুকু মাথায় না লইলে তাহার কোলে এ ছেলে আপন মায়ের কোলের তৃপ্তি কখনই অনুভব করিত না। ক্রমে ভারী মিষ্টি লাগিয়াছিল এ কলঙ্ক; যত ভাবিল—তত বেশী মিষ্ট মনে হইল।

নির্জন আমবাগানের মধ্যে ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইয়া দুই হাতের উপর শোওয়াইয়া নাচাইতে আরম্ভ করিল মনের পুলকের আবেগে। কণ্ঠে গুন-গুন করিয়া উঠিল মহাজন কণ্ঠ মহাশয়ের পদ—

"নেচে নেচে আয় রে নীলমণি
একবার তেমনি-তেমনি-তেমনি ক'রে
চরণে-চরণ দিয়ে—
নেচে-নেচে আয় রে নীলমণি—
যতনে খাওয়াই তোরে ক্ষীর-সর-নবনী।"

পিছন হইতে কে বলিল—আহা, মা, কি সুন্দর গলা তোমার!

চমকিয়া পিছন ফিরিয়া ব্রজ দেখিল—বাগ্দীপাড়ারই সেই মেয়েটি, যাহার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল; সে যে কখন আসিয়াছে ব্রজ তাহা জানিতে পারে নাই। ফাল্গুনের শেষে বাগানটা ঝরাপাতায় ভরিয়া আছে। গতকাল রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে ঝরাপাতার উপর মহেশ মণ্ডলের পায়ের শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল—আজ জাগিয়া বসিয়া থাকিতেও মেয়েটির আসার কথা ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিল না।

মেয়েটি কাছে বসিয়া বলিল—একটুকুন জোরে গাও মা। আহা-হা!

ব্রজ বলিল—খুব ভাল ক'রে গান শোনাব আজ বিকেলে। খঞ্জনী বাজিয়ে।

—খঞ্জনী বাজিয়ে? অ, হ্যাঁ—তুমি যে বষ্টুমী!

—হাঁ আমি যে—আমি বষ্টুমী! ব্রজ হাসিয়াছিল।

মেয়েটি আরও কাছে আসিয়া বসিয়া বলিয়াছিল—আমি মা প্রথম ভেবেছিনু তুমি কোন বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়ে হবে! তা তুমি আমাদের পাড়ায় চল না কেন। আমাদের পাড়াতেই একপাশে খানিক ঠাঁই-ঠিকানা ক'রে দোব, মরদরা আসুক—দণ্ড দু'য়ের মধ্যে বাঁশে-খড়ে চালা তুলে দেবে, খল্‌পা দিয়ে ঘিরে দেবে, আগড় বেঁধে দেবে। তুমি থাকবা আপনার, রাঁধবা বাড়বা—খাবা। খঞ্জনী বাজিয়ে গান ক'রে ভিগ মেগে আনবা, ছেলে থাকবে শুয়ে—আমাদের উঠানে; আমরা দেখব-শুনব—সে বেশ হবে। আমি সেই বলতেই এলাম।

ব্রজ বলিল—যাব। কিন্তু তার আগে—একে একটু দুধ খাইয়ে দেবে ভাই? আমি পারছি না ঠিক। আর একবার যদি ও'কে নিয়ে বস—তবে আমি চান করে আসি।

—চান? সে কি গো? কাঁচা সন্তানের মা তুমি—

—ও! ব্রজ হাসিল। তাহার ভুল হইয়া গেছে। কাঁচা সন্তানের মা ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে মাথায় জল চাপিয়া বিকার হইবে। হাসিয়া ব্রজ বলিল—আমি কাপড় কেচে আসি। চান করব না।

স্নান সে করিল। নদীর জল টলমল করিতেছিল। চৈত্র মাস, নদীর জলে স্রোত তেমন নাই, তার উপর সেটা একটা দহ।

গতকাল সন্ধ্যায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে মাঠে-প্রান্তরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সর্বাঙ্গে ধূলা লাগিয়াছিল, কাপড়খানা হইয়া গিয়াছিল কাদা-মাখা কাপড়ের মত, মাথার চুল এলাইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতেও ধূলা লাগিয়া পিঙ্গল ধূসর চেহারা হইয়াছিল। তাহার উপর অবশিষ্ট রাত্রিটা শ্মশানে কাটাইয়াছে, শেষরাত্রে এই শিশুটিকে লইয়া এক উদ্বেগ—তাহার ধূলি-ধূসরিত ওই চেহারার উপরেও একটা কালো ছায়ার মত ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। নদীর জলে সে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্নান করিয়া ধূলি-মালিন্য-মুক্ত হইয়া উঠিয়া ফিরিতে গিয়া মনে পড়িল শিশুর ক্লেদাক্ত কাপড়ের ফালিগুলির কথা। আপন মনেই হাসিল সে, তার পর সেগুলি কাচিয়া আবার স্নান করিয়া ফিরিল যখন—তখন বাগ্দী মেয়েটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। সে বলিল—ছি মা, এত দেরি করে? আরও হয়তো কিছু সে বলিত কিন্তু ব্রজর সদ্যস্নাত মালিন্য-মুক্ত মূর্তির দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া বলিল—কি রূপ তোমার মা! কিন্তু ছেলে এমন কেন হল? এ যে কালো—।

ব্রজ হাসিয়া বলিল—ও আমার কালো মাণিক!

ধীরে ধীরে তাহার মনে কি যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। রাত্রির শেষপ্রহরে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছিল, অসহনীয় উদ্বেগ; আখড়ায় ব্রজ ফুলগাছের যত্ন করিত, বড় শখ ছিল তার, কুঁড়ি ধরিলে দিনে দশবার দেখিত কতটুকু বাড়িল, কতদিনে কখন ফুটিবে; সে দেখিয়াছে—ফুটিবার সকালটির আগের প্রহরে—ভোরবেলা কুঁড়ির আবরণ ফাটানোর ছবি, সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে—গাছের সে এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা—। তারপর, ফুলটি ফুটিলেই গাছটিকে ওই ফুলটির রূপরসের আনন্দে বিভোর হইয়া হেলিতে দুলিতে দেখিয়াছে। সখীদের সূতিকা-গৃহ সে কখনও দেখে নাই। মনে পড়িল ফুল ফোটার কথা। তাহার মনে যেন ফুল ফুটিয়াছে।

ব্রজ বলিল—চল—তোমাদের ওখানেই যাচ্ছি। কালো মাণিক কোলে নিয়ে—তোমাদের উঠানে গিয়ে বসব।

* * * * *

ভাল করিয়া সে আজ সাজিল। তিলক কাটিতে বসিয়া সাজিতে সাধ হইল।

পথে বাহির হইয়া অবধি সাজে নাই সে। যত্ন করিয়া তিলক কাটিল, রসকলি আঁকিল। স্নান করিয়া চুলের ধুলা ধুইয়া গেছে, ঘন কালো রঙ ফিরিয়াছে, তাহার উপর রুখু স্নান করায় কোঁকড়ানো চুল ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; সামনে কপালের দিকে বাঁকাইয়া চূড়া করিয়া যত্ন করিয়া চুল বাঁধিল। পরিষ্কার শুদ্ধবস্ত্র—কাঁটের কাপড়খানি বাহির করিয়া পড়িল। তারপর শিশুটিকে কোলে করিয়া বাগ্দীদের উঠানে আসিয়া খঞ্জনীতে ঠুং করিয়া একটি মৃদু ধ্বনি তুলিয়া বলিল—হ-রি বোল! গোপালের জয় হোক মা!

মেয়েরা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহারা অবাক হইয়া গেল।

ব্রজ বলিল—তোমাদের গোপাল দুধে-ভাতে থাক, জন্ম সুখে যাবে গোবিন্দ-গোপালের প্রসাদে। আমার গোপালকে নিয়ে তোমাদের আশ্রয়ে এলাম।

ব্রজ দাসী জাঁকাইয়া বসিল। মেয়েরাও তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। চমৎকার দেখাইতেছিল ব্রজদাসীকে। তাহার প্রসন্ন রূপশ্রীর দীপ্তির উপর ক্লান্তির একটি করুণ ছায়া পড়িয়াছে; দিগন্তের আসন্ন অন্ধকারে সে তাহাদের আঙিনায় যেন সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখার অনুজ্জ্বল আলোক-মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

ফাল্গুন মাস। গম যব ছোলা মসুর আলু পেঁয়াজ তুলিবার সময়; পুরুষেরা তখনও মাঠ হইতে ঘরে ফেরে নাই, ব্রজদাসী বলিল—আসুন তোমাদের কর্তারা সব—ফিরুন, তাঁরা কি বলেন দেখি—তারপর গান আরম্ভ করব। কেমন?

মনে মনে সে এরই মধ্যে একটা ঠিক দিয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলার সেই বুড়ী ব্রজর কাছে আসিয়া বসিল। বলিল—কত্তাদের তোয়াক্কা আমি রাখি না। বুয়েচ না মা! কত্তার মাথা আমি 'যোবতী' বয়সে চিবিয়ে খেয়েছি। এক ডর—খানিক—আদেক করি আমাদের বতন মাতব্বরকে; ক্ষেপা-ধেপা মানুষ—মায়ের সাধন ভজন করে, লোকটি ভাল মানতে হয়; বুয়েচ না! তা আবার সময় বুঝে বলেও দিই দুম-দাম ক'রে দশ বিশ কথা। হ্যাঁ! আমি তোমাকে ঠাঁই দোব। তাতে ঝগড়া-ল্যাই করতে হয় তা আমি করব। তুমি মা—গায়েন ধর।—

ব্রজ হাসিয়া গান ধরিল।—

"পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে—
কোন মহাজন পথের দিশা পারো বলিতে?"

মেয়েরা স্তব্ধ হইয়া গেল—এমনটি শুনিবে সে তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। গান থামাইয়া ব্রজ দেখিল পুরুষেরা কখন আসিয়া—মেয়েদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে। দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ব্রজ তাহাদের বাড়ীতেই তাহাদিগে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন গো, বাবারা আসুন!

কাল হইলেও সে বলিত—আসুন গো প্রভুরা! শ্রীদাম সুদাম বসুদামেরা! প্রভুর সখারা সব! বলিয়াই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। আজ তাহার দেহ-মন সব যেন ভাঙিয়া গিয়াছে। সে হাসিল—কিন্তু সে হাসি রেখায় ফুটিল ঠোঁটের উপর—কণ্ঠস্বরে শব্দ-তরঙ্গে জল-ধারার মত ঝরিল না।

পুরুষেরা গানের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাড়া ঢুকিতেই এমন সন্তান কোলে-করা শ্রীসম্পন্ন একটি মা-জননীর মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু

এ দেশে কপালে তিলক গলায় কণ্ঠী পরা বা জটা মাথায় গেরুয়া পরা আগন্তুক এত বেশী বিস্ময় উদ্রেক করে না—যা নাকি সহজাত রসবোধকে ডিঙাইয়া মানুষকে প্রশ্নমুখর করিয়া তোলে। বিস্ময় জন্মিয়াছিল তাদের ব্রজদাসীর শ্রী দেখিয়া, তবুও তাহারা চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল; প্রভুর নাম আর এমন কণ্ঠের গান; তাহার মধ্যে কথা বলিবার মত অরসিক যে, তাহাকে বলে অসুর।

তাহার উপর পাকা ফসলের তৃপ্তিতে তাহারা এমন পরিতৃপ্ত, প্রফুল্ল; হুঁকা টানিতে টানিতে হাসি-রসিকতায় নির্জন পল্লীপথ ভরিয়া তুলিয়া ঘরে আসিয়া এমন মিষ্ট চেহারার মা জননীকে দেখিয়া তাহার এমন গান শুনিয়া তাহাদের প্রফুল্ল মন প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বাগ্দীদের পুরুষেরা তাহাকে বষ্টুমী-মা বলিয়া গ্রহণ করিল এক কথায়।

ব্রজ বলিল—বাবা, খেতে লাগবে না, পরতে লাগবে না, গৃহস্থের দোরে-দোরে আমার জায়গীর জমিদারি প্রভু আমায় দিয়ে রেখেছেন, লাগলে এক মুঠোর বেশী দু'মুঠো লাগবে না। লাগবে বাবা—একটু আগল বাঁধ, আপনাদের পাড়ার এক পাশে একটি চালা বাঁধব, একটু দেখবেন বাবারা। যেন দুষ্টু লোকে অপমান না করে, চোরে-ডাকাতে মেরে-ধ'রে কেড়ে-কুড়ে না নেয়,—আর বাবা সাপ-খোপ—জন্তু-জানোয়ার। বেশী দিন নয় বাবা, অল্প কিছু দিন। আমার এই অঙ্কুরটি একটু বড় হবার অপেক্ষা—একটু ডাঁটো হোক—দুটো ডালপালা মেলুক—চলে যাব ওর হাত ধরে।

বাগ্দীরা বলিয়াছিল, দেখুন, দেখুন দেখি মা-লক্ষ্মী? থাকবেন আমাদের পাড়ায়—সে তো আমাদের ভাগ্যি গো! যাবেনই বা কেনে? এইখানেই বেঁধে দেব আপনার আখড়া, বোশেখেই আরম্ভ করে দোব ঘর, চারিদিকে লাগিয়ে দেব গাছপালার বেড়া—আপনি থাকবেন, সন্ধ্যেয় আপনার মুখে প্রভুর নাম শুনব। আপনার গোপাল বড় হবেন, বাবাজী হবেন—উনিও থাকবেন এইখানে, আমাদের ছেলেরা থাকবে, আখড়ার সেবা তারাও করবে।

বষ্টুমী বলিয়াছিল—না বাবা। আমাকে যেতেই হবে, প্রভুর ধামে যাব বলে বেরিয়েছিলাম, পথে গোপাল এল কোলে। গোপালকে নিয়েই যাব শ্রীধামে। সেখান ছাড়া আর কোথাও ওকে রেখে আমি শান্তি পাব না। আমি ছাড়া ওর তো কেউ নাই, এক আছেন তিনি, তাঁর কাছেই রেখে যাব।

হঠাৎ কে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমনই উচ্চকণ্ঠের বাধা-বন্ধহীন পাগ্‌লা ঝোরার মত সে হাসি যে ব্রজ চমকিয়া উঠিল। কাছেই বসিয়াছিল বাগ্দীবুড়ী, সে ফিস ফিস করিয়া বলিল—রতন ক্ষ্যাপা—পাড়ার মাতব্বর!

একজন প্রৌঢ় আসিয়া ব্রজর সামনে বসিল। ঝাঁকড়া পাকা চুল, পাকা-দাড়ি পাকা-গোঁফ শক্ত-সমর্থ মানুষ—যেন অনেক পুরানো কালের শ্যাওলা পড়া খস্‌খসে একখানা অক্ষয় পাথর; সে যেন এখানকার এই নরম মাটি সবুজ ঘাসের দেশের নয়—কোন পাথুরে অঞ্চলে পাহাড় খসিয়া গড়াইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সামনে বসিয়া সে নিজেই বলিল—আমি ক্ষ্যাপা, মা। 'এদের পাড়ার মাতব্বর!

ব্রজ বলিল—গোবিন্দ তোমার ভাল করবেন বাবা। কিন্তু আপনি এমন করে হাসলেন কেন?

—তোমার কথা শুনে হাসলাম মা। তবে এমন করে হাসলাম—ক্ষ্যাপা বলে, আমার

অমনিই হাসি। আমি ক্ষ্যাপা—দু'তিনবার ক্ষেপেছি মা।

—আমাকে ঠাঁই দেবেন না আপনি?

—তারা তারা বল মন। সেজন্যে নয় মা। ঠাঁই তো পাড়ার লোকে দিয়েছে গো।

—তবে?

—তোমার কথা শুনলাম—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম—একটা বাছুর চেঁচাচ্ছে—হাম্বা-হাম্বা-হাম্বা। এই দুটো এক হয়ে গেল। আর হাসি এল। তুমি বললে তুমি ছাড়া ওর কেউ নাই; তার মানে ও নিজেও নাই, শুধু তুমিই আছ। গরুর বাছুরটা বললে—হাম্-বা। মানে হাম-হায়। তোমার বাচ্চাও হাম্-বা বলে ডাকবে গো। এই বোল ফুটতে দাও। দুনিয়ার বোলই হ'ল হাম্-বা।

ব্রজ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি কি বলছেন বাবা?

পাশ হইতে বুড়ী বলিল—গাও গাও তুমি। ওর মাথার ঠিক নাই। তার ওপর গাঁজা খায়।

বুড়া হা-হা করিয়া হাসিয়া পাগলের মতই বলিয়া উঠিল—হাম্-বা, হাম্-বা গরু মা—আমি গরু তুমি গরু ওই বুড়ী গরু—তোমার ওই কোলের বাচ্চা—ওটা কৈনে বাছুর।

ব্রজ মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাবা। আমরা প্রভুর চরণের রজ। এ দেহ তাঁর, এ রূপ তাঁর—এ কণ্ঠ তাঁর—আমাদের প্রাণ যে তিনি। আমাদের তো আমি নাই—আমির সাধ আমার মিটেছে—সে মরেছে বাবা, আমাদের সব—তুমি। সেই শেখাবার জন্যেই তো, একটু বড় হলেই ওর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব পথে; ওকে বুঝিয়ে দোব দেখিয়ে দোব, চিনিয়ে দোব আমির মেকি—তুমির আসল দাম! ওর যে বড় দুর্ভাগ্য বাবা, নইলে ওর মুক্তি কিসে হবে বল!

বুড়া তাহার রাঙা চোখ দুটা বড় বড় করিয়া বলিল—ওরে বেটী—ওরে বেটী। ওরে আমার হারামজাদী; এ্যাঁ—এত কথা—এসব বুলি ফুটল কি ক'রে তোর মুখে? ওমা—তোর সঙ্গে আমার মিলবে ভাল! কিন্তু গাঁজা খাস মা? না খেলে তো জমবে না?

ধমক দিয়া উঠিল বুড়ী—এই দেখ—এই দেখ—ক্ষ্যাপামি আরম্ভ করলে দেখ! গাঁজা খাবে কি? কি আবোল-তাবোল বকছ? যাও সব চান করে এস, খেয়ে নাও। বষ্টুমী গান শোনাবে।

—কালী কালী—তারা তারা—হরি হরি বল মন। তাই বটে। ক্ষ্যাপার মন বৃন্দাবন, এমন মধুর নাম ছেড়ে বকে যাচ্ছে আবোল তাবোল। হাম্-বা মা এ হ'ল ওই হাম্-বা। তোমার কাছে শিখব মা, এই হাম্বা বুলি ছাড়ব। তোমাকে ছাড়ব না। ঠিক বলেছ—হাম্-বা ঘুচলেই তুঁহু-তুঁহু রব ওঠে। গরু মরে—তার হাম্-বা বুলি ঠাণ্ডা হয়—তখন তার আঁত থেকে—ধুনুরীরা ধুনুচি করে তুলো ধোনে—তখন তাতে বুলি ওঠে তুঁহু-তুঁহু তুঁহু-তুঁহু। তুই আমার ধুনুচি মা! কালই তোর আখড়া আমি বানিয়ে দোব। ক্ষ্যাপা রতন সব পারে মা!

পুরুষেরা গেল স্নানাহার সারিতে, মেয়েরা উঠিল সন্ধ্যা জ্বালিতে—পুরুষদের ভাত দিতে। ব্রজ একা বসিয়া রহিল, পর্ব-পার্বণের গোবর নিকানো আঙিনার মাঝখানে আঁকা শুভ্র আল্পনা-খানির মত। মন তাহার অজস্র ফোটাফুলে ভরা সন্ধ্যামণি গাছটির মত প্রসন্ন—কত কল্পনা মৌমাছির মত উড়িয়া উড়িয়া গুঞ্জনে গুঞ্জনে মুখর করিয়া তুলিল তাহার চিত্তকে।

একটি আখড়া গড়িবে; প্রশস্ত আঙিনা রাখিবে, পরিপাটি করিয়া নিকাইয়া রাখিবে, যেন

এতটুকু ধূলা না থাকে, একটি ইট-পাথরের কুচি উঠিয়া না থাকে। দামাল ছেলে উঠানময় হামা দিয়া ঘুরিবে, গায়ে যেন ধূলা না থাকে, হাঁটুতে যেন ইট-পাথরের কুচিতে ক্ষত না হয়। ঘরের দাওয়াগুলি হইবে নিচু নিচু, পড়িয়া গেলে যেন কাটিয়া-কুটিয়া না যায়। বেড়ার গাছের মধ্যে বিশল্যকরণী ও ঈশের মূলের গাছ পুঁতিয়া ফুল জল দিবে,—যেন সাপ না আসে। এখন হইবে একখানি ঘর, তারপর একখানি ছোট উঁচু দেবতার ঘর, প্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, সে না হইলে তো বৈষ্ণবের আখড়া হয় না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। যুগল বিগ্রহ মনে পড়িল তার। মনে পড়িল তার বিগত জীবনের স্মৃতি। প্রেমের দেবতাকে যুগলরূপে সম্মুখে রাখিয়া কত খেলাই খেলিয়াছে। দোলে আবীরে-কুমকুমে গাঢ় লাল রঙে—ফুলের মালায় রাধাশ্যামের পূজা করিয়া সেই প্রসাদ লইয়া প্রেমাস্পদের সঙ্গে কত মাতামাতি! সে বাজাইত খোল—নিজে করতাল বাজাইয়া গাহিত গান। ঝুলনে যুগল দেবতাকে ঝুলনায় চাপাইয়া দু'জনে দাঁড়াইত দুই দিকে, ওদিক হইতে সে ঝুলনা ঠেলিত—এদিক হইতে ঠেলা দিত নিজে বষ্টুমী। গুন-গুন করিয়া সে গান গাহিত। "অপরূপ ঝুলন—নানা ফুল শোভন—তা' পর, কিশোরী-কিশোর।"

রাস-পূর্ণিমার রাত্রি মনে পড়িল। সে কি জ্যোৎস্না আকাশে! দুটি-চারিটি নক্ষত্র মাত্র ফুটিয়া থাকিত, এ ছাড়া আকাশে শুধু চাঁদ। আকাশটাকে দেখিয়া মনে হইত, নীল আকাশটা যেন ঘামিতেছে—গলিতেছে। আখড়ার আঙিনায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া মাটির উপর রূপার টুকরার মত পড়িয়া থাকিত।

ভাবিতে ভাবিতে চোখে জল আসিল। টপ্-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল ছেলেটির উপর। ছেলেটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবীর চমক ভাঙিল তাহার সে চঞ্চলতায়। দোলা দিয়া একটি হাত তাহার বুকে রাখিয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সে ঘাড় নাড়িল—না।

না। দেবতা নহিলে ঘর নয় এ কথা সত্য, তবু যুগল বিগ্রহ আর সে স্থাপন করিবে না। এ সব পর্ব-পার্বণ পালন করিতে গিয়া সে আর কাঁদিতে পারিবে না। সে এবার মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা করিবে।

—"আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম!
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ!"

সেদিন গানও সে ধরিল—ওই গান।

গানে গানে সন্ধ্যাটিকে সে মহোৎসব-সন্ধ্যা করিয়া তুলিল।

উৎসবের আনন্দে শুধু হাসি, এদেশের মানুষেরা বলে—মহোৎসবের আনন্দে হাসি নয়—কান্না; যে কান্নার বিলাপ নাই—শুধু চোখের জল ঝরে, সেই কান্না। এ দেশের মানুষ এ কান্না কাঁদিতে জানে—কাঁদিতে ভালবাসে। তাহারা ঘন ঘন চোখের জল মুছিতেছিল।

হঠাৎ গানের একটি অল্প বিরতির মধ্যে কে যেন বলিল—কি রে রতন দাদা, এ যে তোরা গানে গানে নদে ভাসিয়ে দিলি! আহা-হা এমন গান তো বড় একটা শুনতে পাই না ভাই!

ব্রজ চোখ তুলিল।

কলরব করিয়া গানের ব্যাঘাত করিবার প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, কিন্তু মজলিসের সকলেই স্বল্প চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাপা-গলায় মাতব্বর বুড়া নিঃশব্দে এক-গাল হাসিয়া বলিল—মণ্ডল ভাইটি।

মণ্ডল বষ্টুমীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া মাতব্বর বুড়াকে হাত-ইশারায় চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। বষ্টুমী তাহাকে দেখিয়াই চিনিল। সে শিহরিয়া উঠিল।

পরমুহূর্তটি ছিল পুনরায় গান ধরিবার মুহূর্ত। সে গান ধরিয়া গানখানি কোন্ রকমে শেষ করিয়া খঞ্জনী রাখিয়া বলিল—আর পারছি না বাবা। আজ থাক।

লোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল—আমিই কি এসে অপরাধ করলাম—মা-জী?

ক্ষ্যাপা রতন বলিল—হে-ই মা! ওরে আমার মা-মণি, আর একখানি। ভাইটি আমার এল,—আর এমন মধুর নাম থামিয়ে দেবে তুমি—তা হ'লে আমার খেদ থাকবে মা। ভাইটি আমার ভক্ত রসিক। ও-ও পাগল মা। আর একখানি। নইলে আমি পায়ে ধরব।

অপ্রসন্ন চিত্তেই এবার ব্রজদাসী গান ধরিল।

* * * *

লোকটি এ-অঞ্চলে সম্মানিত ব্যক্তি তাহাতে বৈষ্ণবীর সন্দেহ রহিল না। শুধু সম্মানিতই নয়, মানুষটির সঙ্গে এই সব পাড়ার লোকের একটি হৃদ্য অন্তরঙ্গতাও আছে। সম্ভ্রমভরে তাহাকে তাহারা মোড়া দিল বসিবার জন্য। লোকটি বলিল—না। মোড়া সরাইয়া দিয়া বলিল—একখানা নতুন চ্যাটাই থাকে তো দে। প্রভুর নাম হচ্ছে—যিনি গাইছেন, তিনি মাটিতে বসে—আমি ওপরে বসব কি রে? আক্কেল আর তোদের হবে কবে!

ব্রজদাসী লোকটির কথা গানের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছিল। কাল সে বলিয়া গিয়াছিল আজ আসিবে। ব্রজ কথা দিয়াছিল—তাহার জন্য সে অপেক্ষা করিবে। সে ছিল একটা সঙ্গীন আবেগময় মুহূর্ত। আজ ব্রজর চিত্ত তাহাকে দেখিবামাত্র কিরূপ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা বলিতে আসিয়াছে—সে তো ভাল করিয়াই জানে, অক্ষরে অক্ষরে জানে।

কাল গাছের ফাঁস লাগানো দড়ি সত্য সত্যই বাঁধা দেখিয়া মানুষটির প্রতি করুণা তাহার হইয়াছিল। আজ আর কোন মমতা নাই।

লোকটার অবস্থা ভাল, নিজের মুখেই সে বলিয়াছে কাল। আজ কিছু টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিবে—এই ক'টি তোমায় নিতে হবে। না বললে আমি শুনব না। তোমাকে দিচ্ছি না, এ ওই ছেলেটার জন্যে। এ তোমাকে নিতেই হবে। তুমি ওর ভার নিলে, মরণের মুখ থেকে রক্ষা করলে, আমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে—এর দাম টাকায় হয় না, মানুষ দিতে পারে না, সে যা দেবার—যে দেবার—সেই দেবে—তোমার জীবন ভ'রে দেবে, গাছকে যেমন ফুলে ভ'রে দেয়, নদীকে যেমন জলে ভ'রে দেয়, দিনকে যেমন আলোয় ভ'রে দেয়, তেমনি ক'রে দেবে। এ টাকা ক'টা—ওর জন্যে খরচ করো, যদি কখনও অসুখ-বিসুখ করে—কখনও কোন বিপদ-আপদ হয়—কখনও যদি অনবুঝের মত কোন দামী কিছুর জন্য ঝোঁক ধরে—তবে এই থেকে খরচ করো।

* * *

ব্রজদাসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—প্রভু, সমস্ত দিন ধ'রে মনের মধ্যে একটি বীজকে জল দিয়ে দিয়ে তা থেকে একটি অঙ্কুর বের করেছিলাম। তাতে পাতা মেলবে—ডাল মেলবে—ফুল ধরবে, ফল ধরবে—এই সাধের নেশা পেয়ে বসেছিল আমাকে। ওই লোকটিকে দেখে আমার সে নেশা ছুটে গেল; ও যেন এসে পড়ল এক ঝলক আগুনের মতন—ওর আঁচে বীজটির তাজা অঙ্কুর 'সামনে' নেতিয়ে পড়ল।

আক্ষেপ করিয়া উঠিল ব্রজদাসী—আঃ! ওই সুমতি যদি তখন হ'ত আমার! ওই মজলিসে সকলের সামনে ছেলেটাকে ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলতাম—নাও, তোমার পাপের ফল তুমি নাও, তুমি বয়ে মর, আমি কেন বইব—কেন মিথ্যে-কলঙ্কের পসরা মাথায়

নিয়ে, সাধের বাঁধনে বাঁধা পড়ব ? কিন্তু—!

হতাশায় বষ্টুমী বার বার মাথা নাড়িয়া বলিল—আমি যে তখন বাঁধা পড়েছি ; আমার সর্বনাশ তখন হয়ে গিয়েছে। নইলে—লোকটিকে দেখে ওই টাকা দিতে এসেছে অনুমান ক'রে আমার সমস্ত বুকটা ধড়ফড় ক'রে উঠল, মনে হ'ল—টাকা দেওয়ার মানে হ'ল—ওই ছেলে মানুষ ক'রে দেওয়ার দাম-মেটানো। যে দিন খুশী ছেলেকে বলবে—আমার ছেলে তুই বাবা, তোর মা মরে গিয়েছিল—বষ্টুমী তোকে মানুষ করেছে টাকা নিয়ে।

ওকে কথা বলতে দোব না ঠিক ক'রে, আর গাইতে পারব না বলে—আমি আর থামলামই না। দেড় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত গানই গেয়ে গেলাম। ভাবলাম—ভিন গাঁয়ের মানুষ রাত্রি দেখে কথা না বলেই উঠে যাবে। কিন্তু—।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ব্রজ। ব্রজর চোখের উপর ভাসিতেছে—চ্যাটাইয়ের উপর লোকটি অচঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

* * *

অচঞ্চল মহেশ মণ্ডল।

মাথার উপর কৃষ্ণাদ্বাদশীর নীলাভ অন্ধকার আকাশ, কোটি কোটি নক্ষত্র। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পাখী পাখা ঝাড়িয়া—ডাক দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মজলিসে ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অনেকে ঘুমে ঢুলিতেছে ; বাগ্দী মাতব্বর ভাম হইয়া বসিয়া আছে, বুড়ী বলিল—এইবার থাম মা। নাম রাখ এইখানে। সব ঢুলছে। তার ওপর মা—তোমার শরীল আছে মা। কাঁচা সন্তানের মা,—ঠাণ্ডা লাগবে—হয়তো লেগেছে।

মাতব্বর পাগল রতন—অকস্মাৎ সজাগ হইয়া উঠিল কথাটা শুনিয়া—আ—হা—হা! সাধে কি বলে গাঁজা বড় পাজী নেশা! কথাটা খেয়ালই হয় নাই আমার। কিন্তু তোমার নিজের তো স্মরণ করা উচিত ছিল মা! আর বুড়ী—আর রমনের মা—তোরা ? তোরা তো নেশা করিস নাই! ছি—ছি—ছি! ওঠ মা—ওঠ! ওরে মা জমুনীকে একটা বড় বাটীতে করে দুধ দে! ভরতি করে দিবি। বুকে দুধ আসা চাই।

লোকটি তবু উঠিল না।

ব্রজদাসীর চোখ দুটি ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে আক্রোশভরে মাতব্বরের কথার উত্তর দিবার ছল করিয়া বলিল—আমি তোমাদের ঘরের লোক হয়ে গিয়েছি বাবা, আমার জন্যে ভেবো না, ব্যস্ত কেন হচ্ছ—আমি চেয়ে খাব। আগে অতিথি বিদায় কর বাবা। এই এঁকে! মনে হচ্ছে—ইনি যেন তোমাদের এখানকার মহৎ লোক, বড় লোক, অনেক খাতির—অনেক টাকা!

মণ্ডল খোঁচাটা হজম করিল। নীরব হইয়া রহিল।

বাগ্দী মাতব্বর বলিয়া উঠিল—তা মা, আপনি ঠিক ধরেছেন। মণ্ডল ভাইটি আমার এ অঞ্চলের পবিত্র মানুষ, মহৎ মানুষ! ভর্তি জোয়ান বয়সে ভাইটির আমার ঘর ভেঙে গেল—মোল্যান বউমা সিঁথির সিঁদুর নিয়ে চলে গেলেন—ভাইটি আমার আর সংসার করলেন না। মাছ ছাড়লেন—খান পরলেন—বামুন ঘরের বিধবার মত আচরণ ওঁর। দেশের গরীবদের ধান দেন বর্ষায়, শকতি ছাড়া বাড়ি নেন না।

—তা ছাড়া—আরও—

সে আর কিছু হয়তো বলিত, কিন্তু বৈষ্ণবী আর থাকিতে পারিল না, বলিল—একটা কথা বলব আমি ? কিছু মনে করবে না তো বাবা ? মণ্ডল মশায় যেন রাগ করবেন না।

আমি যা বুঝি—তা বলছি। বাইরে দেখে মানুষের ভিতরটা বুঝা যায় না। আমি তো বাবা—সারা জীবন ঠকেই এলাম। এই দেখ না বাবা, আমাকেই দেখ। বষ্টোমের মেয়ে—গৃহী-গেরস্থ নই—। মা-বাপ ছিলেন—গেরস্থ গৃহী। আমি প্রভুর সেবায় প্রেমের গুরু হিসাবে আখড়ার মহান্তের সঙ্গে মালাচন্দন করেছিলাম। প্রভু আমাকে রূপ দিয়েছিলেন—আমাকে দেখেই তোমরা বাবা আহা-আহা-বলে কত মায়া করলে—গান শুনে গলে গেলে—কিন্তু একবার ভাবলে না বাবা প্রভুর সেবায় দেহ মন যে সঁপে' দিলে—তার কোলে এই শিশু কেন? এল কি ক'রে?

সমস্ত মজলিসটা এক মুহূর্তে ওই শেষের দুটি প্রশ্নে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কথাটা সত্যই কাহারও মনে হয় নাই। নহিলে প্রশ্ন করিবার কথাই তো। বৈষ্ণবীর ওই কোমল মধুর রূপ তাহাদের চোখে পড়িবামাত্র তাহারা অন্তরের মমতা বিনা প্রশ্নে ঢালিয়া দিয়াছে অন্তর উজাড় করিয়া। সদ্য উদ্গত বিবর্ণ অঙ্কুরের দল দু'টির উপর সূর্যের দৃষ্টি পড়িবামাত্র, বিষবৃক্ষের অঙ্কুর—না অমৃত পুষ্পের অঙ্কুর বিচার না করিয়াই তাহার উপর ঢালিয়া দেয় সবুজ লাবণ্যের রসধারা—তেমনি করিয়াই ঢালিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ মেয়েটিই বা কেমন মেয়ে যে, সকলের চোখে চোখ রাখিয়া এমন উঁচু গলায় সেই কথা বলে? সকলে হতবাক্ হইয়া বষ্টুমীর দিকে চাহিয়া রহিল। মণ্ডল বসিয়া রহিল মাথা হেঁট করিয়া। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ বাগ্দী মাতব্বর ওই রতন। সে নিজের কথা শেষ করিয়া সদ্য ছোট তামাকের কল্কে হাতে করিয়াছিল, বষ্টুমী কথা বলিতে বলিতে একটা টানও দিয়াছিল, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধোঁয়া চাপিয়া সে বাকী কথাগুলি শুনিল; লোকে যখন হতবাক্ হইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া ছিল তখন সে ধোঁয়াটা ছাড়িল, তারপর বলিল—ওরে বেটী কথাটার জবাব আমি দিই। তোমার কোলে ছেলে দেখে আমরা ও-সব ভাবতে যাব কেন মা? যে গাছে ফুল হয় মা—সেই গাছেই ফল হয়। আবার এমন ফুলও আছে মা—যার ফুলের মধ্যেই থাকে তার বীজ। দেবতার পূজার জন্যেই যে ফুল গাছ লাগালাম মা—তাতে কোন ফুল যদি তুলতে ছুট হয়ে ফলই হয় মা—তবে কি তা গাছের পাপ? না সেই জন্যে কি সে গাছের গোড়ায় জল দেবে না মানুষ? বেশ ত মা, ফুলে পুজো না হয়ে থাকে—ফলে পুজো হবে ঠাকুরের।—শেষে শুধু মণ্ডলের দিকে চাহিয়া সে বলিল—কি বল গো মণ্ডল ভাইটি?

মণ্ডল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তোর কথা আলাদা রতন দাদা, তুই হলি রতন পাগল। কিন্তু সংসার তো তোর চোখ পায় নাই,—তোর মনও পায় নাই। উনি সেই দিক দিয়ে ঠিক বলেছেন। সংসারের মানুষের ভেকই সর্বস্ব। বাইরে দেখে চেনা তাকে যায় না। এই পাঁচজনে আমাকে ভালো লোক বলে। কিন্তু আমি তো জানি, লোককে আমি কত ঠকিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মণ্ডল বৈষ্ণবীকেই বলিল—মানুষের ভাগ্য বড় খারাপ। ভাগ্যই বই কি, তা ছাড়া আর কি? ভগবানকে পাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ হুঁচোট খেয়ে কি পা পিছলে যখন আছড়ে পড়ে, তখনকার কথা একবার ভেবে দেখুন দেখি! স্নান করে শুদ্ধ হয়ে কপালে তিলক এঁকে পুজোর থালা নিয়ে যেতে গিয়ে পড়ল পা পিছলে পথের পাঁকে—সর্বাঙ্গে লাগল কাদা,—লোকে হো-হো ক'রে হাসলে—

বাধা দিয়া রতন মাতব্বর বলিল, ওরে ভাই, এইখানেই তোর হার হ'ল। কাদা মেখে যেদিন পুজো করতে যেতে পারবি—সেদিন আর পথে পড়ে গিয়েও ঘরে ফিরতে হবে না কাপড় ছাড়তে চান করতে। পড়বি—উঠবি—আবার পড়বি—আবার উঠবি—পথ চলবি। ওই

মায়ের দিকে চেয়ে দেখ—যা বললেন নিজের মুখে—তাই যদি মানি—ও যদি হয় কাদার তাল —পাপের ছাপ—তাই কেমন কোলে নিয়ে বসেছেন দেখ। কেমন হাসিমুখে উঁচু গলায় বললেন মনে কর। ওঁর পথ আটকায় কে? মা তুমি পাবে—পাবে।

অবাক্ বিস্ময়ে বষ্টুমী বাগ্দী মাতব্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—কে বাবা, তুমি তো সহজ মানুষ নও।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল মাতব্বর। বলিল—পাগ্‌লা মা। রতন পাগ্‌লা আমি। বার দুয়েক ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম তা—। বুড়া আঙুল দু'টি নাড়িয়া বলিল—খটো খটো লবডঙ্কা! একবার ঐ বাগ্দিনীর মুখ মনে পড়ে ফিরে এলাম—আর একবার ফিরলাম—রমনের মায়ায়। এখন আবার রম্‌নার দুটো বেটা হয়েছে। ক'ষে কোদাল চালাচ্ছি মা। ঠিক করেছি—ওই ছোঁড়া দুটোকেই ভজে শেষ পর্যন্ত দেখব।

আবার প্রাণখোলা হা-হা হাসিয়া বুড়া গড়াইয়া পড়িল।

মণ্ডল বলিল—এতক্ষণে যেন খানিকটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল সে, বলিল—রতন দাদা, হাসিস পরে। এখন একটা কাজের কথা বলি শোন। শরীরটা যেন খারাপ হয়ে পড়ল মনে হচ্ছে।

বুড়া হাত বাড়াইয়া দিল, বলিল—দেখি, নাড়ীটা দেখি।

মণ্ডল বলিল—থাক, নিদেনের দিন আসে নাই—হাত তোকে দেখতে হবে না। এক কাজ কর, বাড়ীতে আমার কাউকে পাঠিয়ে দে। খবর দিয়ে আসুক, আজ আর আমি ফিরব না।

—তার লেগে আর ভাবনা কি? ভাবনা—। বুড়া ভাবনায় যেন নিমগ্ন হইয়া গেল এক মুহূর্তে। বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল বষ্টুমীর ঠোঁটে।

সে বেশ বুঝিয়াছে—মণ্ডল তাহার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। আরও বুঝিয়াছে যে, সে তাহার পাপের দাম দিতে আসিয়াছে। সে বলিল—তাই তো শরীর খারাপ হ'ল আপনার—আর আপনার মত মানুষ সুখের শরীর নিয়ে—এখানে এই—

—সে ওর অভ্যেস আছে মা। কত দিন ভাইটি আমার নদীর চরে সারারাত ঘুরে বেড়ান। বাগ্দী বুড়া বলিল—শরীর ওর খারাপ নয় মা—মন ওর খিঁচড়ে গিয়েছে। আজ ও সারারাত নদীর গর্ভে বসে থাকবে। হাসিয়া বলিল—ও জানে, কেউ জানে না,—কেউ দেখে না—কিন্তু ক্ষ্যাপার মন বৃন্দাবন, কখন যে বাঁশী বাজবে সেখানে, তার তো ঠিক নাই। রতন পাগল রাত-দুপুরে কত দিন দেখেছে, ভাইটি আমার আকাশপানে চেয়ে আছে। কাছে যাই না, ভাইটি চমকাবে বলে, তবে বুঝতে পারি চোখে জল গড়াচ্ছে। নদীর গর্ভে যে কাটাতে পারে সারাটা রাত, সে আর একটা রাত আমাদের পাড়ায় কাটাতে পারবে না? এই ঘরে বিছানা করব তোমার, পিঁড়েতে থাকবে ভাইটি, উঠোনে থাকব আমরা সবাই। বাস, এক রাত্তির তো! তার ওপর মানুষের দেহ। শুলো—না ঘুমলো; ঘুমলো—না মরলো।

আবার সেই হা-হা করিয়া হাসি।

* * *

রতন বুড়া সহজ মানুষ নয়।

লোকে পাগল বলে, কিন্তু ব্রজদাসী আন্দাজ করিয়াছিল ঠিক। পাগলের মধ্যে বস্তু আছে। সে ঠিক আন্দাজ করিয়াছিল। আন্দাজ করিয়াছিল—মণ্ডল ভাইটির কথা আছে বষ্টুমী মায়ের সঙ্গে।

সেদিন গভীর রাত্রে উঠিয়া বসিয়া সে-ই বলিয়াছিল, ভাইটি! মা জহুনী গো!

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিয়াছিল—শুনছ আমার কথা? তোমাদের কথা যা আছে, সেরে লাও। ঘুমিয়েছে—সবাই ঘুমিয়েছে। আমি জানি, আমি বুঝেছি, তোমাদের কথা আছে। বল তো না হয়, আমি খানিক ঘুরে আসি চাঁদের আলোয়! সত্যই বুড়া চলিয়া গেল।

বৈষ্ণবীর ক্রোধের আর সীমা ছিল না। ক্রোধ হইয়াছিল লোকটির উপর। সে নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—কি তোমার কথা শুনি?

মণ্ডল বলিল,—এইটি নিতে হবে তোমাকে।

কাগজের একটি বাণ্ডিল সে বাহির করিল। বলিল—আমার বোঝা তুমি নিজের ঘাড়ে নিলে, আমার অঙ্গের কালি নিজের অঙ্গে মেখে কলঙ্কিনী সাজলে তুমি। তার জন্যে আমি দিচ্ছি না। ওর জন্যে তোমার মত মানুষকে যে দাম দিতে যায়, তার মত মূর্খ নাই। আমি দিচ্ছি ওর জন্যে; ওই হতভাগা—ওর জন্যে তো দরকার হবে—

—না, তুমি নিয়ে যাও। নিয়ে যাও তোমার পাপের বোঝা!

বলিয়াই বষ্টুমী ঘরে ঢুকিয়া মুহূর্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বিছানায় শুইয়া এতক্ষণে সে অস্থির হইয়া উঠিল। রাত্রে শিশুটা পাশে শুইয়া কিলবিল করিতেছে, তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে; মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে, এ কিন্তু ক্ষুধার সুধা তাহার নাই, তাহাকে দুধে-ভিজানো ন্যাকড়ার শলিতা মুখে দিয়া শান্ত করিতে হইতেছে। হঠাৎ এই মুহূর্তে মনে হইল—এ যে চরম দুর্ভোগ বলিয়া মনে হইতেছে! এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এই দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে, হিসাব করিতে গিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। আতঙ্কে অভিভূত হইয়া গেল। চোখে জল আসিল। মনে মনে বার বার বলিল, এ আমি কি করলাম! গোবিন্দ এ আমাকে কোন্ জালে জড়ালে!

বাহির হইতে বাগ্দী বুড়া ডাকিল, মা জহুনী!

সে সাড়া দিল না।

বুড়া আবার বলিল—মোড়ল কি চলে গেল মা?

শুইয়াই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার বলিল—কে চলে গেল?

—মোড়ল ভাইটি!

—তা তো জানি না।

—চলে গিয়েছে। চাদর লাঠি কিছুই নাই। ও-ও এক ক্ষ্যাপা মা।

বৈষ্ণবী বাহিরে আসিয়া বলিল—সাধের ক্ষ্যাপা বাবা!

বুড়া হাসিল। ও কথাটা বাদ দিয়া বলিল—কথা হয়ে গেল!

বৈষ্ণবী এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইল—তার পর বলিল—ওর সঙ্গে কথা আমার ছিল না বাবা। কিন্তু তোমাকে আমি গোটাকতক কথা বলব—না বলে আমি আর পারছি না।

—বল মা। না—এখানে নয়। এরা সব উশখুশ করছে। ঘুম পাতলা হয়েছে। মনে হচ্ছে, উঠবে এবার। চল, আমার মায়ের থানে চল।

—মায়ের থান?

—আমার এক মা আছেন মা। পাথুরে মা। বলেছিলাম না—বার-দুয়েক ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম,—ক্ষ্যাপামি চেপেছিল ঘাড়ে। সেই ক্ষ্যাপামির ও একটা বোঝা। শেষবার ছিলাম বামা ক্ষ্যাপা বাবার তারাপীঠে। মায়ের থানে পেসাদ পেতাম আর বামা বাবার কাছে

বসে থাকতাম। বাবা গাল দিতেন, আর বলতেন—ভাগ বেটা! আমি বলতাম—আমাকে মা দাও তবে যাব। শেষে একদিন নিজের মনই ঘর-সংসারের জন্ম কাঁদল। বললাম বাবা বাবাকে—তাই ভাগলাম আমি। নিজে আগুলে রাখলে মা-কে, আমাকে দিলে না—সে তোমার ধর্ম তোমার ঠাঁই। আমার ভাগের জন্তে আমিও নালিশ করব তোমার নামে। বাবা বললে,—ওরে হারামজাদা বেটা, নালিশ ক'রে তুই আমার নিবি কি? আমি বললাম—দেখবে কি নোব! কিছু না থাকে তোমার—তোমাকেই ক্রোক করব আমি! এমন খাটুনী তোমাকে খাটাব—বুঝবে মজা! বাবার হাতের কাছে ছিল একটা পাথর—বাবা পাথরটা ছুঁড়ে আমাকে মারলে—মাথাটা সরিয়ে না নিলে ফেটে যেত মাথাটা। তার পরে ত্রিশূল নিয়ে মারতে ছুটল। আমি না ওই পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুট দিলাম। বাবা দিয়েছে। ও-ই আমার মায়ের ভাগ। আমবাগানের কোণে বুড়ো শিমুল গাছতলায় মাটির বেদী করে সেইখানে রেখেছি—ফুল-বেল-পাতা-সিঁদুর দিই। দুঃখ হলে বলি। কাঁদি। সুখ হ'লেও গিয়ে বলে আসি। ওতেই আমার মন সন্তুষ্ট। চল, সেইখানে চল।

গ্রামপ্রান্তের সেই আমবাগানের এক কোণে বাগ্দী বুড়ার মায়ের স্থান। চারিপাশে নিবিড় জঙ্গল; জ্যোৎস্না তখন উঠিয়াছে, সেই আলোয় বৈষ্ণবী দেখিয়া বুঝিল—জঙ্গলটা তৈরী করা জঙ্গল; আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেই দেখিল—গাছগুলির অধিকাংশই বেল, কন্কে, করবী, জবা আর ধুতরার। ভিতরে ঢুকিয়া দশ-বারো হাত পরিমিত একটি পরিচ্ছন্ন স্থান, সম্মুখেই একটা বড় গাছের তলায় একটি মাটির বেদীর চারিপাশে ফুল-বেলপাতার রাশি জমিয়া আছে। বুড়া বলিল—বস মা। বল কি বলবে বল!

ছেলেটিকে প্রাঙ্গণে নামাইয়া দিয়া ব্রজ বুড়ার মাকে প্রণাম করিল। তার পর বলিল—আমি কি করি বল তো বাবা? এ যে আমি বন্ধনে পড়লাম!

—কিসের বন্ধন? ওর?—ছেলেটাকে দেখাইয়া দিল।

—হ্যাঁ বাবা। ও তো আমার নয়।

—তোমার নয়? আমার খানিকটা যেন 'সন্দ' হয়েছিল মা। তা বয়স হয়েছে, দৃষ্টির জোর তো কমে এসেছে, সন্ধ্যের মুখে ঠিক ঠাওর করতে পারি নাই।

চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী।—কিসে তোমার মনে হ'ল বাবা?

—তোমার চেহারা দেখে। চাষ করি মা—গাছ দেখে ফলন্ত, না অফলন্ত বুঝতে পারি। গরু আছে ঘরে, শিঙের গাঁট গুনে দেহ কতটা ভারী হয়েছে দেখে বুঝতে পারি—ক'সন্তানের মা হয়েছে গাই। তা মা, মানুষের পেটে জন্মেছি, মানুষ নিয়ে ঘর করি, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারব না? মেয়েগুলোর বুঝতে পারা উচিত ছিল—ওদের সন্দও হয়েছিল—আমাকে বললে—রমনের মা। বললে—বষ্টুমীর দেহ কি না, দেখে কে বুঝবে যে সন্তানের মা হয়েছে! তা ওকে কোথায় পেলে মা?

ব্রজ তাহাকে সব বলিয়া গেল। তার পর বলিল—বল তো বাবা, এবার আমি কি করি?

—কি করবে?

—হ্যাঁ।

—যা তোমার মন চায় মা, তাই কর। যদি বন্ধন সহ্য না হয়, তবে ওকে গাছতলায় শুইয়ে রেখে রাত্রে উঠে চলে যাও তোমার পথে। বল তো বুড়ো ছেলে তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসবে, যতটা বলবে।

—কিন্তু এর কি হবে?

—সে ভাবনা তুমি ভাববে কেন মা ?

—তুমি ওর ভার নেবে বাবা ?

—না। সে আমি পারব না। সে কথা আমি বলছিও না।

—তবে ?

—ওর ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। কারুর দয়া হয় নেবে। না-হয় তো—। বুড়ো বিচিত্র হাসি হাসিল।

ব্রজ বিস্মিত হইয়া বুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল—তুমি এত নিষ্ঠুর বাবা ?

বুড়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে জ্যোৎস্না-পাণ্ডুর স্তব্ধ রাত্রি যেন চমকিয়া উঠিল। নদীর ওপারে সে হাসির প্রতিধ্বনি উঠিল। বুড়াব মায়ের স্থানে শিমুলগাছের মাথায় কোন বৃহদাকার পাখী পাখার সাপট দিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। হঠাৎ হাসি থামাইয়া বুড়া বলিল—আমি যে ব্যাটাছেলে মা। আমরা নিষ্ঠুরই বটে। তার পর আবার বলিল—মা গো, বয়স হল অনেক। ঠেকে-দেখে বুঝলাম অনেক। তুমি নিষ্ঠুর বললে মা, কিন্তু বল তো, ওকে ঘাড়ে চাপালে ওই বাঁচবে, না আমিই বাঁচব ? পুরুষমানুষ খেটে খেতে হয়, সকালে যাই সন্ধ্যেয় আসি। কে ওকে দেখবে বল ? রমনের মা ভাববে, রমনের ভাগীদার এল, রমনের বউ ভাববে—তার ছেলের অংশীদার এল। পাড়ায় কারুর যদি সদ্য সদ্য থাকত কোলের ছেলে—তবে তাকে দিলে হয়তো নিতে পারতো। কিন্তু তেমন তো নাই কেউ পাড়ায় !

তার পর বলিল—ওঠ মা, রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। চল, বাড়ী চল। বরং সারাটা দিন কাল ভেবে নাও। যা তোমার প্রাণ চাইবে, তাই কর। ফেলে যেতে চাও, রাত্রে উঠে চলে যেও, পিছন ফিরে চেয়ে দেখো না। ওর কি হবে তা ভেবো না। চলে যেও সামনে চক্ষু রেখে। আর প্রাণ যদি চায়—তবে ওকেই বুকে জুড়িয়ে ধর, নিজেকে ভেঙে-চুরে গড়, ঘর বেঁধে দি—থেকে যাও এখানে, আমি যত দিন আছি তোমার কোনও কষ্ট হবে না। আমি মরলে—।

হাসিয়া বুড়া বলিল—তা আমি এখন দশ বছর বাঁচব মা। বেশ ডাঁটো আছি এখনও। চল—এখন ফিরে চল।

বৈষ্ণবীর মনে হইতেছে সে যেন জলে ডুবিয়া যাইতেছে। জলমগ্ন মানুষ ভাসিয়া উঠিয়া যেমন করিয়া মাথা নাড়ে অস্থির ভাবে তেমনি ভাবেই সে মাথা নাড়িল—সেটা হাঁ, অথবা না কে জানে! বুড়া তাহা বুঝিল—সে বলিল—ভাল কথা মা। আজ তুমি ভাব। কাল যা হয় করবে। ভাল ক'রে ভাব মা! হাম-বা—না তুঁহু! তুঁহু!

বুড়ার কথা-মত পরের দিনটা সে সমস্ত দিন থাকিল, অনেক ভাবিল কিন্তু কূল-কিনারা পাইল না—ঘর বাঁধিতেও মন উঠিল না—ছেলেটাকে ফেলিয়া যাইতেও পারিল না। সমস্ত দিনটা চোখ মেলিয়া বসিয়া র'হল, চোখে কিছু পড়িল না; শুধুই ভাবিল। রাত্রে সকলে ঘুমাইয়াছে, তাহার চোখে ঘুম নাই—সে ভাবিতেছে। বুড়াই তাহাকে বেশী করিয়া ভাবাইয়া দিয়াছে। সে লোকটা চলিয়া গিয়াছে। বুড়ার কথাই ভাবিতেছে সে। আর একবার প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝার গুরুত্বটা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ উঠিল। ব্রজ বুঝিল সে কে। কিন্তু শুনিয়াও চঞ্চল

হইল না।' সে শক্তিই তাহার যেন নাই। এইবার কে ডাকিল—মা!

বুড়া ডাকিতেছে। ব্রজ সাড়া দিতে পারিল না। সে যেন আধ-নিদ্রার মত দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে, প্রাণপণে জাগিবার চেষ্টা করিতেছে, তবু জাগিতে পারিতেছে না।

—মা!

—এঁ্যা? বহু কষ্টে এবার সে সাড়া দিল।

—যাবে যদি মা—তবে এই সময়! ভরা ঘুমে সব ঘুমোচ্ছে।

এ কথার উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে সে। সে উঠিতেই ছেলেটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিল।

—মা!

ব্রজর বুকখানা আবার ধড়ফড় করিয়া উঠিল। ওদিকে বুড়ার ডাকের বিরাম নাই—মা শুনছ? যাও যদি দেরি করো না আর, তোমাকে এগিয়ে আমাকে আবার রাত্রি থাকতে ফিরতে হবে।

—না। এবার ব্রজ পাশ ফিরিয়া শুইল। শুইয়া অনেক কাঁদিল, মণ্ডলকে অভিসম্পাত দিল, তার পর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িল, পুরা দুইটা রাত্রি, তিনটা দিনের একটা ঝড় যেন শান্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। পরের দিন সকালে বুড়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তাহ'লে মায়ের নাম নিয়ে হরি বলে আজ আরম্ভ করে দিই ঘর?

—ঘর? ব্রজ আজও সংশয়াকুল মন লইয়া প্রশ্নের সুরেই ঘর কথাটা উচ্চারণ করিল। এ কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে সে পড়িল!

—আর ঘর ব'লে হ্যাক্ রেখো না মা। ওরে নিয়ে আয় কোদালখানা!

'জয় তারা' বলিয়া সে পাড়ার প্রান্তেই একটি বকফুলের গাছকে সম্মুখে রাখিয়া ঘরের বনিয়াদ পত্তন করিয়া দিল। বকফুলের গাছটা থাকিবে মাঝ-উঠানে।

দশ

ঘরে ঢুকিতে গিয়া বষ্টুমীর চোখে জল আসিয়াছিল। ঘর! আবার ঘর!

সেদিনের সে ঘরখানা কিন্তু পাকা-পোক্ত ঘর ছিল না। বাঁশ দিয়া চালা তুলিয়া চারিপাশে খল্‌পা বাঁধিয়া ঘরখানা বাগ্দী বুড়া একদিনেই তুলিয়া ফেলিল। নদীর ধারের বাঁশ, পাড়ায় চাঁদা করিয়া খড় ও সাবুইয়ের দড়ি সংগ্রহ করিয়া ওই বকফুলের গাছটার তলায় ঘর গড়িয়া দিল। বকফুলের গাছটার তলায় একটা পাকা-পোক্ত মেঝের মত মাটির বেদী বাঁধা ছিল। বেদীটা বাঁধা হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর আগে। বাগ্দী-পাড়ার অবীরা অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিহীনা ওই মানদা বুড়ী জীবন-মহোৎসব করিয়াছিল। মৃত্যুর পর কে তাহার শ্রাদ্ধ করিবে—কে তাহার পরলোকে সদ্গতির জন্ত ভগবানের চরণে ফুল-জল দিবে, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ফকীর গোঁসাইকে ভোজন করাইয়া আশীর্বাদ লইবে—এই লইয়া ভাবনার তাহার অন্ত নাই। অনেকে তাহাকে পোষ্য লইতে বলিয়াছিল, কিন্তু সে তা লয় নাই। বুড়ীর কিন্তু পয়সা আছে। ঘরে কাজ নাই, সারাটা দিন বুড়ী মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন-চারিটা গাই আছে, তাদের চরায়, গোবর কুড়ায়, ঘুঁটে দেয়; ফসলের সময় মাঠের ঝরা ফসল সংগ্রহ করে; বর্ষার সময় জালি পাতিয়া

পুকুরে নালায় খালে মাছ ধরিয়া বিক্রী করে। খায় এক সন্ধ্যা, কাজেই পয়সা তাহার জমে। কতক পুঁতিয়া রাখে, কতক ধার দেয় পাড়ার লোককে। মানদা বুড়ীর সেই জীবন-মহোৎসব উপলক্ষে এখানে বেদী বাঁধা হইয়াছিল। রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া হইয়াছিল তাহার উঠানে, এখানে হইয়াছিল অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন। সে বেদীটা আর ভাঙা হয় নাই। বরং যত্ন করিয়াই ওটা রাখা হইয়াছে। ওটাই পাড়ার মজলিসের স্থান হইয়া উঠিবার উপক্রম হইতেছিল।

ওই বুড়ী বলিল—ওই ঠেনে বাঁশে খড়ে চালা তুলে দাও মাতব্বর। কাল থেকে আমি পাঁচবার বলেছি—আমি তোমাকে ঠাঁই দোব মা।

রতন বুড়া হঠাৎ একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—টাকা লাগবে!

—টাকা? তু ক্ষেপলি নাকি আবার? টাকা! মরণ!

—হ্যাঁ টাকা। জীবন মচ্ছব করিয়েছিস, টাকা লাগে নাই? দেবতা বষ্টুম বসাবি, টাকা লাগবে না? টাকা লাগবে। পাঁচ টাকা। খরচ নাই?

ব্রজ লজ্জা পাইল, সে তাড়াতাড়ি বলিল—সে কি বাবা! পাঁচ টাকা আমি দিচ্ছি, আমার আছে। বৃন্দাবনে যাবার জন্যে পথে বেরিয়েছিলাম—

রতন বুড়া বলিল—কুকুর হ'তে সাধ গিয়েছে তোর, তীর্থের টাকায় পথে ঘর বাঁধবি;—উঁহু—সে হবে না। ওই বুড়ীই দেবে টাকা।

অদ্ভুত মানুষ সব, বিচিত্র বিশ্বাস, ঝিনুকের খোলার ভিতর মুক্তার মত হৃদয়, যেমন রতন বুড়া—তেমনি মানদা বুড়ী—তেমনি আর সব মানুষেরা;—ব্রজর রূপ দেখিয়া—তাহার গান শুনিয়া তাহাকে তাহারা ভালবাসিয়াছিল, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, নাকে রসকলি দেখিয়া পবিত্রাত্মা ভক্ত বৈষ্ণব ভাবিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছিল, ভালবাসায় শ্রদ্ধায় তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দেবতা বানাইয়া তাহাকে তাহারা ঘর বাঁধিয়া দিল। ব্রজর টাকা কিছুতেই লইল না, বুড়ীই দিল টাকা; গোটা পাড়ার লোক সেদিন কাজ কামাই করিল, দেখিতে দেখিতে বৈকালবেলা পর্যন্ত ঘর উঠিয়া গেল। বুড়া হাসিয়া বলিল—বেঁধে দিলাম তোমার তালপাতার কুঁড়ে! বুঝেছ মা! তুমি এখানে আজকেই হরি বলে আস্তানা বাঁধ। দেখ থেকে! তুমিও বুঝে দেখ—

—আমরাও বুঝে দেখি! বনাবস্তি হয়, শক্ত-পোক্ত ঘরে জেঁকে বসবে। না হয় তো—তোমার বাড়ীর সামনেই পাড়া থেকে বেরুবার পথ মা, খোলা পড়েই রয়েছে!

বুড়াই হাঁড়ি-কুড়ি, টুকি-টাকি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল। সে-ই পাতিয়া দিল ইটের উনান। বলিল—তোমার কাছে আজ চারটি খাব মা!

ব্রজ বলিল—সে যে আমার মহাভাগ্যি বাবা। আপনি খাবেন! আমার ঘর পবিত্র হবে। ওই হতভাগা—ওর পরম কল্যাণ হবে। আপনি তো সামান্য ব্যক্তি নন!

রতন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।—এই দেখ—বেটী কি বলে দেখ।

—ঠিক বলছি বাবা। আপনি মহাজন—

—মহাজন? আবার উচ্চ হাসিয়া সমস্ত পল্লীটা সচকিত করিয়া তুলিল বুড়া। তারপর বলিল—মহাজনী কারবারে সাধ হয় না কার বল মা, সাধ একদিন আমারও হয়েছিল। কিন্তু বড় কঠিন কারবার মা! আসল ডুবিয়ে দেনা ঘাড়ে ক'রে ঘরে ফিরলাম। বিদ্যে না থাকার ফল। জ্ঞান নাই—শুধু ভক্তিতে হবে কি? গুরু বললে, ফিরে যা, বাড়ী যা, কচু কুড়োতে এসেছিস, মন পড়ে আছে কচুর ক্ষেতে, কচু-বেচা পাঁচ সিকে তোর সম্বল, তোর আবার মহাজনীর সাধ কেন? ভাগিয়ে দিলেন মা।—বলিয়া সেই হা-হা করিয়া হাসি।

হাসি থামাইয়া বলিল—নাও এখন ঘরে চল।

বষ্টুমী এক দিকে হাসিল, অন্য দিকে কাঁদিল। ঘর! আবার ঘর!

দীর্ঘদিন পরে সেই অতীত কথা বলিতে বলিতে ব্রজ নিজের কপালে মৃদু আঘাত হানিয়া বলিল—আমার পা সেদিন যেন কে চেপে ধরেছিল। মনের ভিতরটাও যেন কেমন কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু আমি মানি নাই। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—খালি বুক; বুক জুড়ে পেলাম—ওই আমার কালকে—।

বাবাজী বলিলেন—না। ও কথা তোমার মুখে সাজে না।

হাসিয়া ব্রজ বলিল—প্রভু—আমার গুরু গল্প বলতেন—সে গল্প সেদিন মনে পড়ে নাই, আজ মনে পড়েছে। বলতেন—কালের ছলনা বড় বিচিত্র। জীব বুঝতে পারে না। অমৃত আনে—কাল বিষ হয়ে তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। একটা গাছে এক পক্ষিণী বেঁধেছিল বাসা। দুটি ডিম পেড়েছিল। একদিন ঝড় এল—বাসাখানি তছনছ হয়ে গেল—ডিম দুটি মাটিতে পড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেল। বিহঙ্গিনীর সে মহাদুঃখ। কেঁদে কেঁদে সে গলা ভেঙে ফেললে। তারপর লাগল বাসাখানি মেরামত করতে। বাসা মেরামত হল, কিন্তু ডিমের দুঃখ তার গেল না। হঠাৎ একদিন তার নজরে পড়ল—নদীর ধারে—একটি গাছের গোড়ায় কতকগুলি ডিম। তার বুকের লালসা একেবারে লক লক করে উঠল, বললে—কেউ যখন নাই—তখন নে—একটি ডিম নিয়ে পালিয়ে চল! ওর তো অনেক আছে; একটি গেলে বুঝতেও পারবে না। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। ডিম দুটি ঠোঁটে নিয়ে বাসায় এনে—বুক দিয়ে ঢেকে তা দিতে আরম্ভ করলে। কি আনন্দ কি গান তার। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে বুকের মাঝখানে কে যেন বিঁধিয়ে দিলে—একটা আগুনে পোড়ানো তপ্ত রাঙা একটা শলা। চীৎকার ক'রে পক্ষিণী পাখা নেড়ে উঠবার চেষ্টা করলে—কিন্তু তাও পারলে না, কে যেন পাক দিয়ে তাকে বন্ধন করলে। পক্ষিণী জিজ্ঞাসা করলে—কে রে নিষ্ঠুর? কে বললে—আমি তোর কাল। বিহঙ্গিনী সভয়ে দেখলে—তার চোখের সামনে—ছোট একটি ফণা মেলে একটি সাপের ছানা দুলছে। পক্ষিণী বললে—এ গাছের সর্বাঙ্গে কাঁটা—এ গাছ আকাশ ছুঁয়ে আছে। সাপ হয়ে তুই এলি কি ক'রে? কাল হেসে বললে—তুই নিজে আমাকে এনেছিলি হতভাগিনী, ঠোঁটে তুলে এনে—বুকের গরম দিয়ে আমাকে ডিম ফুটিয়ে বের করলি তুই। তাই তোর বুকেই বিষ ঢালতে হ'ল আমাকে।

ব্রজদাসী হাসিল—ঘরে ঢুকে ছেলেটিকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কত আনন্দ—কত সুখ—কত আরাম।

* * *

ঘরের আরাম আছে—আনন্দ আছে—সুখ আছে। খাইয়া-দাইয়া-শুইয়া গভীর তৃপ্তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া গাঢ় ঘুমে ঢলিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইল, এমন করিয়া নিজের ঘর সে কখনও পায় নাই। বৈকালে উঠিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল কয়েকটা জরুরী প্রয়োজনের কথা।

কেরোসিনের ডিবে একটা বুড়া আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু মাটির প্রদীপ না হইলে সন্ধ্যা দিবে কিসে? ধুনুচী একটা চাই। ঘরে ঢুকিয়া সে ছোট একখানি যুগল মূর্তির ছবি—খান-চারেক ইঁট মাটি দিয়া গাঁথিয়া তাহার উপর কম্বলের ছোট আসন বিছাইয়া বসাইয়াছে। ছোট একটি কাঠের সিংহাসন তাহার চাই।

আজ সে গ্রামখানার ভিতরে প্রবেশ করিল।

ছোট গ্রাম। একখানা মাত্র মুদীর দোকান আছে। কিছুই পাওয়া গেল না। ফিরিয়া সে খানিকটা মাটি মাখিয়া প্রদীপ গড়িতে বসিল, উনানের আগুনে কোন রকমে শুকাইয়া লইয়া আজকার কাজটা সারিতে হইবে।

ওদিকে ছেলেটা কাঁদিতে শুরু করিল। বিব্রত হইয়া উঠিল সে।

দুধ গরম করিতে হইবে।

ওঃ—তিন-চারি দিনেই ছেলেটার গলায় জোর হইয়াছে। পলিতায় দুধ খাইয়া তৃপ্ত হইতে চাহিতেছে না। বাগ্দী মেয়েগুলির ইহার মধ্যেই এদিকে নজর পড়িয়াছে। স্তন দিবার ভান করিতে হইতেছে। সাবধানতা অবলম্বনের সে এতটুকু ত্রুটি করে না। ছেলেটাকে কোলে লইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া বসে। বুকের অপুষ্ট স্তন-বৃন্ত ছেলেটার মুখে দিয়া সে নিজেও শিহরিয়া সারা হইয়া যায়, ছেলেটাও ওই অপুষ্ট বৃন্ত মুখে ধরে ব্যাকুল আগ্রহে, পরমুহূর্তেই আপনিই সে বৃন্ত মুখ হইতে খসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্ষোভে চীৎকার করিয়া ওঠে। সে চীৎকার তাহার আর থামিতে চায় না। পাড়ার মেয়েরা বলিতেছে—ছেলে তোমার আচ্ছা কাঁদুনে বষ্টুমী!

ছেলেটাকে সে কোলে তুলিয়া লইল। উনানে বসাইয়া দিল দুধের বাটি। পলিতা গড়িল, ছোট একটা বাটি বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা তাহার কেমন তিক্ত হইয়া উঠিল। বাটিটা চন্দনের বাটি। অভাবে সেটাকেই ছেলেটার দুধের বাটি করিতে হইয়াছে।

ছেলেটার পেটে রাক্ষসের ক্ষুধা, চীৎকার করিয়াই চলিতেছে; বুকে ক্রমাগত মুখ ঘষিতেছে। কিন্তু আজ তাহার স্তন-বৃন্তে সে যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। তবু সে স্তন-বৃন্তটা তাহার মুখে গুঁজিয়া দিল।

—মা!

চমকিয়া উঠিল ব্রজদাসী। বাগ্দী বুড়া আসিতেছে।

বাগ্দী বুড়া একটা ভার কাঁধে বহিয়া প্রবেশ করিল। ভারটা একেবারে দাওয়ার উপর নামাইয়া দিল।

বিস্মিত হইয়া বষ্টুমী বলিল—এ সব কি! এত সব জিনিস!

বুড়া হাসিয়া বলিল—নন্দোচ্ছব মা। নানান জায়গা থেকে ভার-ভারোটা আসে। নিয়ে এলাম, তুলে রাখ।

—কত দাম লাগল বাবা? প্রশ্নটা করিয়া সে জিনিসগুলি দেখিয়া লইল; দেখিয়া সে হাসিল। বুড়ার হিসাব খুব! মাদুর, কম্বল, দুইটা ছোট-বড় বালিশ, মশারি পর্যন্ত একটা। সে নামাইতে বসিল। নিচে টুকরা জিনিস অনেক। বাটি, ঝিনুক, কাজল-লতা; একপ্রস্থ বাসন, খানিকটা মিছরী পর্যন্ত। একটা ডালা খালি করিয়া অন্য ডালাটা খালি করিতে গিয়া সে চমকিয়া উঠিল। দু'খানা নূতন তাঁতের মোটা কাপড়ের নিচে খানকয়েক পুরানো কাপড়। পুরানো কাপড় দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। বলিল—এসব তুমি কিনে আনলে বাবা? পুরানো কাপড় সুদ্ধ?

—তোমার কাপড় দু'খানি কিনেছি মা। বাকী—মিছে কথা তোমার কাছে তো বলব না মা, নেহাত দায়ে না পড়লে মিছে কথা আমি বলি না। বাকী জিনিস মোড়ল ভাইটি দিয়েছে। তোমাকে সে একটি ছুঁচ দেয় নাই মা। যা দিয়েছে—সে ওই ওকেই। বাসন ক'খানা পর্যন্ত ওর জন্যেই দিয়েছে।

বষ্টুমী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল।

—তোল তোল। তার ছেলেকে সে দিয়েছে—সে অধিকার—

—না-না-না। কোন অধিকার তার নাই এ ছেলের ওপর। নিয়ে যাও এসব—তাকে ফিরে দিয়ো।—ব্রজদাসীর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

বুড়া বলিল—আমি যে বিপদে পড়লাম।

—কেন? ফিরে তুমি দিচ্ছ না বাবা, সে পাঠিয়েছে আমাকে, আমি ফিরে দিচ্ছি। ছেলে তার, এই বলে যদি সে দিতে চায়—তবে সে নিয়ে যাক্ তার ছেলে!

—আমি যে জোর করে আদায় ক'রে নিয়ে এলাম।

—কেন আনলে তুমি বাবা? ও আমি নোব না। আমার নাম ক'রে বলো তুমি, আমি ফিরিয়ে দিলাম। যা সত্যি তাই বলবে। বলবে—আমার মত না নিয়েই তুমি তার কাছে জিনিস চেয়েছিলে।

রতন হাত দুইটা উল্টাইয়া দিয়া বলিল—বেশ—তাই বলব। কিন্তু—

—কি? কিন্তু কিসের এর মধ্যে?

রতন দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল—এর মধ্যে নয়, তোর মধ্যে।—চটিয়া গিয়াছে বুড়া। তুই-তুকারি শুরু করিয়া দিয়াছে। বুড়া বলিল—তুই এত ক্ষেপে উঠলি কেনে? আমাদের পাড়ায় একটা মা-কুকুর ছিল। সেটার বাচ্ছা হলে—আর তার কাছ দিয়ে যাবার জো থাকত না। শীতের দিন—চারটি খড় পেতে দোব—গরমে শোবে—ছানাগুলোকে নিয়ে—ভাল করতে গেলাম—তো সে হারামজাদী ভাবলে ছানা কেড়ে নিতে এসেছে—দিলে ঘ্যাঁক করে কামড়ে। তুই যে তাই করছিস!

বুড়া উঠিয়া চলিয়া গেল। ব্রজদাসী লজ্জিত হইল। কিন্তু যত লজ্জাই সে পাইয়া থাক নিজের আচরণে—ওই জিনিসগুলা সে কিছুতেই লইবে না, লইতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ পর বুড়া আবার ফিরিয়া আসিল। মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা এখন। বুড়া বলিল, যা বলবার তুমি বাপু মহেশ ভাইকেই বলো। সে আসছে একটা দুধালো ছাগল নিয়ে। তুমি কাপড় দুখানা তুলে নাও। ও দুখানা সে দেয় নাই, ও আমি কিনে এনেছি। আমি দিয়েছি।

ব্রজ কাপড় দুখানি তুলিয়া লইল।

বুড়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে সে ডাকিল, যেয়ো না বাবা। দাঁড়াও।

—কেন? আবার কি?

—সে লোকটিকে যা বলবার তোমাকেই বলতে হবে বাবা। তার সঙ্গে কথা বলব না। আমার আর কে আছে বল—তুমি ছাড়া?

—আমি ছাড়া আর কেউ নাই তোমার? বুড়া হাসিল এতক্ষণে।—তা হলে শোন মা। আমার পরামর্শ শোন। জিনিস তুমি ঘরে তোল। আমি তাকে বলব, জিনিসগুলির দাম তাকে নিতে হবে। দেবে তুমি ক্রমে ক্রমে। দু টাকা, চার টাকা—ভিখ-সিখ করে যখন যেমন পারবে ফেলে দেবে। কেমন?

ব্রজ বলিল—বেশ। তাই। এ তুমি খুব ভাল বলেছ বাবা।

—আমি ভাল কথাই বলি। লোকটি যে আমি সোজা নই। হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে রতন চলিয়া গেল।

ব্রজদাসী ছেলেটাকে কোলে লইয়া জিনিসগুলার সামনে বসিয়া রহিল। তবু কেমন যেন

ভয় করিতেছে। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, আবার ঘর! পরের ছেলে লইয়া—! দশদিন পর বড় হইলে—ঐ লোকটা যদি—। সে আবেগে ছেলেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

ছেলেটা দুগ্ধহীন স্তন-বৃন্ত মুখে করিয়া আবার কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নাড়া-চাড়া করিতেই আবার সে চুক্ চুক্ করিয়া স্তন-বৃন্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ব্রজ যন্ত্রণার শিহরণে কুঁজা হইয়া গেল, প্রতিটি স্নায়ু-শিরাতে কিছু একটা যেন দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; নাচিয়া বেড়াইতেছে যেন! সমস্ত শরীরে ঘাম দেখা দিয়াছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই বুড়া আবার ফিরিল ছাগল লইয়া। বলিতে-বলিতেই ঢুকিল—তাই হ'ল মা। যা বলবে—তুমি—তাই হবে। সে ফিরে গেল।

উঠানে দাঁড়াইয়া সে ব্রজকে দেখিয়া বলিল—আহা মা! এবারে যেন ঠিক নন্দরাণীর মত লাগছে।

ব্রজ যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল—সে তবু নড়িয়া ছেলেটাকে বুক হইতে পৃথক করিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারিল না।

রাত্রে ব্রজর জ্বর আসিল। বুক জুড়িয়া অসহ্য বেদনা।

রমনের মা হাসিয়া বসিল—ঠোনকার জ্বর মা। ও হয়।

* * *

দিন দুই পর—জ্বর ছাড়িলে সে স্নান করিল।

স্নান করিল সে একা; মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া ঘাটে গেল না। পাড়ার মেয়েরা গেল পুকুরে। সে গেল নদীতে।

ছোট নদী। ময়ূরাক্ষীতে গিয়া পড়িয়াছে কয়েক ক্রোশ দূরে;—নাম ডাহুকী। দুই পাশে নিবিড় বন—শিরীষ ও বাঁশ বন। তারই মধ্য দিয়া ছোট নদীটি বহিয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বুক বালিতে ভরিয়া উঁচু হইয়া ওঠায় বারো মাস জল থাকে। জল অবশ্য হাঁটু-খানেক, তবে মধ্যে মধ্যে দহ আছে। সেখানে জল থাকে সাঁতার। কিন্তু ভয় আছে। ছোট মেছো-কুমীর থাকে দহে—আর আছে নাকি ভয়ানক একটা কিছু, রক্ত-মাংসের জন্তু নয়, একেবারে খাঁটি পাথর—কিন্তু জীবন্ত। সেগুলি নাকি চলিয়া বেড়ায়—মানুষ পাইলে টানিয়া লয় এক মুহূর্তে এবং বুকে চাপিয়া বসিয়া রক্ত চুষিয়া খাইয়া ফেলে।

সেকালের বিশ্বাস একালে আর ঠিক চলে না। নানা জনে এখন নানা রকম কথা বলে; কেউ বলে—পাথরের খণ্ডের আকারের কোন জন্তু—যেমন শুশুক, এমন কিছু হইবে। কেহ বলে—গড়ানে পাথর জলের স্রোতে গড়াইয়া চলে—তাহার মুখে পড়িলেই মানুষ পড়িয়া যায়, চাপা পড়ে। যাই হোক, ডাহুকীতে মধ্যে মধ্যে মানুষ মরে কিছুর আক্রমণে—যাহাকে এখনও লোকে পাথর বলে। আগে মরিত বেশী। মেছো-কুমীরগুলা নিতান্তই ছোট আকারের—ওগুলা মানুষ কখনও মারে না, তবে আক্রমণ করে—কামড়ায়—লেজের আছাড় মারে। এই কারণেই এখানে নদীতে স্নান বড় একটা কেহ করে না।

ব্রজ আজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি সেদিন না জেনেই গিয়েছিলাম নদীতে স্নান করতে। রতন বুড়ো আমায় একটা কথা বলেছিল প্রভু, স্নান করতে গিয়ে সেই কথাটা মনে পড়ল। বুড়ো বলেছিল—মা বাজা গরু দেখে চিনতে পারি—গাছ দেখে চিনতে পারি—মানুষ দেখলে পারব না—এ কি হয়! মেয়েগুলো তোমার রূপ দেখে ভুলেছে, মিষ্টি গান শুনে

ভুলেছে। মনে যে কথা উঠেছে—সে কথা মনেই থেকে গিয়েছে মা। তাই ভয় হয়—মেয়েদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে স্নান করতে। ওরা যদি বুঝতে পারে—ও আমার নিজের নয়—ও আমার কুড়ানো, তাই নদীতে গেলাম। আপনার কাছে লজ্জা করব না প্রভু, সব কথা বলতে বসেছি—বলব—সব খুলেই বলব। স্নান করতে গিয়ে জলে নেমে—।

আজ স্নান করিতে গিয়া সে নিজের দেহের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। নিজের দেহ সে তো না-দেখা নয়। এ যেন আর কারও দেহ! যত সে মুগ্ধ হইল—ভয়ও পাইল তত। সে জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল। চোখ হইতে অকারণে জলের ধারা গড়াইয়া আসিল। অনেকক্ষণ পর উঠিয়া শিশুটির ক্লেদ পরিষ্কার করা ন্যাকড়াগুলি তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল।

ছেলেটা ঘুমাইতেছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়া চুল ঝাড়িয়া চূড়া করিয়া বাঁধিল, আয়না সামনে রাখিয়া তিলক কাটিতে বসিল।

আয়নার মধ্যে নিজের মুখ দেখিয়া সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। এ কে? ইচ্ছা হইল ওই প্রতিবিম্বকে সে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কে গা? কবে বাহির হইলে তুমি সূতিকাগার হইতে? ঠিক যেন শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদের ফালির ক্ষীণ আলোয় পাণ্ডুর পশ্চিম আকাশের কোণের মত তাহার চেহারা হইয়াছে। মুখখানা পর্যন্ত যেন ভাঙিয়া গড়িতেছে কেহ। শীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার সে নিটোল মুখ। রূপের এ পরিবর্তন তাহার ভাল লাগিল। ভারি ভাল লাগিল। চোখের দৃষ্টিতে আগে তাহার হাসির ছটা ছিল; আজ মনে হইল, সেখানে যেন কান্না টলমল করিতেছে।

দেবতার আসনের সম্মুখের স্থানটুকু নিকাইয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিয়া সে প্রদীপ জ্বালিল। বুড়া তাহাকে একটি পিতলের প্রদীপ দিয়াছে। প্রদীপ জ্বালিল—ধুনা জ্বালাইল, প্রদীপ ঘুরাইয়া প্রভুর আরতি সাড়িয়া উঠিতেছে—এই সময়টিতেই ছেলেটি সাড়া দিয়া উঠিল। সে ঘুরিয়া দেখিল—ছেলেটা জাগিয়াছে, পা গুটাইয়া এক হাতের মুঠা মুখে পুরিয়া চুষিতেছে অন্য হাতখানি কাঁপিতেছে। মিটমিট করিয়া সব যেন দেখিতেছে। বড় ভাল লাগিল আজ। হাসিয়া সে তাহাকে বলিল—এই তো লক্ষ্মী-সোনা জেগে উঠে খেলা করছে! কাঁদলে কি চলে, কাজ কি ক'রে হয় সংসারের?

হাতের আরতির প্রদীপটার শিখায় হাতের তালু গরম করিয়া তাহার কপালে দিয়া বলিল—নীরোগ হয়ে বেঁচে থাক!

উঠিতে গিয়া কি মনে হইল—প্রদীপটা তাহার মুখের সামনে ঘুরাইয়া দিল।

"সাঁঝের পিদীম নড়ে চড়ে—
যে আমার খোকনকে খোঁড়ে—
সে যেন এই আগুনে—পোড়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীর আরও মনে পড়িয়া গেল—

"আরতি করে নন্দরাণী গোপাল মুখ হেরি—
গাওত নব নাগরীগণ বাখান সব ঘেরি।"

প্রদীপ রাখিয়া ওই কলি দুইটি গাহিতে গাহিতে নতুন কাজললতায় কাজল পাড়িতে বসিল।

এ যেন এক অপরূপ নেশা। এ নেশার ঘোর শুধু বাড়িয়াই চলে—কমে না, কাটে না।

বৈষ্ণবী মাতিয়া উঠিল। আবার যেন সব হাসিয়া উঠিল। ছেলেটা হাসিতে শিখিয়াছে, সে হাসে, চোখের সামনে প্রদীপ ঘুরায়—আলোর ছটার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারাটি ঘোরে—সে হাসে, কোলে তুলিয়া নাচায়—সে হাসে, মুখে মুখ ঘষে—সে হাসে, বৈষ্ণবীও হাসে—বৈষ্ণবী হাসে সরবে, খিল খিল শব্দে। নেশার ঘোরে দিন চলিয়া যায় জলের মত।

নতুন ঘর হইয়াছে, সে ঘরখানাকে বৈষ্ণবী এমন করিয়া সাজাইতে লাগিল যেন ঘরখানিকে সে হাসাইয়া তুলিবে। খড়ি-মাটি দিয়া লেপিয়াছে। খড়ি-মাটির লেপনের উপর মধ্যে মধ্যে গেরি-মাটির গোল মাড়ুলি দিয়া তাহার উপর তুলি দিয়া আল্পনা আঁকিয়াছে।

হঠাৎ একদিন নজর পড়িল—উঠানে সে নয়নতারা ফুলের চারা আনিয়া পুঁতিয়াছিল—তাহার তিন-চারিটি আধ হাত আন্দাজ বড় হইয়া উঠিয়াছে—দুইটির মাথায় দুইটি ফুল ফুটিয়াছে। একটির কুঁড়ি বোধ হয় কাল ফুটিবে।

সন্ধ্যামণির গাছগুলিতেও তেজ ধরিয়াছে। পাতাগুলি চওড়া হইতে শুরু করিয়াছে। একটিতে যেন কুঁড়ি উঁকি দিতেছে।

শুধু তাই নয়। তাহার অঙ্গন হাসিতে আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বরের খ্যাতি অঞ্চলটায় রটিয়া গেল। ময়ূরাক্ষীর এ অঞ্চলও অজয়ের তীরের মত বৈষ্ণব-তীর্থের মাহাত্ম্য-ধন্য। কয়েক ক্রোশ উত্তরেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান—একচক্রা মহাতীর্থ তাহারই কাছাকাছি—বীরচন্দ্রপুরে আছেন বাঁকা রায়। এ অঞ্চলেও আখড়া আছে অনেক। সদগোপ-প্রধান অঞ্চল; মধ্যে মধ্যে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থের গ্রামও আছে—কিন্তু অধিকাংশ গ্রামেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বেশী। ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিক অনেকে আছেন—কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের উপর কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই। বিশেষ করিয়া পদাবলী শুনিয়া কাঁদিয়া অন্তরখানাকে একবার ধুইয়া লইতে সকলেরই একটা তৃষ্ণা আছে। তাহারই জন্য ব্রজ বৈষ্ণবীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজ বলিল—আমার গুরু কথায় কথায় এই গানটি গাইতেন প্রভু—

"প্রেমের কাজল পরলি পাগল মনের নয়নে,
ওই কাজলের কালো ছটা লাগল জীবনে।
কালোই যে তোর হ'ল আলো—
আলোয় কালো রঙ বুলালো—
অন্ধ হলি দৃষ্টি গেলো—হায় এ ভুবনে।"

আমারও তাই হ'ল প্রভু। আমি সাধ করে পরের ছেলে কোলে ক'রে মা সেজে বসলাম। মনে হ'ল—আমি আমার সব পাওনাগণ্ডা পেয়ে গিয়েছি; তাকেই মূলধন ক'রে কারবার আরম্ভ করলাম। আঁটসাঁট করে ঘর বাঁধলাম—সংসার পাতলাম। খেয়েদেয়ে দুলালকে ওই বাগ্দীবুড়ীর কাছে রেখে বেরিয়ে যেতাম—ভিক্ষে করতে।

ব্রজ ভিক্ষায় যাইত, গৃহস্থেরা কাজ-কর্ম ফেলিয়া গান শুনিত। একটা গৃহস্থ-বাড়ীর দরজায় খঞ্জনী বাজাইয়া বসিয়া গেলেই—সাড়া পড়িয়া যাইত—সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে খবর পৌঁছিত—মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া বসিয়া যাইত,—গান গাহিয়াই চলিত—দু'খানা—চারখানা। ফিরবার পথে চণ্ডীমণ্ডপে অথবা বাবুদের বৈঠকখানার সামনে বসিয়া গান শুনাইতে

হইত। বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিতে পাইত একজন দু'জন বৈষ্ণব বাবাজী বসিয়া আছেন। বলতেন—মা-জী এখানে এসে আখড়া তুলেছেন শুনেছি, শুনেছি মা-জীর কণ্ঠের নাম-গানে পাষাণ কাঁদে। শুনতে বড়ই ইচ্ছা, তা প্রভুর ইচ্ছে না হলে তো তা হয় না। প্রভুর ইচ্ছেয় আজ এসে পড়েছি। রতন বাবা আমাদের জানেন। বাবা আমাদের মায়ের ভক্ত পাগল মানুষ; তা বেশ করেছেন—মহতাশ্রয়ে আছেন।

বাগ্দী বুড়া হাসিত। অকপট, অসঙ্কোচ হা-হা করিয়া হাসি। মহৎ বলিলেও লজ্জিত হইত না—অহঙ্কৃত হইত না, নিন্দা করিলেও ক্ষুব্ধ হইত না, রাগিত না। সে-ই বৈষ্ণবীর অতিথি সৎকারের একটা ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ছোট তামাক—বড় তামাক—যে তামাকের রসিক যত জন আসুক সে-ই যোগাইত সব। পয়সা দিয়া তামাক কিনিত না বুড়া। ক্ষেতে লাগাইত রঙপুরী তামাক। আর ডাহুকীর তীরে জঙ্গলের মধ্যে লাগাইত গাঁজার গাছ। বুড়ার ওই পাগল খ্যাতির জন্যই চৌকিদারে জানিয়াও কিছু বলিত না। পুলিস আসিবার খবর থাকিলে সে-ই আসিয়া খবর দিয়া যাইত।

—হঠাৎ সেদিন এলেন আপনি।

বাবাজী বিষণ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—মনে আছে। মহেশকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ। আপনার নাম শুনেছিলাম। আপনার ওই আখড়ার কত গল্প শুনেছিলাম। দেখতে সাধ হ'ত কিন্তু সাহস হ'ত না। লোকে বলত—ইংরিজী লেখাপড়া জানা লোক—আগে ছিলেন হাকিম, হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে মানগোবিন্দপুরে আখড়া তুলে—গোবিন্দের শরণ নিয়েছেন। ভয় হ'ত—ইংরিজী জানা হাকিম বোষ্টম বাবাজী হয়েছে কিন্তু সে মন কি ছাড়তে পেরেছে? আবার সাধও হ'ত। হঠাৎ সেদিন আপনি এলেন। সঙ্গে মহেশ মণ্ডল। রতন বুড়ো এসে ডাকলে। বুকটা গুর গুর করে উঠল। তবু গুরুর নাম নিয়ে—আর দুলালকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রণাম করলাম। আপনি বললেন—তোমার দোরে হরি বলে এসে দাঁড়িয়েছি। নামের ভিখিরী হয়ে।

বাবাজী বলিয়াছিলেন—শুনেছি তোমার কণ্ঠে নাকি সুধা আছে—বৈষ্ণবী, নামের সুধা—কণ্ঠের সুধা দুইয়ে মিলে শুকনো গাছে ফুল ফোটায়। বাঁশীতে নূপুরের ধ্বনির রেশ শোনা যায়। চোখে দেখছি রূপ—তুমি ভাগ্যবতী।

ব্রজদাসী লজ্জিত হইয়াছিল। সবিনয়ে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—আমি সামান্য বৈরাগী বোষ্টুমের মেয়ে প্রভু। ওসব কথা আমাকে বললে—আমার অপরাধ হয়। ভগবান রূপ দিয়েছেন—তাতে কালো দাগ ধরেছে বয়েসের সঙ্গে, কোলে এই দেখুন—আমার ফুল ফল হয়ে গিয়েছে।

—বেশ তো। ওই ফলে সাজিয়ো প্রভুর নৈবেদ্য। প্রভুর লীলায় কি শুধু রাধাই আছেন? মা যশোমতী নাই?

ব্রজদাসী বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইংরাজী জানা বাবাজী বলিয়াই হয় তো এমন নূতন মধুর কথা শুনাইতে পারিলেন তাহাকে।

মহেশ মণ্ডল নীরবে বসিয়া সব শুনিতেছিল, আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল।

বাবাজী তাহাকে বলিলেন—তুমি এত নীরব কেন মহেশ?

বাগ্দী বুড়া হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—রব সময়-বিশেষে হ'রে যায় বাবাজী! ঠাঁই-বিশেষেও হরে। আবার মানুষ-বিশেষে তার সামনেও হরে। কিম্বা হয়তো মনের মধ্যে

কোন ভাব উঠেছে আর কি! সুখ হোক, দুঃখ হোক—উঠেছে কিছু!

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—কি ব্যাপার মহেশ?

বুড়া বলিল—ওই দেখ! যে দরজায় ধাক্কা দেবে দাও গোঁসাই—মানুষের ভাবের ঘরটি হল আসল ঘর—ওখানে ধাক্কা মেরো না। লাও গো মা—গান শোনাও বাবাজীকে!

গান শুনাইবার আগেই সে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। কি জানি কেন, লোকটির প্রতি আজ আর সে কিছুতেই রাগ করিতে পারিল না। বরং খানিকটা যেন দুঃখ হইল। সে ছেলেটিকে ভালো করিয়া তাহাকে দেখাইবার সংকল্প করিল। দেখিয়া যাক। কেমন হইয়াছে—কত সুন্দর হইয়াছে একবার দেখুক। বাবাজীকে সে বলিল—একটু বসুন প্রভু।

গান শেষ করিয়া খঞ্জনী রাখিয়া সে চোখ মুছিয়া বলিল—আজ আর আমি পারব না প্রভু!

বাবাজী বলিলেন—আমিও আর শুনতে চাইব না। এর বেশী আর কি শুনব?

ব্রজ বলিল—ও কথা আপনিই বলতে পারেন বাবা। কত বড় মহাজন আপনি। শুনেছি তো সব।

—কি শুনেছ? বড় চাকরি করতাম?

ব্রজ একটু লজ্জিত হইল। বাবাজী হাসিয়া আবার বলিলেন—বেশ তো, তোমার ছেলেকে ইংরিজী লেখাপড়া শেখাও, ও-ও বড় চাকরি করবে। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে যাতে চাকরি পায় তোমার ছেলে—সে চেষ্টা আমি করব। আর আজ নিয়ে এস ওকে—মাথায় হাত দিয়ে সেই আশীর্বাদ করে যাই। আন ওকে।

ব্রজ স্থির দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—ভাবনায় পড়ে গেলে?

ব্রজ আরও কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল—ওকে কি আশীর্বাদ করবেন সে আপনি জানেন বাবা। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করে যান—আমি যেন ওকে রেখে ব্রজগোপালকে পাই।

বাবাজী বলিলেন—ও পাওয়া-না-পাওয়া তোমার হাতে। মানুষের আশীর্বাদে মানুষ ধন পায় সম্পদ পায়—জ্ঞান পায় বুদ্ধিও পায়, কিন্তু যা চাইলে তুমি তা পাওয়া যায় না। ব্রজগোপাল পাওয়া যায়—দেওয়া যায় না। তবে চাইলে তুমি পাবে।

—এই আমার ঢের বাবা—এই আমার ঢের।

বাবাজী আবার বলিলেন—দুঃখ তুমি পেয়েছ—মুখে তার ছাপ রয়েছে। তার বদলে দুঃখ দিয়েছ কিনা জানি না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে দাও নি। ওই তো চেয়ে পাওয়ার সব চেয়ে বড় দাবী গো! দয়া করে কাকে? দয়ার হকদার একমাত্র দুঃখীতেই যে! অন্নবস্ত্রের দুঃখের কথা তো নয়। ওটা আলাদা। আপন জনের অভাবে যে দুঃখ পায়—আপন জনে যাকে দুঃখ দেয়—সেই তো আসল দুঃখ। ও দুঃখ মানুষে ঘোচাতে পারে না বলেই তাকে বোঝাতে হয়। হক হয়েছে তোমার। তবে চেও। ভাল করে চেও। না চাইলে পায় না।

বাগ্দী বুড়া এতক্ষণ ঝিমাইতেছিল, গাঁজার দমটা তাহার আজ বোধ হয় বেশী হইয়াছে। এই কথাটা তাহার কানে যাইতেই কিন্তু সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ঠিক বলেছ গোঁসাই। কানা কুকুর মাড়ে সন্তুষ্ট, পোষা কুকুর এঁটোয় তুষ্ট, কেড়েখাকী হাঁউ ক'রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে—হাঁড়ি-কুড়ি বেবাক মেরে দিয়ে চলে যায়। দেখ না কেন আমার অদেষ্ট! পাথর পেয়ে ভাবলাম—রতন পেলাম। ফাঁকি—একদম ফাঁকি, গোঁসাই একদম ফাঁকি। কাঠের গুঁড়িতে ঢেঁকি করলে কাজ হয়—ধান ভানে। পোড়ালে পোড়ে। লাঙল করলে মাটি

চষে। ঠাকুর করলে কি হয়? কচু! কচু! আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুড়ার হাসিতে পাড়াটা গম্-গম্ করিয়া উঠিল। বষ্টুমী শিহরিয়া উঠিল, বলিল—ছি বাবা! ও-সব কথা বলতে নাই।

বুড়া রক্ত-রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া বলিল—কচু জানিস তুই। তুই তাহ'লে মরবি।

মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল বষ্টুমীর মুখ।

বাবাজী উঠিবার সময় বলিলেন—একটা কথা তোমাকে বলবার ছিল। একদিন এস আমার প্রভুর আখড়ায়। কেমন? গান শুনিয়ে আসবে।

এগার

উদ্বেগ হইয়াছিল। বাবাজী বলিলেন—একটা কথা তোমাকে বলবার ছিল!

কি কথা? ওই মহেশ মণ্ডল বাবাজীর শিষ্য। সে কি গুরুকে বলিয়াছে? বলিয়াছে—দুলাল তাহার দুলাল নয়! বলিলে ক্ষতি হয়তো নাই—কিন্তু না—; মন তাহার—না বলিয়া উঠিল। রতন বুড়া জানিয়াছে—পৃথিবীর আর কেউ জানিলে—সে সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইবে। দুলাল তাহার নয়—এই কথা বলিয়া সাক্ষী দিবে!

যাই-যাই করিয়াও তাই যাওয়া হইয়া উঠিল না। সংসারে ছোট ছোট কাজগুলি বড় হইয়া উঠিল। কতদিন ভিক্ষায় মানগোবিন্দপুরের দিকের গ্রামের পথে বাহির হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। পথ বদল করিয়া অন্যদিকের গ্রামের মুখে পথ ধরিল।

একদিন মহেশ আসিয়া দাঁড়াইল।

চোরের মত—মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ভাল আছেন?

হাসিয়া ব্রজ বলিল—ভালই আছি। আমার দুলালও ভাল আছে। দেখবেন আমার দুলালকে?

মহেশ বলিল—ভগবানে মতি আছে আপনার, পুণ্য ছাড়া আপনার জীবনে পাপ নাই—আপনার দুলাল ভাল থাকবে না?

ব্রজ দুলালকে কোলে লইয়া—দোলাইয়া চুমা খাইয়া—বুকে চাপিয়া বলিয়াছিল—কথা বলছে এইবার। আও আও ক'রে—কত কথা!

মহেশ একবার কোলে লইবার বাসনাও প্রকাশ করে নাই, ব্রজও দেয় নাই। কিছুতেই তাহার বলিতে মন উঠিল না—একবার নেবেন আমার দুলালকে?

মহেশ বলিল—বাবাজী আপনাকে যেতে বলেছিলেন—কই গেলেন না?

—রাস্তা যে অনেকটা দু ক্রোশ—আড়াই ক্রোশ পথ।

কথাটা নিতান্তই একটা তুচ্ছ অজুহাত। বলিয়া নিজেই অপ্রস্তুত হইল।

ভিখারিণী বৈষ্ণবী—পথ হাঁটিতে কষ্ট! ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে কত হাঁটিয়াছে! হাঁটিয়া নবদ্বীপ গিয়াছিল। তারপর প্রথম যৌবনে হাঁটিয়াছে কত তাহার ঠিকানা নাই। সঙ্গে ছিল গুরু। বাউল বুড়ার সঙ্গ ধরিয়া ঘুরিতেছিল সে—হরিণী যেমন তৃষ্ণায় জলের সন্ধানে ঘোরে তেমনি করিয়া।

ঘুরিতে ঘুরিতে—গুরু সঙ্গ ছাড়িলেন। চলিয়া গেলেন নিজের তৃষ্ণার জলের সন্ধানে।

সে সন্ধান তিনি তখন পাইয়াছেন। তার পর একা সে ঘুরিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার হাতে ছিল জলের ভৃঙ্গার। সেই জল সে পান করিল, যে জল দিল—তাহার ওই মায়া-মন্ত্রপড়া জল খাইয়া পোষ-মানা জীবের মত তাহার অনুসরণ করিল। কত পথ তাহার পিছনে-পিছনে হাঁটিয়াছে তাহার হিসাব নাই। হিসাব করিলে বোধ হয় শতেক যোজনের তো কম হইবে না। তাহার মায়া-মন্ত্রপড়া জলের জাদু যেদিন কাটিল, সেদিন অনুভব করিল—জল সে একবিন্দু পায় নাই, পাইয়াছে জাদুর ঘোরে জলের বদলে নেশার পানীয়—সেদিন আবার পথের বাহির হইয়া যে পথটা হাঁটিয়াছে সেটা যে গোটা জেলাটা। সে কথার খানিকটা তো সে মহেশকে সেদিন রাত্রে বলিয়াছিল। আজ-কাল যে সে ভিক্ষা সাধিয়া বেড়ায়—সেও যে অনেক! লজ্জিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল—যাব—যাব একদিন।

তারপর বলিল—তিনি জানেন—?

—কি?

—দুলাল যে আমার নয়—?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মহেশ বলিল—না।

—গুরুর কাছে বলেন নি?

মহেশ একটু হাসিল। বলিল—না। পারি নি।

ব্রজ বলিল—মিতান্ত খাপছাড়া উত্তর দিয়া বলিল—যাব, বলবেন প্রভুকে, শিগ্‌গীর যাব একদিন।

খোকনকে লইয়াই যাইবে স্থির করিল। এই তো ক্রোশ-দুয়েক পথ, কেউ কেউ বলে আড়াই ক্রোশ কিন্তু তা নয়, তাহারা বাড়াইয়া বলে; দুই ক্রোশ পথ—প্রহরখানেক বেলা হইতে-না-হইতে পার হইয়া যাইবে। একটু রৌদ্র হইবে—তা হোক—একখানা গামছা খোকনের মাথায় চাপাইয়া দিবে।

কিন্তু ঠিক আগের দিনই আউলি-বাউলি বাতাস আরম্ভ হইল, আকাশে মেঘ ঘটা-পটা করিয়া চলা-ফেরা শুরু করিল। বাগ্দী-পাড়ায় চাষী কৃষাণেরা মাথালি পাতিয়া মেরামত শুরু করিল, কড়া তামাকের পাতাগুলি শুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি পাড়িয়া কাটিয়া ফেলিল—গুড় দিয়া মাখাইল। যাহাদের চাল মেরামত হয় নাই, তাহারা খড় দিল চালে। আউলি-বাউলি বাতাস বহিতেছে—কাটা কাটা মেঘ রাত্রের আকাশে চলিতেছে; দু'-চার দিনের মধ্যেই 'দেবতা নামিবেন'। বৈষ্ণবী নিজেও জানে এ সব কথা। যাওয়া বন্ধ করিতে হইল এই কারণেই। ছোট একটা গোয়াল-ঘর করিয়াছে—সেটা এখনও ছাওয়া হয় নাই। নতুন দেওয়ালে জল পড়িলে গলিয়া যাইবে গুড়ের পাটালির মত!

ঘর ছাওয়া হইল। বর্ষা নামিল। আবার মাসখানেক পর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। আকাশে মেঘ তখন ধরিয়াছে; শরতের রৌদ্র দেখা দিয়াছে। মনে মনে—"যাও যাও গিরি—আনিতে গৌরী" গানের সুর গুন গুন করিয়া গুঞ্জন করিতে শুরু করিয়াছে; বসন্ত ঋতুতে কোকিলের গলায় পঞ্চমসুর যেমন জাগিয়া ওঠে, গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া জীবনধারণ করে যাহারা তাহাদের গলাতেও ঋতুতে ঋতুতে বিশেষ ভাবের গানগুলি তেমনি ভাবে সাড়া দিয়া উঠে। ওই গান গাহিতে গাহিতেই সে বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উঠিল।

মনোরম আখড়া। হইবে না কেন? বাবাজী তো ভিক্ষুক নন। তিনি বৈষ্ণব কিন্তু ভিক্ষা করেন না। শিষ্য-সেবক আছে, তাহারা দেয় কিছু কিছু; আর নিজে তিনি জমি-জমা

কিনিয়াছেন ঠাকুরের নামে। পাকা বাঁধানো আঙিনা, সুন্দর ছোট মন্দির ; চারিদিকে ফুলের গাছ। মালতী-লতায় তখন ফুল ধরিয়াছে। সাদা ফুলে ঝলমল করিতেছে, গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করিতেছে। মৌমাছি ভ্রমরের গুনগুনানিতে যেন একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা একতারার তারে ঝঙ্কার উঠিতেছে। নিবিড়-পল্লব একটা বকুল গাছের মধ্যে কোথায় বসিয়া একটা হলুদমণি পাখী ক্রমান্বয়ে ডাকিয়া চলিয়াছে—গেরস্তের খোকা হোক! গেরস্তের খোকা হোক! গেরস্তের খোকা হোক! এ ছাড়া চারিদিকে ঝিল্লীর একটানা ডাক প্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে ; কোন উদাসিনী যেন গুনগুনানি গুঞ্জরণে মনের গান গাহিতেছে। বষ্টুমী পাখীটাকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া বলিল—মরণ, ও ডাক ডাকতে এখানে কেন ? যা না গেরস্ত-বাড়ীতে।

বাবাজী থাকেন একখানি ছোট্ট মাটির ঘরে। একখানি কুঠরী, কোনমতে মানুষ দাঁড়াইতে পারে তেমনি আয়তনে ছোট। মেঝেটি বাঁধানো। কম্বলের বিছানার তলায় দু'খানা ইট দিয়া বালিশ। সামনের দাওয়াটি প্রশস্ত। লোকজন আছে—বসে, আলাপ-আলোচনা হয়।

বাবাজী নীরবে বসিয়া ব্রজদাসীর পুরানো কথাগুলি শুনিতেছিলেন—মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—সে দিনের কথা—আমারও মনে আছে। তুমি পাখীটাকে স্নেহের সঙ্গেই তিরস্কার করলে—কথাটা আমার কানে গেল। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় মনে হ'ল—এ নিশ্চয় সেই বৈষ্ণবী; বেরিয়ে এলাম—দেখলাম অনুমান আমার মিথ্যে নয়। মা যশোদার মত বসে আছ—দুলালুকে কোলে নিয়ে। দুরন্ত দামাল কালো ছেলে। আমি তোমাকে যা বলেছিলাম—তাও আমার মনে আছে। বলেছিলাম—ওকে তুমি মিথ্যে তিরস্কার করছ গো বৈষ্ণবী, ও তো এখানে ওই কথা ব'লে ডাকে না, ও কথা ও গেরস্ত-বাড়ীতেই বলে, সেখানকার বউদের মেয়েদের মনের কথা ও বুঝতে পারে। এখানে ও অন্য কথা ব'লে ডাকে।

ব্রজ বলিল—হ্যাঁ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এখানে তাহলে ও কি কথা বলে প্রভু ? আপনি বলেছিলেন—এখানে যারা থাকে তাদের মনের কথা ও সব বুঝতে পারে গো। বুঝে দেখ তোমার মনের কথা, মিলিয়ে দেখ, মিলে যাবে। ও এখানে বলে—কৃষ্ণ কোথা হে! আমি চমকে উঠেছিলাম। সে দিন মিছে কথা বলেছিলাম আপনাকে। লজ্জায় সত্যি কথা বলতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল সেদিন—পাখী বলছে—'খো-কা বেঁ-চে থাক্'! আপনি দেখতে পাননি আমার সে চমক।

বাবাজীর চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল।

তিনি সে-সময় একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন—দামাল দুলালকে। সুস্থ সবল কালো রঙের দামাল শিশু—মায়ের কোল হইতে নামিয়া—নাটমন্দিরের আঙিনায় হামা দিয়া ছুটিয়া বেড়াইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ওই চমকিয়া-ওঠাটুকুর সত্য গোপন করিবার জন্যই বৈষ্ণবী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল—আঃ! ছেলে যেন দস্যি। নামবে, ধুলো ঘাঁটবে, মাটি খাবে। বাপরে, বাপরে!

হাসিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—এই তো শুরু বৈষ্ণবী।

—কি বললেন প্রভু ? কথাটা যে বুঝলাম না।

—আগে ওকে ছেড়ে দাও ; ও থাকবে না কোলে। মা—যশোদা অনেক বাঁধন দিয়ে

গোপালকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। দাও, ওকে খেলা করতে দাও।

দুলালকে নাটমন্দিরে নামাইয়া দিয়া ব্রজ বলিয়াছিল—নে তবে গোবিন্দের আঙিনায় গড়াগড়ি দে, গোবিন্দ তোর সকল মন্দ দূর ক'রে দিন।

বাবাজী সস্নেহে বলিয়াছিলেন—নামটি বড় ভাল দিয়েছ—দুলাল। আমি কিন্তু একটু বদল ক'রে দোব। শুধু দুলাল নয়—ব্রজদুলাল।

ব্রজ লজ্জাও পাইয়াছিল, পুলকিতও হইয়াছিল।

বাবাজী বলিয়াছিলেন—কতদিন প্রত্যাশা করেছি যে তুমি আসবে। কিন্তু এস নি। আজ আমি খুশী হয়েছি—তুমি এসেছ।

অপ্রস্তুত হইয়া ব্রজদাসী বলিয়াছিল—আসা কি সহজ কথা প্রভু! পা বাড়াই আর বাধা পড়ে।

—তা হ'লে তুমি বত্রিশ বন্ধনে বাঁধা পড়েছ!

বত্রিশ বন্ধন অর্থে সংসারের মায়ার বন্ধন; বত্রিশ নাড়ির বন্ধন।

হাসিয়াছিলেন বাবাজী—বলিয়াছিলেন—ভাল ভাল। বন্ধন সত্য না হ'লে মুক্তিও সত্য হয় না। রসে যখন মজতে হয় তখন রসগোল্লার মত ডুব দিয়ে মজাই ভাল।

তিনি উঠিয়া পড়িয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—এখানেই থাক, এ-বেলা প্রসাদ পাও, ও-বেলা গান শোনাবে, সন্ধ্যার পর তোমাকে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

—কি বলবেন বলেছিলেন যে!

—সেও বলব তখন।

প্রসাদ পাওয়ার পর বাবাজী তাহাকে বলিলেন—রতন বুড়ো সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো।

—কেন? চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী।—ও তো মানুষ খুব ভাল! লোকে বলে—আপনিও বললেন সেদিন—

বাধা দিয়া বাবাজী বলিলেন—সে কথাও মিথ্যা নয়, এ কথাও মিথ্যে নয়। মধ্যে মধ্যে ও পাগল হয়। সত্যি সত্যিই পাগল হয়। তাই সাবধান হতে বলছি।

—পাগল হয়?

—হ্যাঁ। তখন ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আগে পাগলামি উঠলে ঘর ছেড়ে চলে যেত। ঘুরত নিরুদ্দেশ হয়ে। ওটা ওর সাধন-যোগ। কিন্তু যোগে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারত না—খুব অসুখে পড়ত—তার পর ভাল হলেই পালিয়ে আসত। আবার পালাত বছর কয়েক পরে। এখন একেবারেই পাগল হয়ে যায়, ঘর থেকে পালায় না, বাড়ীর সকলকে ঘর থেকে দূর করে দেয়। বলে—সকলকে ছেড়ে বনে পালানোর চেয়ে সবাইকে দূর ক'রে দিয়ে ঘরকেই বন বানিয়ে নাও।

স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-পৌত্র—সব তখন পালায়। নইলে দা' নিয়ে কাটতে যায়।

—দা' নিয়ে কাটতে যায়?

—হ্যাঁ, বলে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হবে কেন, তোরা দূর হলে ঘরই আমার পথ হবে। কখনও কখনও বলে—হ্যাঁ, থাকতে দিতে পারি—কিন্তু একজনকে কাটতে দিতে হবে। মায়ের কাছে বলিদান দোব। একবার একটা নাতিকে কাটতে নিয়ে গিয়েছিল। শেষে লোকজনে বেঁধে ধ'রে রাখে—তবে রক্ষা।

—কিন্তু আমাকে—

—হ্যাঁ। তোমাকে নিয়েও পড়ে যদি সেই ভেবে বলছি। তোমাকে ভালবাসে—ওই তোমাকে বনবাস করিয়েছে। তোমাকে নিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। তন্ত্র নিয়ে সাধনার ওই বিপদ!

—তবে? তা'হলে আমি কি করব?

—অন্যত্র আশ্রম বাঁধ। বল তো আমি চেষ্টা করি। একটু ভাবিয়া বলিলেন—মহেশকে তো দেখেছ। লোকটি সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থ। ও একটি আখড়া করতে চায় গ্রামে—

কথার মধ্যস্থলেই ব্রজদাসী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—না।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটু চকিত হইয়া বাবাজী বলিলেন—তুমি রাগ করলে? রাগ করবার কথা তো বলি নি।

ব্রজদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না-না। রাগ নয়। মোড়ল কি আপনাকে ওই কথা বলেছে নাকি?

—আখড়া করে প্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠার সাধ ওর অনেক দিনের। মধ্যে মধ্যে বলে।

—সে কথা নয়। আমি বলছি আমার কথা।

—তোমার কথা ও কেন বলবে। আমি বলছি সব দিক ভেবে।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিল—তার চেয়ে আপনার এই আশ্রমে আমাদের মা-বেটাকে একটু ঠাঁই দিন না।

বাবাজী চুপ করিয়া রহিলেন। উত্তর দিলেন না।

—প্রভু! ব্রজদাসী আবার তাঁহাকে ডাকিল।

—না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বৈষ্ণবী বলিল,—আমার কি কোন অপরাধ আছে প্রভু?

—তা খানিকটা আছে বই কি? তোমার রূপ আছে ব্রজ!

বৈষ্ণবীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ও কথা আমাকে শুনতে নাই প্রভু, আমার পাপ হয়। গোপাল আমার কোলে।

—শুনতে চাইলে ব'লে বললাম। মিথ্যে বলারও তো পাপ আছে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বৈষ্ণবী বলিল—আমি উঠব প্রভু!

—উঠবে? ভয় পেলে? হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না, সে ভয় ক'রো না। সব কথা তো বলতে পারলাম না। বললে বুঝতে।

বৈষ্ণবী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাবাজী বলিলেন—বস। আর একটা কথা বলব। প্রভুর নাম নিয়ে বলছি—ভয় নাই তোমার।

বৈষ্ণবী বসিল না, দাঁড়াইয়াই বলিল—বলুন, কি বলবেন!

বাবাজী বলিলেন—মন্ত্র বদল—ইষ্ট বদল বড় কঠিন বৈষ্ণবী। তুমি এখনও পার নাই।

চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী। স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাবাজী বলিয়াই গেলেন—রামপ্রসাদের গানটি বড় ভাল—মা হওয়া কি মুখের কথা?

ব্রজ এবার বসিয়া পড়িল।—কেন? এ কথা বলছেন কেন?

বাবাজী বলিলেন—বুঝে দেখ।

ব্রজ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—তুমি যে ভাবের ব্রজে যাবার মন করেছ—সে ভাবের ঘোরে যদি ভোর

হ'তে পারতে—তবে যে পৃথিবীর সব তোমার কাছে ওই তোমার দুলালটি হয়ে যেত গো। তা হ'লে কি রূপের কথায় তুমি লজ্জা পেতে? আমি যুগল ভাবের ভাবী, আমি যদি ওই ভাবে ভোর হতে পারতাম—তবে কি তোমার রূপকে ভয় করতাম। ওরই মধ্যে যে আমি তাঁকেই পেতাম গো। শ্রীমতী আমার শ্যামকে ভালবেসে জগৎ দেখেছিলেন শ্যামরূপে ময়-ময়। তমালকে দেখে শ্যাম ব'লে জড়িয়ে ধরতেন। সেই তো প্রেম—সেই তো পাওয়া।

ব্রজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এই পাওয়ার কথায় তাহার মন উদাস হইয়া উঠিল। মনে মনে অনেকদিন পর প্রশ্ন জাগিল—এ কি করিল সে? এ কোন মায়ায় আবদ্ধ হইয়া কোথায় চলিয়াছে? মনে পড়িল বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্কল্পের কথা। তাহার ইচ্ছা হইল এই মুহূর্তে বাবাজীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া প্রশ্ন করে—এ আমি কি করলাম? কিন্তু তাহার পূর্বেই—বাবাজী বলিলেন—রতন বুড়ো যত দিন সুস্থ আছে তত দিন থাক ওখানে। ভালো লোক, পুণ্যও আছে। তবে যদি বোঝ—কেমন ভাবগতিক—তুমি চলে যেয়ো।

—কোথা যাব?

—সে তো বলা মুশকিল। আচ্ছা, তখন এখানে এস—আমি ভেবে রাখব কিছু।

* * *

ব্রজ আজ বার বার আক্ষেপ করিয়া বলিল—আঃ! আমি যদি সেদিন সব কথা আপনাকে বলতাম প্রভু।

বাবাজী বলিলেন—আমি সব জানতাম ব্রজ।

—জানতেন? ব্রজ চমকিয়া উঠিল।

—জানতাম। দুলালের জন্ম-কথাও জানতাম, আবার দুলালের কর্মও যে এমন হবে—তাও যেন বুঝতে পেরেছিলাম। হ্যাঁ ব্রজ, বুঝতে পেরেছিলাম।

—তবে? তবে কেন সেদিন আমাকে সাবধান করেন নি প্রভু!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবাজী বলিলেন—বলি নি। বলতে পারি নি।

ব্রজ বলিল, বাগ্দীদের আশ্রয় যেদিন ছেড়ে এলাম—সেদিন রতন আমায় বলেছিল।

বারো

বৎসর পাঁচেক পর ব্রজদাসী বাগ্দীপাড়া পরিত্যাগ করিয়াছিল।

দুলাল তখন শৈশব পার হইয়াছে। বৎসর ছয়েক বয়স। রতন বাগ্দী পাগল হয় নাই, তাহার জন্য নয়, ওই দুলালের জন্যই বাগ্দীপাড়ায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুলালের বাল্য-লীলার রূপ দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া আসিল—বাবাজীর কাছে। ছয় বৎসরের দুলালকে দেখিয়া মনে হয়—আট-দশ বৎসরের ছেলে। দুরন্তপনায় চীৎকার করিয়া ধূলা উড়াইয়া গোটা পাড়াটা মাতাইয়া বেড়ায়।

রাজ্যের ইট-পাথর কুড়াইয়া ঘরে আনে, ঠাকুর পাতে, পূজা করে; ফড়িং ধরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও চলিয়া যায় ও-পাড়ার লোহার বাগ্দীপাড়ার লোহাশালায়। হাপরের ফুঁয়ে আগুন জ্বল-জ্বল করে, লোহা গলে, লোহার উপর হাতুড়ী পড়ে, আগুনের ফুলকি ছোটে,

দুলাল আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দেখে। ছেলেকে কোথাও না পাইলে ব্রজ ওখানে যায়। বকিতে বকিতে আসে—বোষ্টমের ছেলে—কামারশালে—কি সুখ পাস? শেষে প্রভুকে ভুলে লোহা পিটবি? পৌষ মাঘ মাসে দুলাল সারাটা দিন পড়িয়া থাকে মাঠে। ওই বাগ্দীবুড়ীর সঙ্গে যায়, ধানের শীষ কুড়াইয়া আনিয়া জড়ো করে।

ব্রজ তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনে—গায়ের ধূলা মুছাইয়া দিয়া তিরস্কার করিয়া বলে—ধানে দরকার কি তোর? ধানে কি হবে? সুদে কারবার করবি। মহাজন হবি? হতভাগা কোথাকার!

দুলাল বলে—পালো খাব না? পিঠে খাব না?

ধান কুড়ানো বন্ধ হয়, ধানের সময় যায়, বর্ষায় আবার দুলাল ছুটিয়া মাঠে যায়—বাগ্দীদের ছেলেদের সঙ্গে বুড়ীর সঙ্গে মাঠের মাছ ধরিয়া বেড়ায়।

ব্রজ তাহাকে প্রহার করিতে শুরু করিল। দুলালের কর্কশ গলার কান্নার চীৎকারে পাড়াটা যেন অশান্ত অধীর হইয়া উঠিল।

ব্রজ তাহাকে অনেক বুঝাইল। হৃদয়ের ক্ষোভ বেদনা মিশাইয়া তিরস্কার করিয়া বুঝাইল—তোর কি মনে থাকে না তুই বৈষ্ণবের ছেলে, তুই কি তোর ভবিষ্যৎ ভাবিস না রে? তোর গতি কি হবে ভেবে তোর এতটুকু ভাবনা হয় না রে!

ছেলেটি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে।

প্রথম প্রথম তিরস্কারের সুরে আহত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। ক্রমে সেটা সহ্য হইয়া গেল। সে মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তার পর সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে শুরু করিল।

হঠাৎ একদিন ব্রজর মনে হইল—ভূমিকম্প হইয়া সব ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

সেদিন দুলাল অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়া উঠিল।

চমকিয়া উঠিল ব্রজ। পরক্ষণেই সে একটা বাখারি টানিয়া লইয়া বলিল—কি বললি?

দুলাল কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া বন্য জন্তুর মত স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজদাসীর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না, সে বলিল—বলবি আর?

দুলাল আরও কয়েক পা পিছাইয়া গেল—দাঁত বাহির করিয়া হিংস্র ভঙ্গিতে বলিল—বলব। বলবই তো।

—বলবি? বোষ্টমের ছেলে হয়ে এই সব শিখছ তুমি?

—হ্যাঁ শিখছি। শিখবই তো।

ব্রজর আর সহ্য হইল না। সে ছুটিল। দুলালও ছুটিয়াছিল—গাল দিতে দিতেই ছুটিয়াছিল—বলব—বলব—বলছি— — —। কিন্তু বাড়ীর আগড়টা ছিল বন্ধ। আর ছোট পায়ে ছুটিয়া মায়ের সঙ্গে তাহার পারিয়া ওঠার কথাও নয়। তাহাকে ধরিয়া ব্রজ নিষ্ঠুর ক্রোধে ঘাকতক বসাইয়া দিল। ছেলেটার জেদ চাপিয়াছিল—প্রহারের সঙ্গে সমানে গাল দিয়া চলিল, অশ্লীলতম গালাগাল—কুৎসিততম ভঙ্গী—পশুর মত কণ্ঠস্বর। ব্রজ সভয়ে হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া পিছাইয়া আসিল। ছেলেটা মুহূর্তে দুরন্ত ক্রোধে একটা ঢেলা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল। শিশুর লক্ষ্য—তাই রক্ষা, বুকে মুখে বা পেটে লাগিলে কঠিন আঘাত পাইত ব্রজদাসী, কিন্তু ঢেলাটা আসিয়া লাগিল কাঁধের নীচে হাতে। মনে হইল হাতখানা যেন অসাড় হইয়া গেল।

দুলাল এবার বেড়ার একটা ফাঁক দিয়া, বোধ হয় সর্বাঙ্গ ছিঁড়িয়াই বাহির হইয়া পলাইয়া গেল। ব্রজদাসী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন কাহারও অভিশাপে—এক মুহূর্তে পাথর হইয়া গেল।

* * * *

সে বাঁধিল না, বাড়িল না। ভাবিল, কাহার অপরাধ? কোন্ অপরাধে এমন ঘটিল?

অপরাধ কি উহার জন্মের? অপরাধ ব্রজর অদৃষ্টের? আর কি? আছে, আরও একটা অপরাধ। এই পল্লীটির মধ্যে সে ঘর বাঁধিল কেন? ও-পাড়ার লোহার বাগ্দীপাড়া এমন নয়। আরও বাগ্দীপাড়া সে দেখিয়াছে—সেগুলিও এমন নয়। এখানকার অবস্থা ওই রতন পাগল এমনটা করিয়া তুলিয়াছে। তান্ত্রিক সাধুদের মুখের আগল নাই; তাহাদের কাছে শ্লীল-অশ্লীল নাই, তাহারা এই ভাবে কদর্য কুৎসিত গালাগাল করিয়া থাকে। ব্রজ শুনিয়াছে—পঙ্ক-চন্দনে তাহাদের কাছে কোন প্রভেদ নাই। আলো-অন্ধকার,—পঙ্ক-চন্দন—হীরক-অঙ্গার—কাঞ্চন-বিষ্ঠা সব তাহাদের কাছে এক—এমন কি জীবন এবং মৃত্যু দুইকে তাহারা এক করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ করে ঘৃণা, কেহ করে পূজা, তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। হয়তো তাহারা পাগল—সত্য সত্যই পাগল—অথবা তাহারা পাগল নয়, আর কিছু। তবে তাহাদের আচরণ সংসারীর পক্ষে বিষম। ওই অর্ধ তান্ত্রিক—সাধনা ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া সেই বিষ ছড়াইয়া দিয়েছে গোটা পাড়ায়। সে ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া এই সব অশ্লীল গালিগালাজ ব্যবহার করে। তাহার ফলে গোটা পাড়াটার মনে ঘাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। পাখীর জাত ছেলের দল—বুলির মত শুনিয়া শুনিয়া এইসব শিখিয়াছে। দুলালও শিখিয়াছে তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া।

অনেক ভাবিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল—মানগোবিন্দপুরের পথে। মনে পড়িল—বাবাজী তাহাকে বলিয়াছিলেন—তখন এখানে এস।

বাবাজীর সম্মুখে বসিয়া ছিল অল্পবয়সী একটি ছেলে। মোটা চটের মত কাপড় পরনে, গায়েও তেমনি জামা। চোখ দুটি ছোট, কিন্তু প্রখর দৃষ্টি তাহাতে। ঘন ভ্রূ এবং কপালের কুঞ্চন-রেখার সারিতে মিলিয়া কেমন যেন বৈশাখ-অপরাহ্নের পশ্চিম দিগন্তের মেঘের ছায়ার মত ছায়া ফেলিয়াছে তাহার তরুণ মুখশ্রীর উপর। বৈষ্ণবী একটু থমকিয়া গেল।

বাবাজী প্রসন্ন মুখে বৈষ্ণবীকে বলিলেন—এস—এস।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিল।

বাবাজী বলিলেন—বস তুমি। বিশ্রাম কর। এখন আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি।

ব্রজ আসিয়া নাটমন্দিরে বসিল। বিগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সুমতি দাও, তুমি আমার দুলালকে সুমতি দাও। তাকে দয়া কর। তার জন্মের পাপ কৃমিকীটের মত তাকে ডুবিয়ে রেখেছে—তুমি তাকে উদ্ধার কর!

চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে শুরু করিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে আবার উঠিয়া সসঙ্কোচে বাবাজীর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিল একাই বাবাজী বসিয়া আছেন। ছেলেটি কখন চলিয়া গিয়াছে।

বাবাজী তাঁহার সযত্ন-বিন্যস্ত চুলে আঙুল চালাইতেছিলেন এবং গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিলেন। মৃদু হইলেও ব্রজদাসীর বুঝিতে কষ্ট হইল না।

পদাবলী তো তাহার অজানা নয়; সুর শুনিয়া ঠোঁট নড়া দেখিয়া বুঝিল বাবাজী

গাহিতেছে—

"আজু কে গো মুরলী বাজায় ?
এতো কভু নহে শ্যাম রায় !"

গানের তালের মাথায় ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—ব'স।

গান শেষ করিয়া বলিলেন—গান গাইছিলাম। হাসিলেন।

বৈষ্ণবী হাসিল না। হাসি আসিল না।

বাবাজী বলিলেন—তুমি খুব উৎকণ্ঠিত। জোরে পথ হেঁটে এসেছ—হাঁপাচ্ছিলে—এখনও দেখছি মুখ অপ্রসন্ন। কি হয়েছে বল তো ? দুলাল ভাল আছে ? তাকে অনেক দিন দেখি নি।

বৈষ্ণবীর চোখ দুইটার ভিতরে কাজল দীঘির মোহনা ভাঙিয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে বহু কষ্টে সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বলিল—বলুন আমি কি করব ?

বাবাজী দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবী অধীর হইয়া তাঁহাকে ডাকিল—প্রভু।

—হ্যাঁ। কি বলছিলে যেন ? অপরাধীর মত হাসিয়া বলিলেন—আজ আমার মনটা একটু চঞ্চল আছে। ওই যে ছেলেটিকে দেখলে না ? ওটি আমারই ছেলে। স্বদেশী করছে আজকাল ভদ্রঘরের ছেলেরা—শুনেছ তো ? ও তাই করে। আগে দু'বার জেলে গিয়েছে। একবার গেল—একবার এমনি আটক ক'রে রেখেছিল।—এবার আবার নাকি খুব বড় একটা স্বদেশী মাতন আসছে। আমার কাছে এসেছিল দেখা করতে। বলে গেল—। একটু চুপ করে থেকে চুলে আঙুল চালিয়ে বললেন—এবার নাকি গুলি-গোলা চলবে। তাতে যদি মারা যায় তবে দেখা হবে না।

বৈষ্ণবী শিহরিয়া উঠিল, তাহার চোখের জল যেন লজ্জা পাইল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল—তবে আজ আমি যাই।

—না। ব'স, ওর পথে ও চলে—আমার পথে আমি চলি। যে সময়টুকু মুখোমুখি দেখা হ'ল—থেমেছিলাম। ও চলে গেল। আমারই বা বসে থাকলে চলবে কেন ?

ব্রজ মাটির দিকে চাহিয়া মেঝের উপর নখের দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল—আপনি বলেছিলেন—যদি কখনও ওখানে থাকতে না পার, তবে আমার এখানে এস। এখানে ইস্কুল আছে—আমি ওকে ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দোব।

বাবাজী বলিলেন—আরও অনেক কথা বলেছিলাম ব্রজ! বলেছিলাম—তোমার রূপ আছে। আমার ভাবে এখনও নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারি নি বৈষ্ণবী।

ব্রজ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল—মোড়ল তার গাঁয়ে আশ্রম করতে চেয়েছিল বলেছিলেন।

—ভাল। দিন কয়েক পরে খবর দোব। তুমি এস না। আমি পাঠাব খবর।

খবর আসিল। দিন-কয়েক নয়, প্রায় মাস-খানেক হইয়া গেল। ব্রজ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

দুলাল ইতিমধ্যে একদিন একটা শালিকের বাচ্চা ধরিয়া বলিদান করিয়া রক্তের ফোঁটা কপালে পরিয়া নাচিতে নাচিতে ঘরে ফিরিল। ব্রজ শিহরিয়া উঠিয়া নিজের কপালে ঘা মারিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রতন আসিয়া বলিল—কাঁদিস কেন অনবুঝ মেয়ে! ওকে আমি আমার চেলা করব। আমিই তো বললাম ওকে—দে মায়ের নাম ক'রে কেটে। পিদীম জ্বললেই জ্বালা—নিভলেই ঠাণ্ডা। শালিক ছানাটার ডানা ভেঙেছে—দে ওটাকে কেটে।···পাখাই যখন ভেঙেছে—তখন পাখী-জন্মে কাজ কি ওর। তা জয় তারা বলে দিব্যি কেটে দিলে! ওকে আমি চেলা করব।

ব্রজ বলিল—না! তার চেয়ে ও মরে যাক, মরে যাক।

—মরে যাক! চীৎকার করিয়া উঠিল রতন।

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!

পাগল রতন যে পাগল রতন—সেও ব্রজদাসীর সে মূর্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। ব্রজ বলিল—খুব—খুব শাস্তি হল আমার তোমার আশ্রয়ে থেকে। আমি চলে যাব বাবা—আমি চলে যাব।

পাগল অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

ব্রজ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। দুলালের শাস্তিটা আজ কঠোর হইয়াছিল, ব্রজদাসী জীব-হত্যার অপরাধ সহ্য করিতে পারে নাই। রক্তাক্ত হত্যার নৃশংসতা তাহার দৃষ্টিকে আতঙ্কিত করিয়া তাহাকে যেন দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারই ক্ষোভে সে দুলালকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাতেও তাহার ক্ষোভ প্রশমিত হয় নাই, তখন সে নিজের কপালে ঘা মারিয়াছিল। দুলাল দুর্দান্ত, সে ব্রজদাসীকে অমান্য করিতে শিখিয়াছে, সে হতভম্ব হইয়া কাঁদিতেছিল।

কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল—কর্কশ কণ্ঠে কদর্য চীৎকার করিয়া বলিল—বেশ করব। খুব করব। করবই তো। কাটব, আমি কাটব, আরও কাটব। ছুটিয়া সে পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর কাহার বাড়ী হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠি লইয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া হিংস্র পশুর মত গর্জিয়া উঠিল—আগুন লাগিয়ে দোব।

ব্রজ একটি কথাও আর বলিল না। দেয় দিক। আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাক ঘর-সংসার, সব—সব! মুক্তি হোক তার।

দীর্ঘকাল পরে তার মনে পড়িল—বৃন্দাবনের পথ।

কথা বলিতে গিয়া ব্রজদাসী আজ আবার কাঁদিয়া আকুল হইল। বাবাজী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সান্ত্বনা দিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন না, উদাস দৃষ্টিতে শান্ত প্রৌঢ়ত্ব রূপময়ী হেমন্তের প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর বলিলেন—আমারই ভুল। তুমি আমায় বলে গেলে, আমি তোমাকে বলতে পারলাম না—ব্রজ আমি জানি দুলালের জন্মকথা, কর্ম যা হবে তাও বুঝতে পারছি, তুমি আর মায়ায় জড়িয়ো না। তুমি পথ ধর! তার পরিবর্তে—আমার ভুলের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম—মহেশকে ব'লে—গোপালের আখড়া প্রতিষ্ঠা করে তোমাকে—এক বন্ধন থেকে বের ক'রে এনে নতুন বন্ধনে বেঁধে দিলাম।

সত্য কথা। সেই দিনই সন্ধ্যায় বাবাজী নিজেই আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

* * * *

বাবাজী একা নয়, সঙ্গে মহেশ মণ্ডল এবং আরও দুইজন স্থানীয় আখড়ার মহান্ত।

রাত্রির অন্ধকারে বন্যায়-ভাসিয়া-যাওয়া মানুষের চোখের সামনে শুধু সূর্যোদয়ই হইল না—সঙ্গে সঙ্গে যেন পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাইল; সে মাটিতে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া গদগদ চিত্তে প্রভুকে জানাইল—তোমার অসীম দয়া, অকূলে তুমি কূল দিলে, অরণ্যে তুমি পথ দিলে। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ!

তাহারই মনের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়াই যেন বাবাজী বলিলেন, জয় গোপাল! জয় গোবিন্দ! তোমার দরবারে যে এলাম বৈষ্ণবী। প্রভুর আদেশ নিয়ে এসেছি।

—আসুন প্রভু! আসুন! ব্যস্ত হইয়া উঠিল ব্রজদাসী।

বাবাজী হাসিয়া বলিল—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। অভ্যর্থনা তোমাকে করতে হবে না। আমরাই তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

অবাক হইয়া গেল ব্রজ।

বাবাজী বলিলেন—আমি স্বপ্ন দেখেছি—কয়েক দিনই দেখেছি যে আমি নাড়ুগোপাল বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা করছি। আয়োজনও করছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, নাড়ুগোপালের সেবা—এ কি আমার দ্বারা চলবে? এ সেবা চালাতে হলে গোপাল-ভাবের ভাবিকা চাই—সেবিকা চাই। বুঝেছ; আর আমার আখড়ার মধ্যেও ভাবগ্রাহী আর ভাবিকায় আলাপ ঠিক নির্বিঘ্ন হবে না। তা—মহেশ বলল—ওর সাধ এ ভার ও নেয়, আখড়াটি নিজের গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে। আমি বললাম—ভাল কথা, আমার স্বপ্নের সাধ পূর্ণ হলেই হ'ল। সবই ঠিক। এখন তোমার কাছে এসেছি আমি—এ গোপাল সেবার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

ব্রজ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র ধারায় কাঁদিল। এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য তাহার! আর ভাবনা নাই। বাবাজী তাহার জীবনে মঙ্গলময়ের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার সকল দুশ্চিন্তা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। আখড়ার পূজা-অর্চনা উৎসব-আচার-আচরণের মধ্যে দুলাল রেশম কীটের মত পাকে পাকে জড়াইয়া পড়িবে, তারপর একদিন সে বাহির হইবে ব্রজদাসীর কল্পনার রঙে রঙীন বিচিত্রিত পাখা লইয়া। হঠাৎ তাহার বুকখানা ধড়াস করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এত সমাদর! ইহার অর্থ লইয়া মানুষে কুৎসিত কথা বলিবে না তো? সে তো জানে! সে তো জানে—তাহার আড়ালে মানুষ গোপালের জন্য তাহাকে কলঙ্ক দেয়!

গোটা বাগ্দীপাড়াটা কাঁদিয়া আকুল হইল।

শুধু রতন বুড়া হা-হা করিয়া হাসিল। বুড়া সেই দিন হইতে ব্রজদাসীর বাড়ীতে আসে নাই। শুধু তাই নয়, বুড়ার ভাবভঙ্গিও কেমন যেন হইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া চীৎকার করে—কচু-কচু—আমার কচুটা!

বাড়ীর লোক—পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রজকে সাবধান করিয়া গিয়াছে বাগ্দীবুড়ী—বলিয়া গিয়াছে—ক্ষেপবে মনে লাগছে মা। সাবধান হবা যেন!

বিদায় লইতে গিয়া ব্রজদাসী তাকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া বলিল—কন্তের আদরে রেখেছিলেন বাবা, আপনার ঋণ আমার শোধ হবার নয়। কিন্তু দেবতার ডাক এসেছে—আমাকে যেতে হবে। আপনি যে-সে লোক নন—মহাজন, অনুমতি করুন।

রতন বুড়া গাঁজা খাইয়া ভাম হইয়া বসিয়াছিল। সে লাল চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—কচু-কচু-আমার কচুটা!

তারপর বলিল—পালাচ্ছিস! তা ভাল ক'রে পালিয়ে যা না কেন? তেঁতুল গাছ ফেলে পালা। তেঁতুল বীচিতে গাছ, টকো ফলে অম্বল, বাতাসে চর্মরোগ। পালাবি তো ফেলে পালা! যাবি তো ব্রজে যা। বুঝলি! নইলে মরবি। ছেলেটাকে দিয়ে যা—ওকে আমি ভাতে সেদ্ধ ক'রে খেয়ে দেব।

তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল—আবোল-তাবোল চীৎকার—

—জয় তারা—জয় তারা, ঘুরিয়ে দে মা খাঁড়া। দে—সব রক্তে ভাসিয়ে দে। কেটে-কুটে দে। ভাত মাস দে মা। গাঁজা দে মা।

ব্রজর দিকে চাহিয়া আবার বলিল—পালা—পালা—ছুটে পালা।

ম্লান হাসিয়া ব্রজ সরিয়া আসিল।

পাগলের জন্য বেদনার অবধি ছিল না তাহার। শুধু পাগলের জন্যই নয়। বাগ্দীপাড়ার মমতাও কম নয়। বাগ্দীবুড়ী কাঁদিয়া সারা হইল।

বাগ্দীপাড়ার এ মমতা—এ যে বত্রিশ নাড়ীতে জড়াইয়া গিয়াছে। ছিঁড়িতে সে সমস্ত টনটন করিতেছে। এত ভালবাসা—এত যত্ন—এ ফেলিয়া যাইবে কেমন করিয়া! অকৃতজ্ঞ—সে অকৃতজ্ঞ!

তেরো

অকৃতজ্ঞতার অপরাধও সে মাথা পাতিয়া লইল; মনে মনে বলিল—তুমি তো অন্তর্যামী, কিছুই তো তোমার অগোচর নাই। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। না-হয় সাজা দিয়ো। শুধু এইটুকু করো—সে সাজার এতটুকু আঁচ যেন দুলালকে স্পর্শ না করে। তোমার চরণে তার মতি হোক—তার জন্মের অপরাধের খণ্ডন হোক—সেই মতির পুণ্যে। দুলাল আমার সব কিছুর উপরে।

দুলাল তাহার সব কিছুর উপরে। কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা, পাপ-পুণ্য কলঙ্ক-প্রশংসা সব কিছুর উপরে। অকৃতজ্ঞতার অপরাধের বেদনা অন্তরে বহিয়া—চোখের জল মুছিতে মুছিতে নতুন আখড়ায় আসিয়া উঠিতে লোকে তাহার মাথায় কলঙ্কের কালো জলে স্নান করাইয়া দিল। যে কলঙ্কের কথা লোকে তাহার আড়ালে বলিত—সে কলঙ্ক সে নিজেই একদা সকলের সমক্ষে বলিয়াছিল। সেদিন ভাবে নাই ওই মিথ্যা কলঙ্ক যেদিন ফিরাইয়া দিবে—সেদিন আর তাহার সহ্য করিবার শক্তি থাকিবে না।

ব্রজদাসী আক্ষেপের হাসির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাও সহ্য করলাম—ওই দুলালের মুখ চেয়ে। আখড়ায় এসে উঠলাম, আখড়াটি দেখে মন একেবারে ভরে উঠল। চোখ জুড়িয়ে গেল। আজ ষোল বছর হয়ে গেল—কিন্তু সেদিনের আখড়ার সেই ছবি আমার চোখে ভাসছে আজও। মণ্ডলকে সেদিন মনে মনে বলেছিলাম—তোমার সব পাপ খণ্ডন করলে তুমি—প্রভু যেন তোমাকে মার্জনা করেন।

সুন্দর আখড়াটি পরিপাটি করিয়া গড়া হইয়াছে। বাঁধানো মেঝে মাটির ঘর, আটপলা

কাঠের খুঁটি দেওয়া বাঁধানো পিড়ে। বাঁধানো উঠান। আখড়ার ধারেই একটি নালা—শাখা-নদী ভাহুকীর প্রশাখা। আখড়া হইতে খালে নামিবার ঘাটটি পর্যন্ত কয়েকটি পাকা সিঁড়ি এবং অল্প একটু চাতাল করিয়া বাঁধানো। নাড়ুগোপালের ঘরখানি আড়ে-দীর্ঘে চার হাত চার হাত, সামনে তিন দিকে তিনটুকরা বারান্দা। সামনের বারান্দাটুকুতে তিনটি থামে দুইটি খিলান। চারিপাশের এক দিকে নালা—বাকী তিন দিকে পুরানো বাগান। কাঁঠাল, শিরীষ এবং আমের গাছ। আর জন্মিয়াছে বন্য বাবলা গাছ।

আখড়ার চারিদিকে ঘন করিয়া কাঞ্চন গাছের চারা লাগানো হইয়াছে, গাছের ডাল।

গ্রামখানিও নেহাৎ ছোট নয়। দোকান-দানিও কয়েকখানা আছে। পাঠশালা আছে। গ্রামের যে সব ছেলেগুলি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহাদের দেখিয়া ব্রজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, মিষ্ট চেহারা ভারী ভাল লাগিল ব্রজর। গোপালের বাল্যভোগ দিয়া প্রসাদ লইয়া সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—এস আমার গোপালের সখারা সব। শ্রীদাম-সুদাম-দাম-বসুদাম! আমার সুবল কোন্‌টি হবে গো? সব চেয়ে সুন্দর কে গো?

প্রতিটি ছেলের মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠিল—তাহার শ্রীতে তাহার দৃষ্টি জুড়াইয়া গেল—মন অনাবিল প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল; মনে মনে সে বাবাজীকে সহস্র প্রণাম জানাইল—গোবিন্দকে নিবেদন করিল—যিনি দুঃখিনীর দুলালের জন্য এত করিলেন—তোমার কৃপা যেন তাঁহার উপর অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিও। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল বাগ্দী-পাড়ার ছেলেদের। মনে পড়িতেই লজ্জা অনুভব করিল সে। মনে হইল—এ মুক্তি সে লাভ করিল একটা অপরাধের মূল্যে! তাহাদের সাহচর্য হইতে দুলালকে সরাইয়া আনিয়া দুলালের জীবনের পথ সে পরিসর করিল; কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ হইতে রাজপথে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, কিন্তু যাহারা এতদিন ওই বন্ধুর পথে দুলালের হাত ধরিয়া চলিয়াছিল—তাহাদের সম্মুখের অন্ধকারের কথা তো ভাবিল না। চোখে তাই জল আসিল। বলিল—ওদের পথ ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব বহন করিবার শক্তি যেন তুমি দুলালকে দিয়ো। ওই ভারটাই যেন জীবনে সে বহন করিতে পারে।

বাবাজী বসিয়াছিলেন কর্মকর্তার আসনে। আখড়ার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে মহেশ মণ্ডল, আখড়ার সেবার ভার গ্রহণ করিবে ব্রজদাসী কিন্তু আখড়াটি বাবাজীর মানগোবিন্দপুরের আখড়ারই অঙ্গ স্বরূপ। এমন আখড়া আরও কয়েকটি আছে। বৈষ্ণব মহান্ত কয়েকজন বাবাজীকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ ব্রজদাসীর কানে গেল—রাধিকাপুরের মহান্ত—ছি-ছি করিয়া সারা হইয়া গেলেন।

সে চকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বৈষ্ণবেরা সকলেই রাধাগোবিন্দ স্মরণ করিয়া বলিল—রাধা গোবিন্দ, রাধা গোবিন্দ! হায় রে মানুষের রসনা! হায় রে অন্তরের কলুষ!

ব্রজদাসী সঙ্কোচভরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাবাজী সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া বলিলেন—এই যে ব্রজদাসী এসেছে! অবসর হ'ল তোমার? নাও—তা হ'লে বস—নামকীর্তন কর।

—হ্যাঁ। মিথ্যা কথা—খারাপ কথা শোনাও পাপ। ভগবানের নামে খণ্ডন হোক। বসুন মা-জী।

ব্রজ কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না—কি হ'ল বাবা?

—কিছু না। সে তুমি—নাম ধর।

রাধিকাপুরের বাবাজী প্রবীণ কিন্তু খানিকটা পাগল মানুষ, তিনি বলিলেন—সংসারে তো জটিলে-কুটিলেই বেশী মা-জী, তাদের কথাই হচ্ছে গো! কোঁটা কাটলেই বৈষ্ণব হয় না, তা হ'লে তো—নালা মাত্রেই নদী হ'ত। ইতরজনে নানা কথা বলছে।

—কি বলছে?

—সে আর শুনতে হবে না আপনাকে। দেখছেন না—মহান্তরা সবাই আসেন নি!

ব্রজদাসীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—থাক বাবাজী ওসব কথা—

—থাকবে কেন? মা-জী সন্তান কোলে নিয়ে বসে প্রথম দিনই তো—

বাধা দিয়া নরোত্তম দাস বাবাজী বলিলেন—থাক ওসব কথা। শ্রীমতী কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করেছিলেন। কলঙ্কের লজ্জা তো তোমাকে ভয় দেখাতে পারে নি ব্রজ। আমি তো শুনেছি প্রথম দিনই তুমি বাগ্দীপাড়ায় নিজের মুখে কি বলেছিলে! নাও তুমি নাম আরম্ভ কর। আন, খোল আন। আমি খোল বাজাব।

গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বন্দনা করিয়া ব্রজ গান ধরিল—

"জয় ব্রজরাজ-কোঙর
গোকুল উদয় গিরি চান্দ উজোর!"

প্রাণ ঢালিয়া সে গান করিয়া গেল। বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল—কিন্তু তাহাতে স্বাদ ম্লান হইল না। গান শেষ করিয়া ব্রজ দেখিল—দুলাল মন্দিরের দুয়ারের পাশে দাওয়ার উপরটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নরোত্তম দাস বাবাজীকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল—আপনার দয়ার ফল—আপনার দয়ার ফল এরই মধ্যে ফলে গেল প্রভু, দুলাল আমার গোপালের দরজায় গড়িয়ে পড়েছে।

নরোত্তম দাস হাসিলেন। বলিলেন—তাই সত্যি হোক। প্রভু দয়া করুন। দুলালকে তুমি মনের মত ক'রে মানুষ ক'রে তোল। তোমার জীবনের দুঃখ—

ব্রজ অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল—গোবিন্দের দয়া, আপনার আশীর্বাদ, ওর অদৃষ্ট আর আমার—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার যে কোন সম্বলই নাই।

—তোমার অনেক পুণ্য ব্রজ। যতখানি তোমার ওর ওপর ভালবাসা ততখানি পুণ্য। অফুরন্ত! অফুরন্ত!

—না। ছেলেকে কোন্ মা ভাল না বাসে বলুন!

—যে কলঙ্ক তুমি স্বীকার ক'রে ওকে কোলে নিয়ে জগতের হাটে দাঁড়িয়েছ ব্রজ—সে তো মা হ'লেই মানুষে পারে না। তুমি যদি কলঙ্কের ভয়ে ওকে পথে ফেলে দিতে—

ব্রজ শিহরিয়া উঠিল। তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল কৃষ্ণা একাদশীর রাত্রির শেষ প্রহরের শ্মশান। সে বলিল—না-না—সে কথা—মনে পড়াবেন না।

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—তাই তো কলঙ্ক তোমার ফুল হয়ে ফুটল। আজও মানুষের কলঙ্ক দেবার চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু সে তো তোমাকে স্পর্শ করলে না।

—আজও কলঙ্ক দিচ্ছে!

—দিচ্ছে বৈকি। বাবাজী হাসিলেন—এবার আমাকেও রেহাই দেয় নি। বলেছে—এমন আয়োজন ক'রে সমারোহ ক'রে ওই কলঙ্কিনীকে এনে যখন গোপালের আখড়া করেছে তখন ওই-ওই। অর্থাৎ আমি।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন নরোত্তম দাস। বলিলেন—আমি ধন্য হলাম। তোমার কলঙ্কের ভাগ পেয়েছি।

ব্রজ কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবাজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুমি কাঁদছ?

ব্রজ বলিল—আমার এ আখড়ায় কাজ নাই প্রভু। আমি বরং আপনার আখড়ায় দাসীর মত থাকব। আমার কলঙ্ক আমি সইতে পারি—কিন্তু ওই দুগ্ধপোষ্য শিশু, ও যদি দুঃখ পায় লজ্জা পায়—

বাবাজী অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

ব্রজ চোখ মুছিয়া অবশেষে বলিল—গোবিন্দ দিলেন যে রসনা, যাতে নামের মধু ঝরে পড়ে—সেই রসনায় ওদের এত বিষ প্রভু!

এতক্ষণে বাবাজী হাসিলেন সহজ হাসি।—সে বিষেও তুমি জর-জর হয়ে ঢলে পড় নি, তাই তো তোমাকে এত স্নেহ করি! মনের মধ্যে যার বাঁশী বাজে, তার কালিদহের নাগকে ভয় কিসের? আচ্ছা চলি।

বৈষ্ণবী সমস্ত রাত্রিটা আজ আবার কাঁদিল। দুলালের মাথায় হাত বুলাইল। ছয় বছরের দুলালের আজও স্তন্যপানের তৃষ্ণা মেটে নাই। মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণবীর চোখে কথাটা ভাবিয়া জল আসে। ওই অমৃত সে দুলালকে দিতে পারিল না। সুস্থ সবল ছেলে দুলাল—কিন্তু ওই অমৃত যদি বুক পুরিয়া সে তাহাকে পান করাইতে পারিত তবে রূপে—আকারে—শক্তিতে আরও কত সুন্দর হইয়া উঠিত, সে কথা সে জানে। সে ছবি সে আঁকে, আঁকিতে পারে।

* * * *

ব্রজদাসী অকস্মাৎ অতীত কথায় ছেদ টানিয়া বলিল—কালিদহের নাগের বিষে অঙ্গ আমার একদিন জর-জর হয়ে গেল—তাও আমি সহ্য করলাম। ওর মুখ চেয়ে। ভস্মে আমার ঘি ঢালা হ'ল। ওর মতি পালটাল না। মোড়লদের ছেলেরা পড়ত গাঁয়ের পাঠশালায়—দুলালকে ভর্তি করে দিয়েছিলাম, বছর খানেক পরে পণ্ডিত এসে বললে—মা-জী, তোমার ছেলেকে পড়ানো আমার সাধ্য নয়। ওর যত বুদ্ধি তত দুষ্টুমি। দুপুরবেলা পাঠশালা থেকে পালাবে—গিয়ে উঠবে বাগ্দীপাড়ায়। সেখানকার বুড়ীর সঙ্গে মাঠে মাঠে বেড়াবে।

বুড়ীর সহিত দুলালের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। ধানের শিষ কুড়াইবার সঙ্গী ছিল দু'জনে। দুলালের আঁচলে যখন আর শিষ ধরিবার জায়গা থাকিত না তখন শিষ কুড়াইয়া বুড়ীর ঝুড়িতে দিত দুলাল। মাছ ধরিয়া সবই দিত বুড়ীকে। বুড়ীর ঘরে তখন হইতেই লুকাইয়া মাছ খাইয়া আসিত। বুড়ী অনর্গল বকিত, পাড়ার লোককে গালি-গালাজ করিত, ভগবানকে গাল দিত; দুলাল কখনও কোন প্রতিবাদ করে নাই। বরং প্রতি কথায় সায় দিয়াই চলিত। বুড়ী বলিত—ওই রতন—ও সর্বনেশে পাগল, ভয়ঙ্কর লোক!

দুলাল বলিত—ভারী দুষ্টু। যে চোখ।

বুড়ী মনের আক্ষেপে গাল দিত—ভগবান চোকখেকোর বিচার নাই।

দুলাল বলিত—লাঠির বাড়ি মারতে হয়।

দুলাল এখনও মাছ-ভাতের লোভে বুড়ীর বাড়ী যায়। বুড়ী লুকাইয়া মাছ-ভাত খাওয়াইয়া তাহাকে পাঠশালায় ছুটির আগে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

রতন বুড়া পাড়ায় থাকিলে বুড়ীর কাছেই সারাক্ষণটি বসিয়া থাকে। রতন বুড়া তাহাকে দেখিলে যেন ক্ষেপিয়া উঠে। চীৎকার করিয়া গালি-গালাজ করিয়া বলে—বেরো—বেরো—বেরো বলছি পাড়া থেকে। খবরদার এ পাড়া মাড়াবি না।

মধ্যে মধ্যে পাগলের মত বলে—তোকে কেটে ভাতে সেদ্ধ ক'রে খাব। বোষ্টমের মাংস কিনা। সেদ্ধ করে আলুর মত খাব। মা তারার ভোগ লাগাব।

বুড়া পাড়ায় না থাকিলে ছেলেদের সঙ্গে গুলি-দাঁড় খেলিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিয়া তবে ফেরে। ফিরিবার সময় চীৎকার করিয়া একে চন্দ দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্য—ঘোষিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করিয়া ফেরে। ব্রজদাসী কোন কথা জানিতে পারে না।

বাড়ীতে সে শান্ত-শিষ্ট।

মহেশ মণ্ডলের সঙ্গে বড় ভাব।

আখড়ায় এখন নিত্য সন্ধ্যায় নাম-গান হয়—গ্রামের মাতব্বরেরা আসেন। তামাক খান। গানের পর কথাবার্তা হয়, তাহাদের বিদ্যা-বোধ-মত শোনা ধর্মের কাহিনী বলে। মহেশ মণ্ডল, মণ্ডল না থাকিলে পাঠশালায় পণ্ডিত চরিতামৃত পাঠ করে।

মহেশ মণ্ডল পণ্ডিত নয়, কিন্তু এ গ্রামে সে সকলের চেয়ে ভাল লেখাপড়া জানে। এমন শুভঙ্করীর হিসাব মুখে-মুখে কেউ করিতে পারে না। শুধু এ গ্রামে কেন—পাঁচখানা গ্রামে কেউ পারে না। দলিল, চেক রসিদ এসব সে নির্ভুল দেখিয়া লইতে পারে। সব চেয়ে বড় কথা—লোকটি মিথ্যা বলে না। সকলেই এ কথা বলে। মহেশ হাসে। কিন্তু বৈষ্ণবীর আখড়ায় এ কথা বলিলে সে মাথা হেঁট করিয়া গভীর স্বরে যেন আর্তনাদ করিয়া ওঠে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! দয়া কর প্রভু!

বৈষ্ণবী আর তাহাকে ব্যঙ্গ করে না, আর তাহাকে তীক্ষ্ণ কথা বলে না। মিষ্ট হাসিয়া বলে—গোবিন্দ তো তোমার উপর নিদয় নন মণ্ডল! মিছে দুঃখ কর কেন?

মহেশ আকাশের দিকে চাহিয়া বলে—জানি না মা-জী। তবে দুঃখ তো অনেক!

আজকাল সে বৈষ্ণবীকে মা-জী বলিতে শুরু করিয়াছে। ব্রজ তাহাতে খুশী হইয়াছে।

বৈষ্ণবী বলে—দুঃখ করো না। আজকের দুঃখ কালকে সুখ হয়ে ওঠে। কাঁটায় ভরা ডালের আগায় ফুল ফোটে। নাও, ও-সব কথা রেখে একবার ভাল ক'রে তামাক খাও। আর দুলালকে একটু পড়া দেখিয়ে দাও। দুঃখিনীর ছেলের যদি দু' কলম হয়—যদি শাস্ত্র পড়ে প্রভুর সন্ধান পায়—তবে তোমার তাঁর আশীর্বাদে সব দুঃখ ঘুচে যাবে। দুঃখীর আশীর্বাদেই তো তাঁর ভাঁড়ারে টিপ্ কাটা যায় গো!

দুলাল পড়িতে গিয়া মণ্ডলের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

মণ্ডল ডাকে—মা-জী। দুলালকে তোল। ঘুমিয়ে গেল।

—এই দেখ। ঘুম পাড়াতে তোমাকে বললাম বুঝি? বললাম—পড়াও খানিকটা—

—পড়বে। বয়স হলেই পড়বে।

—বয়স হলে পড়বে কি? এখনই তো পড়ছে। যা চেঁচিয়ে পড়তে পড়তে বাড়ী আসে! তুমি পড়া শুধাও না ওকে!

মনে মনে ব্রজদাসী সোনার মন্দির গড়িয়া তোলে—সেই গড়ার আনন্দের খানিকটা ঝলক তাহার মনের পাত্র উপ্‌চাইয়া গড়াইয়া পড়ে।

হঠাৎ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া ব্রজদাসী চমকিয়া উঠে। মনে হয় একটা বজ্রাঘাত হইয়া গেল ওই মন্দিরের উপর।

দুলাল দুষ্ট, দুলাল পাঠশালা হইতে পলাইয়া গিয়া বাগ্দীপাড়ায় মাছ-ভাত খাইতে যায়। এখনও পর্যন্ত প্রথম ভাগ তাহার শেষ হইল না! হে গোবিন্দ!

পাঠশালার পণ্ডিত বলিল—আপনি ওকে মানগোবিন্দপুরের মাইনর স্কুলে ভর্তি করে দেন।

* * * *

অন্ধকারের মধ্যে আবার আলো দেখিতে পাইল ব্রজ। তাহার মন বলিল—ভাল হইবে। ইহাতেই ভাল হইবে।

বাবাজীর আশ্রমের গ্রামেই মাইনর ইস্কুল। ওখানে ভর্তি হইলে অন্ততঃ একবেলা দুলাল বাবাজীর পায়ের ধূলা লইয়া আসিতে পারিবে। এ ছাড়া তাহার মায়ের মন প্রত্যাশাতেও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পাঠশালা হইতে মাইনর ইস্কুলে যাইবে দুলাল। আল-পথ হইতে মেটে গাড়ীর পথ পাইবে, সে পথ গিয়া আরও বড় পথে পড়িয়াছে।

তাহার কল্পনা যেন আশ্বাসের জলসিঞ্চনে বীজ ফাটিয়া অঙ্কুর—অঙ্কুর হইতে সবুজ একটি ছোট চারা গাছ হইয়া উঠিল।

মহেশ বলিল—না। দুলাল তোমার ঘরেই পড়ুক।

—কেন?

—না—বৈষ্ণবের ছেলে ও-সব লেখাপড়া শিখে করবে কি?

বৈষ্ণবী আর একটি কথা বলিল না। মহেশের উপর সমস্ত ভাল ধারণা এক মুহূর্তে চুরমার হইয়া গেল।

সে নিজেই দুলালকে সঙ্গে করিয়া একদিন রওনা হইল। প্রথমেই বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উঠিল। মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দুলালকে লইয়া প্রণাম করিল। দুলালও খুব খুশী। জামা গায়ে দিয়াছে, একটি ছিটের কোট, পরনে একখানি নতুন কাপড়, তাহার উপর শখ করিয়া ব্রজ একখানি পাড়ওয়ালা ছোট চাদর গলায় জড়াইয়া দিয়াছে। মুখখানি ফুটফুট করিতেছে, মাথার চুল তেলে চকচক করিতেছে, কপালের উপর আঙুল দিয়া চুলের ডগাগুলি এক-মুখ করিয়া টানিয়া দিয়াছে, কপালের মাঝখানে পরাইয়া দিয়াছে গোপালের আঙিনার মাটি ও দইয়ের একটি ফোঁটা।

দেবতাকে প্রণাম করিয়া সে বাবাজীর কাছে গেল।

কিন্তু থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল।

বাবাজীর সামনে বসিয়া আছে বাবাজীর সেই ছেলে। ছেলেটি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই মোটা কাপড়-জামা-চাদর পরনে, মাথার চুলগুলি রুক্ষ তামাটে, চোখে প্রখর দৃষ্টি, মোটা ভ্রূ ও কপালের কুঞ্চনে সেই কালবৈশাখীর মেঘের ছায়া—সে ছায়া যেন আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। মৃদু অথচ কঠিন কথাবার্তা চলিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া ছেলেটির দৃষ্টি যেন আরও কঠোর হইয়া উঠিল। সঙ্কোচভরে ব্রজ দুলালকে লইয়া মন্দিরের সামনে আসিয়া বসিল। ছেলেটি রাগ করিয়াছে তাহাকে আসিতে দেখিয়া। তা করিবে বই কি! নিজের বাপের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলিবার সময়ে ব্যাঘাত করিলে রাগ কার না হয়! তাও আজ বোধ হয় বৎসর দেড়েক পর বাপের কাছে আসিয়াছে ছেলে। গোবিন্দকে সে মনে মনে বার বার প্রণাম করিল। ছেলেটি গুলি খাইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেশের কাজ করিতে গিয়াছিল। এ লইয়া রাজার জাত সাহেবদের সঙ্গে হাঙ্গামা। শান্ত পল্লীগ্রামে পর্যন্ত কড়া

খবর—কত জটলা—কত মজলিস। নুন তৈরী, মদ খাওয়া বারণ, চরকা—এই সব লইয়া শহরে বাজারে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। যাক, সেই 'মন্বন্তরা'র মধ্য হইতে সে যে বাঁচিয়া অক্ষত শরীর লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, বাবাজীর বুকে যে অগ্নিবাণ হানেন নাই বিধাতা, সে কেবল গোবিন্দের দয়া। বিধাতার বিধাতা যে তাহাদের গোবিন্দ!

বসিয়া থাকিতে থাকিতে দুলাল ঢুলিতেছিল। ওদিকে কথাবার্তা যেন চড়া সুরে উঠিতেছে, দেরিও অনেক হইয়া গেল। অবশেষে ব্রজ দুলালকে বলিল—দুলাল এইখান থেকে প্রণাম কর বাবাজীকে। চল, ওদের দেরি আছে। আমরা বরং ইস্কুলে গিয়ে ততক্ষণ ভর্তির কাজ সেরে আসি।

গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া সে মাস্টারের সামনে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই বেত্রাহতের মত একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিল।

ভর্তি করিতে গিয়া মাস্টার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বাপের নাম?

স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল ব্রজ।

—ওর বাপের নাম কি! এই খোকা—তোমার বাবার নাম কি?

দুলাল বোকার মত একবার বলিয়াছিল—এঁ্যা?

—তোমার বাবার নাম কি?

—জানি না।

—জানি না? বাবার নাম নইলে ভর্তি হবে কি করে? বাবার নাম বলতে পার না? তা হলে তোমাকেই যে বলতে হবে!

ব্রজ মুহূর্তে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। দুলালের হাত ধরিয়া টানিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রাস্তায় পড়িয়া এতবড় ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোটা বাজার পার হইয়া একটা গাছতলায় আসিয়া বসিয়া পড়িল।

দুলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল মা?

ব্রজ অঝোরঝরে কাঁদিয়া আকুল হইল।

তাহার মনে হইল—কালীয় নাগের বিষে জীবন-সমুদ্রে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এত বিষ, এত বিষ! সে দুলালকে বুকে চাপিয়া ধরিল। মনে হইল বুকটা জুড়াইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর আসিয়া আবার উপস্থিত হইল বাবাজীর আখড়ায়। বাবাজী প্রবেশপথেই দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন—কোথায় গিয়েছিলে? আমি তো ভেবেই পাই না।

ব্রজ আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—কি হল?

বহু কষ্টে ব্রজ ব্যাপারটা জানাইল। বাবাজী শান্ত বিষণ্ণ হাসি হাসিলেন, বলিলেন—আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে না? আমি তাহ'লে যেতে দিতাম না।

তার পর বলিলেন—কেঁদো না তুমি! করবে কি বল? পৃথিবীর দেনা-পাওনা—ও তো না মিটিয়ে উপায় নাই।

ব্রজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বাবাজী বলিলেন—বস।

তিনি চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া কয়েকখানি বাতাসা, কয়েক টুকরা শসা, নারিকেল, দুলালের হাতে দিয়া বলিলেন—খাও। তোমার মুখ শুকিয়েছে—বুঝতে পারছি ক্ষিদে পেয়েছে তোমার। ব্রজ—তুমি—

ব্রজ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তবে কি আমার দুলাল পড়তে পাবে না? ওর পড়া হবে না?

—আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি পড়াব ওকে।

দুলালের মহা ভাগ্য—পরম ভাগ্য। ভাঙা-গড়ার মধ্যে কি অপরূপ তাঁর লীলা—বৈষ্ণবী ভাবিয়া অভিভূত হইয়া গেল; ভাঙা ঘরের ভিতের উপরেই পত্তন করিয়া দিলেন সোনার কলস দেওয়া শ্রীমন্দিরের।

চৌদ্দ

ব্রজ থামিল। কাহিনী তাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে। নীরবে সে অনেকক্ষণ ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিল। তার পর দিন বলিল—আমার কোন্ পাপে কোন্ অপরাধে এমন হ'ল? আমি যত-বার গড়তে গেলাম—ততবার—প্রভু আমার—। কথা সে শেষ করিতে পারিল না। হু-হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাহার মুখ ভাসাইয়া দিল। নিঃশব্দ কান্না। খুনী ফাঁসীর আসামীর মত লজ্জায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ কিন্তু চোখের জল অজস্র ধারায় বহিয়া যাইতেছে।

বাবাজী বলিলেন—ব্রজর গড়ার কথা ধরিয়াই বলিলেন—ভাঙা আর গড়া, গড়া আর ভাঙা—এই তো তাঁর লীলা ব্রজ! সোনার কলস দেওয়া শ্রীমন্দির—

—না। সবেগে ব্রজ মাথা নাড়িল।—না—সে আশা আমি অনেকদিন ছেড়েছি। আপনার কাছে পড়তে দিলাম, ও আপনার চরণ ছেড়ে দিয়ে—মানগোবিন্দপুরের বাজারের পথে কুড়িয়ে বেড়ালে—সুধার বদলে গরল, বৈষ্ণবের মতি ওর হল না, ও শেষ পর্যন্ত মটরের চাকরি নিলে। আমি তাতেও কিছু বলি নি। আমার ভাঙা মন্দির আর গড়তে চাই নি প্রভু। চেয়েছিলাম—ওই ভাঙা দেওয়ালের উপরেই পাতার ছাউনি করে বসতের একটু আশ্রয়। তাতেও গোবিন্দ আগুন ধরিয়ে দিলেন। দুলাল শেষে মদ খেতে ধরলে প্রভু!

নরোত্তম দাস বাবাজী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি বলিবেন? দুলালকেই বা কি দোষ দিবেন? তাঁহার বিচারে দুলালের দোষ নাই।

প্রথম প্রথম সে বাবাজীর আশ্রমে আসিয়া পরমানন্দে এই গণ্ডীটুকুর মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিত। নির্জন মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে কোথায় কোন্ পাখী ডাকিল তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। হাতে থাকিত ঢেলা—গাছে গাছে ঢেলা মারিয়া পাখীটাকে উড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিত, প্রজাপতি ফড়িংয়ের পিছনে পিছনে সন্তর্পণে অনুসরণ করিত। ফুল তুলিত—ছিঁড়িত। মন্দিরের দেবতার বেশ-পরিবর্তন দেখিত। বাবাজীর কাছে পড়িতে বসিত, গল্প শুনিত। মায়ের আখড়া গ্রাম, বাগ্‌দীদের গ্রাম্ পার হইয়া এখানে আসিয়া অনেক কিছু পাইয়াছে, মনে হইয়া-ছিল। এখান হইতে মধ্যে মধ্যে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানির ভিতর ঢুকিত কিন্তু ভয় লাগিত। প্রথম যেদিন সে একা আখড়া হইতে বাহির হইয়া এখানকার বাজারের দিকে গিয়াছিল, সে দিন হাঁ করিয়া চারিপাশ দেখিয়া চলিতে গিয়া একটা গরুরগাড়ীর সামনে পড়িয়া প্রচণ্ড ধমকে চমকিয়া উঠিয়াছিল; ছুটিয়া সে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সাহস বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ডাক শুনিল। বিচিত্র বিস্তৃত পৃথিবীর ডাক। মস্ত বাজার, সপ্তাহে দু'দিন হাট, ইস্কুল, ডাকঘর—এসবের চারিপাশে মানুষ ভিড় করিয়া, দলে দলে আসিতেছে—যাইতেছে।

বাজারে কত জিনিস—বর্ণে গঠনে চোখকে ডাক দেয়, কত খাবার গন্ধে আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে টানে। বৈকালে ইস্কুলের ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলিতে যায়। সেখানে গিয়া খেলা দেখিয়া সে একেবারে লোলুপ হইয়া উঠিল। নিত্য গিয়া সে বসিয়া থাকিত মাঠের ধারে। খেলার বলটা বাহিরে গেলেই ছুটিয়া সেটাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে ধরিয়া আনিয়া ছুঁড়িয়া দিত। ক্রমে পায়ে করিয়া মারিয়া দিতে শুরু করিল। এখন সে দলের একজন খেলোয়াড় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ছেলের চেয়েই তাহার পায়ের শট জোরালো। ওখান হইতেই একদিন চলিয়া গিয়াছিল জংশন স্টেশন—রেলগাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে; লোহার গাড়ী লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়াছে। ওখানেই দেখিয়া আসিল মোটর। ওখানেই দেখিল টেলিগ্রাফের খুঁটি—কান পাতিয়া শব্দ শুনিল—গোঁ-গো করিতেছে।

আশ্চর্য পৃথিবী! ছুটিয়া চলিয়াছে, লোহার গাড়ী ছুটিয়াছে, মোটর গাড়ী ছুটিয়াছে, তারে তারে খবর ছুটিয়াছে, মানুষও ছুটিয়াছে, দেহের শক্তিতে কুলাইতেছে না, তবু সে ছুটিতেছে—চোখে তাহার প্রখর দৃষ্টিতে দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। প্রচণ্ড তাহাদের গতিবেগের আকর্ষণ। শান্ত মন্থরগতি একটি স্নিগ্ধ নীলাভ গ্রহের একটি মণ্ডন হইতে একটি গ্রহপিণ্ড আর একটি প্রচণ্ড গতি-বেগে ঘূর্ণ্যমান উজ্জ্বল লাল এক প্রদীপ্ত গ্রহমণ্ডলীর কাছে আসিয়া—তাহারই আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্কাখণ্ডের মত ছুটিয়া চলিল তাহারই দিকে। এ আকর্ষণ বেগ সম্বরণ করার শক্তি তাহার কোথায়? সে কি করিবে?

শেষ আকর্ষণ ও শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্য লইয়া একদা এই গ্রামে আসিল মোটর বাস। এখান হইতে নিয়মিত যাতায়াত করিবে জংশন স্টেশন।

ব্রজদাসী বলিল—ও যদি ম'রে যেত, তবে বুকের শেলের আঘাত নিয়ে চলে যেতাম আপনার পথে। আমি কি করব?

—আমি একটা কথা বলব ব্রজ? পারবে?

—পারব। বলুন। এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—যে পথে যাত্রা করেছিলে, যে পথে মাঝখানে ওই ওকে জীবন দেবার জন্যে থেমে রয়েছ, সেই পথে বেরিয়ে পড় তুমি। তোমার কাজ তো হয়ে গেছে। দুলাল তো এখন জোয়ান হয়ে উঠেছে।

ব্রজদাসী কথা বলিতে পারিল না, শুধু বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—অনেক দিন আগে ব্রজ, তুমি যেদিন প্রথম আমার আখড়ায় এসেছিলে—সেদিন একটা কথা তোমাকে বলেছিলাম, তুমি কথাটা শুনে তার আঁচ পেয়েছিলে কিন্তু অর্থ বুঝতে পার নি। একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিলে—কি বললেন প্রভু! আমি কথাটার উত্তর দিই নি। অন্য কথা পেড়েছিলাম। তুমিও ভুলে গিয়েছিলে। তোমার মনে নাই, আমার মনে আছে। দুরন্ত দামাল ছেলেটি তোমার কোলে থাকতে চাইছিল না, তুমিও ছেড়ে দিচ্ছিলে না, অবশেষে আমিও বললাম—তুমিও ছেড়ে দিলে—ও মনের আনন্দে আখড়ার নাট-মন্দিরময় ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। আমি বলেছিলাম—এই তো শুরু। ফল কি গাছের বোঁটার বাঁধনে চিরদিন বাঁধা থাকে! গাছের মত বেদনাই হোক, সে খসবে—সে মাটির বুকে গাছ হয়ে মাথা তুলবে—ফুল ফলাবে—ফল ধরাবে! এই নিয়ম।

তত্ত্বকথায় ব্রজদাসীর মন প্রবোধ মানিল না। সে বিষণ্ণ অপ্রসন্ন মন লইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

—ব্রজ!

ব্রজ এবার বলিল—ও যে মদ ধরলে!

—ধরুক। ওর পথ এখন ওর চোখে, তোমার দেখানো পথে তো চলবে না। এই তো তোমার কথাই ধর না, তুমি যেদিন প্রভুর আশ্রয়ে যাবার জন্তে পথে বেরিয়ে ওকে পেলে—সেদিন ওকে কোলে নিয়ে আবার উল্টো মুখে পথ হাঁটতে শুরু করলে—সেদিন তো রতন পাগল তোমাকে বলেছিল—ও যাক—ওর ভাগ্যে যা আছে হবে—তুমি চলে যাও নিজের পথে। তুমি তা যাও নি। গেলে ভাল করতে। দুলালও আজ তাই করেছে ব্রজ।—তোমাকে আমি ভালই বলছি। তুমি চলে যাও। তোমার ডাক এসেছে।

ব্রজ হঠাৎ উঠিয়া বলিল—আমি আজ যাই! গোপালের আমার আরতি আছে!

সে চোখ মুছিল, মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিল, বলিল—পাপীর মন প্রভু, হতভাগার কথাই শুধু চিন্তাই করছি, আমার গোপাল যে ঘরে বন্ধ রয়েছেন—সে কথা মনেই নাই। যাক—হতভাগা আপন পথে, আমার গোপাল আছেন।

পিছন হইতে বাবাজী ডাকিলেন—শোন ব্রজ।

ব্রজ ফিরিল।

বাবাজী বলিলেন—বস। বাবাজীর মুখ দেখিয়া ব্রজ বিস্ময়ে শঙ্কায় অভিভূত হইয়া গেল। বাবাজীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে, আত্মসম্বরণের চেষ্টায় তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

ব্রজ পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না, বসিবার সামর্থ্যও হইল না।

হাতের আঙুল নাড়িয়া ইসারায় বাবাজী বলিলেন—বস।

ব্রজ বসিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর বাবাজী বলিলেন—আমার অপরাধের কথা তোমায় বলব বলে ডাকলাম। বস।

ব্রজ আক্ষেপ করিয়া হাসিয়া মনে মনেই বলিল—আপনার অপরাধ! সে আর কতবার শুনব! প্রায়ই বাবাজী বলেন—শিক্ষার দোষ আমার, আমি ঠিক দিতে পারলাম না বলে নিলে না।

বাবাজী বলিলেন—তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ, অনেক অপরাধ। দুলাল মহেশের সন্তান নয়, ও আমার পাপ!

ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল—শব্দহীন কণ্ঠে প্রশ্বাস দিয়া সে বলিয়া উঠিল—প্রভু!

—হ্যাঁ ব্রজ। ও আমার পাপ। মহেশ ওর মাকে দেখে পাগল হয়ে উঠেছিল, তাকে ঘরে এনেছিল। কিন্তু ধর্মকে লঙ্ঘন করতে পারে নি। মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমার কাছে এসে পড়ল—বললে—আপনি আমার গুরু—আমাকে রক্ষা করুন, ত্রাণ করুন। আমি তাকে পরিত্রাণ করতে মেয়েটিকে আশ্রয় দিলাম—এই আখড়ায়। মানুষকে পরিত্রাণ করা সহজ নয় ব্রজ;, পরকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজেকে বন্দী হতে হয়, পরকে ঠেলে তুলতে নিজেকে নীচে নামতে হয়। আমি পড়লাম, আমি—।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ও যখন তার দেহের মধ্যে এল—তখন তার আনন্দ দেখে আমি ওকে নষ্ট করতে পারি নি। নইলে—। অনেক যত্নে তাকে লুকিয়ে রাখলাম, ভাবলাম—সন্তান কোলে এলে—ওকে দূরে-দূরান্তরে সরিয়ে দেব। কিন্তু প্রসব করেই সে মারা গেল। অনেক ভাবলাম, অবশেষে মহেশকে ডেকে বললাম—তুমি আমায় ত্রাণ কর। ওকে শ্মশানে ত্যাগ ক'রে এস। মহেশ বলেছিল—শ্মশানে? বলুন কাউকে দিয়ে আমি পালন

করাই। আমি বলেছিলাম—না। পাপের দহন অন্তরে-অন্তরে সহ্য করা যায় ব্রজ কিন্তু মূর্তি ধরে পাপ এসে সামনে দাঁড়ালে তাকে সহ্য করা যায় না। মহেশ মাথা হেঁট ক'রে ওকে নিয়ে গেল। পরদিন ওর মায়ের সমাধি দিলাম এই আখড়ায়। ওকেও এইখানে সমাধি দিলেই ভাল হ'ত। কিন্তু জীবন্ত শিশু—বৈষ্ণবের আখড়া—তা পারি না। ওর মায়ের সমাধি শেষ হয়েছে—এমন সময় মহেশ এল—বললে—শ্মশানে কোল পেতে বসেছিলেন মা-যশোদা। আমার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মহেশ ওকে তোমার কোলে তুলে দিলে, আমি তোমার ওখানে গিয়েছিলাম—তোমার গান শুনতে নয়, তোমাকে দেখতে। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—তোমার পুণ্যে আমার পাপ মুক্তি পাবে। তাই মনের বাসনা সম্বরণ করেছিলাম প্রাণপণে, নইলে সেদিন সাধ হয়েছিল—তোমার হাত ধ'রে বলি—বৈষ্ণবী ওকে যখন কোলেই নিয়েছ—তখন আমারও হাত ধর, এস আমরা ঘর বাঁধি। আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—এই জন্যই যখন তুমি বলেছ—আপনার এখানে আমায় আশ্রয় দিন—আমি বলেছি—না।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল—দু'জনের কাহারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কল কল করিয়া পাখী ডাকিয়া উঠিতেই দু'জনের চমক ভাঙিল। সূর্য অস্ত গিয়াছে, চারিদিক হইতে গোল হইয়া অন্ধকার তাহাদের দুজনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। বাবাজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার কারণে তুমি কষ্ট পেলে—সেইটেই আমার আক্ষেপ—সেই আমার দেনা। নইলে—।

হাসিয়া বাবাজী বলিলেন—নইলে এ কষ্ট পেতেই হয়। আমার নিজের ছেলেকে দেখেছ তো। স্বদেশী ক'রে জেল খাটে;—তোমার দুলালও সেখানে যায়—শোভা দিদির কাছে। সে আমার কাছে সেদিন এসেছিল—এবার আবার নাকি খুব বড় একটা স্বদেশী মাতন আসছে। আমার কাছে এসেছিল দেখা করতে। বলে গেল—। এবার নাকি গুলি-গোলা চলবে। তাতে যদি মারা যায় তবে দেখা হবে না। আমার যন্ত্রণা তোমার চেয়েও বেশী। অনেক ভেবে পরিত্রাণের পথ পেয়েছি। আমি চলে যাব, প্রভুর আশ্রমেই যাব। পরিত্রাণ যদি চাও তবে তুমি—। আমার সঙ্গে যেতে বলব না। আমার যেতে দেরি হবে। তুমি দেরি ক'র না। মন যদি স্থির করতে পার, সঙ্গে সঙ্গে চলে এস, আমি তোমাকে টিকিট করে ট্রেনে তুলে দেব।

পনের

দুলাল প্রতিজ্ঞা করিল—সে আর ওই রাক্ষসীর কাছে ফিরিবে না। কিছুতেই না। তাহার গায়ে মদের গন্ধ পাইয়া সে তাহাকে কুষ্ঠ রোগীর মতো দূরে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গেল। রাস্তার উপর দুলাল লোকের হাতে লাঞ্ছিত হইল ঐ রাক্ষসীর জন্য। কখনও আর সে ওই বৈরাগিনীর মুখ দেখিবে না। মা হইয়াছে তো কি হইয়াছে? ঐ মায়ের জন্য তাহাকে কত ইঙ্গিত সহ্য করিতে হয়। লোকে তাহার মুখের সম্মুখে বলিতে সাহস করে না, আড়ালে বলে, অস্পষ্ট হইলেও তাহার কানে আসে। হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল; ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ওই রাক্ষসীকে গিয়া ধরে, বলে—বল—বল আমাকে আমার বাবার নাম? বল কেন বাবাজীকে

জড়াইয়া—ওই মোড়লকে জড়াইয়া লোকে তোর নামে বাঁকা হাসি হাসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে? কেন বল্ তুই আমাকে জন্ম-মাত্র মারিয়া ফেলিস নাই?

কয়েক পা গিয়া—আবার থমকিয়া দাঁড়াইল।—থাক। তোর জন্য সহ্য করিয়াছি। সে লইয়া তোর উপর কোন রাগ নাই আমার, কিন্তু তুই আমাকে মাথা মুড়াইয়া কণ্ঠী পরাইয়া বৈরাগী বানাইবি—কোথা হইতে একটা ভূতের মতো মেয়ে আনিয়া আমার গলায় গাঁথিয়া দিবি—তাহা আমি কোন মতেই সহ্য করিব না। তাহার উপর তুই আজ বিনা অপরাধে আমাকে অস্পৃশ্যের মতো ঘৃণা করিয়া পথের মাঝখানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলি, যা—তুই তোর পথে চলিয়া যা, আমি আমার পথে যাইব।

পথ খুঁজিতে গিয়া দুলালকে আবারও দাঁড়াইতে হইল।

বাসের আড্ডার পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ওই শিউচা আর ওই দেওকীর কদর্য হাসিভরা কুৎসিত মুখ মনে পড়িয়া গেল। রঙ্গিকে মনে পড়িয়া গেল। রঙ্গি আসিবে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে। না—সেও তাহার সহ্য হইবে না।

হঠাৎ সে বাঁ দিকের একটা পথ ধরিয়া হন হন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। আসিয়া উঠিল রাধাচরণের চরখার আখড়ায়। চীৎকার করিয়া ডাকিল—শোভা দিদি!

শোভা দিদি বাহির হইয়া আসিলেন।—কে? এ কি—দুলাল? এ কি চেহারা তোমার?

দুলাল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমাকে ধ'রে জোর করে মদ খাইয়ে দিলে।—ওই শিউচা, ওই দেওকী!

অবাক হইয়া গেলেন শোভা দিদি।

দুলাল আপন মনে অনর্গল বলিয়া গেল তাহার দুঃখের কথা। এক নিশ্বাসে সমস্ত কথা বলিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল, বলিল—আমাকে একটু ঠাঁই দাও শোভাদি। আমাকে যা বলবে তাই করব।

শোভা দিদি হাসিলেন—বলিলেন—না, তুমি বাড়ী যাও! তোমার মা কত দুঃখ পেয়েছেন বল তো।

দুলাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

—দুলাল!

—না। সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত মুঠা করিয়া আস্ফালন করিয়া বলিল—হাম ব্রিজনন্দন, কোইকে পরোয়া নেহি করতা হ্যায়। চলো মুসাফের—

বাহির হইয়া সে চলিতে শুরু করিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই। কিন্তু ব্রিজনন্দন কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। দুনিয়াতে কাহাকেও ভয় করে না, কিছুকেও ভয় করে না। আপন মনেই সে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল—বন্দেমাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, গান্ধীজী কি জয়, সুভাষবাবু কি জয়, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক; আপ্-আপ্ ন্যাশানাল ফ্ল্যাগ, মারো ডাণ্ডা তোড়ো দুনিয়া! শালা মার ডালো—। বনমে যায়ে গা—বাগ মারে গা—হাতীকে দাঁত তোড়ে গা।

বনে যাইবে—বাঘ মারিবে—হাতীর দাঁত ভাঙিবে—নগরে যাইবে—রাজাকে মারিবে—উজীরকে মারিবে। নদীতে ডুবিয়া কুমীর সে মারিয়াছে। এমনি সব অর্থহীন চীৎকার করিতে করিতে পাগলের মতই সে চলিল।

মানগোবিন্দপুর পার হইয়া চলিল সে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। হোক। সারা রাত্রি

পথ চলিবে। সদর রাস্তার পথ নয়। পদচিহ্নহীন মাঠের প্রান্তরের পথে। যে পথে লোকের সঙ্গে দেখা হইবে না। কাহারো কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে না। রক্তে যেন তাহার বান ডাকিয়াছে—মদের প্রভাব আর তাহার নাই, কিন্তু অদ্ভুত উত্তেজনা তাহার শিরায় শিরায়।

হঠাৎ সে একটা শব্দ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

কে যেন কিসে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে!

ঠুই-ঠুই-ঠক্-ঠক্। ঠুই-ঠুই-ঠক্-ঠক্।

সামনে ঘন জঙ্গল।

দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া দুলাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।—কোথায় আসিয়াছে সে?—এ তো—! এ তো বাগ্দীপাড়ায় নদীর ধারের জঙ্গল—! এটা তো শ্মশানটা! ওই তো সামনেই রতন পাগলার পাথর বুড়ীর আস্তানা।

অবিরাম শব্দ উঠিতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠুই—ঠুই!

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কে রে?

ওদিক হইতে রতন বুড়ার হুঙ্কার উঠিল—নিকাল! নিকাল!

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া বলিল—এও—পাগ্‌লা!

প্রচণ্ড জোরে আঘাতের শব্দ উঠিল—ঠক্—ঠক্—ঠুই—ঠুই। সঙ্গে সঙ্গে রতন হাঁক দিল—নিকাল! আভিনিকাল!

দুলাল রতনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বুড়া শয়তান—! সকল আক্রোশ যেন তাহার উপর গিয়া পড়িল। অসুস্থ মস্তিষ্কে মুহূর্তে তাহার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠিল—রতন বুড়াকে, মহেশ মণ্ডলকে, আর ওই বাবাজীটকে আজই রাত্রে মারিয়া সে ফেরার হইবে। তারপর দেশান্তরে—বনে হোক—নগরে হোক চলিয়া গিয়া সে বাস করিবে। বায়ুমণ্ডলে একটা ঘুষি চালাইয়া সে বলিল—যেখানে গিয়ে ডাণ্ডা গেড়ে বসব—সেইখানেই হম্ র‍্যজ বনায়েগা। চলো মুসাফের! সে শ্মশান পার হইয়া আসিয়া উঠিল—রতন ক্ষ্যাপার পাথর বুড়ীর আশ্রমে।

সে অবাক হইয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে পাগল। সেই আগুনের লালচে আলোয় পাগলকে দেখাইতেছে প্রেতের মতো; চোখ দুইটা কুঁচ ফলের মতো লাল—তাহাতে এক বিচিত্র ভয়াল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, সর্বদেহের পেশীগুলি দড়ির মত শক্ত এবং প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। একটা হাতুড়ি লইয়া ওই পাথরটার উপর আঘাত করিয়া প্রকাণ্ড বড় পাথরটাকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে কুড়ুল লইয়া আঘাত করিতেছে শিমুলগাছটার গোড়ায়—আর চীৎকার করিতেছে—নিকাল—নিকাল!

বাগ্দীপাড়ার লোকগুলি সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া সারিবদ্ধ মাটির পুতুলের মতো দূরে দাঁড়াইয়া আছে। নিস্পন্দ নির্বাক।

দুলাল ডাকিল—এই বুড়ো—। ও কি হচ্ছে?

রতন গর্জন করিয়া উঠিল—ক্যা-ও! হাতের কুড়ালখানা ফেলিয়া দিয়া আগাইয়া আসিল—

—তুই এখানে কেন রে—বৈরেগীর বাচ্চা?

—হচ্ছে কি?

বাগ্দী বুড়ী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—সরে আয় দুলাল, সরে

আর। আজ ওর মা জাগবে। পাথর ভেঙেছে, মা বেরিয়ে গাছে লুকিয়েছে—গাছ কেটে মাকে বের করবে রে!

দুলাল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুড়াও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—এই ঠিক হয়েছে! তোকে বলিদান দিলেই মা জাগবে! শ্মশানে বষ্টুমী মায়ের কুড়নো ছেলে—বুড়ীও হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

* * *

রাত্রির অন্ধকারে দুলাল আসিয়া আখড়ার উঠানে দাঁড়াইল। প্রেতের মত মূর্তি হইয়াছে তাহার। চোখ দুইটা জ্বলিতেছে। দাঁতে দাঁত ঘষিতেছে নিষ্ঠুর আক্রোশে।

ডাকিল—মা!

কেহ উত্তর দিল না।

আবার সে ডাকিল—মা!

কোন সাড়া পাইল না। সে এবার দরজায় ধাক্কা দিল। বন্ধ দরজার তালা শব্দ করিয়া উঠিল। কোথায় গেল?

যেখানে যাক্, ফিরিবে তো! দুলাল মায়ের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজদাসীর কাছে সে কৈফিয়ৎ চাহিতে আসিয়াছে। রতন পাগল তাহাকে বষ্টুমী মায়ের কুড়ানো ছেলে বলিয়াছে। শুনিয়া সে উন্মত্তের মতো অতর্কিতে বুড়াকে চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া বুকে বসিয়া বলিয়াছিল—বল, কি বললি?

বুড়া ভয় পায় নাই। বুড়া তাহাকে বলিয়াছে—মহেশের বেজাত পুত্র সে। শ্মশানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছিল—বৈষ্ণবী তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া মানুষ করিয়াছে।

দুলাল স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

বুড়াকে ছাড়িয়া দিয়া সে পলাইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, পথ হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ব্রজদাসীর কাছে। জিজ্ঞাসা করিবে—কথাটা সত্য কিনা! সত্য যদি হয়—তবে কেন সে তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছিল! কেন—কেন?

—কে?

ব্রজদাসীর শঙ্কিত কণ্ঠস্বর। কতক্ষণ দুলালের খেয়াল ছিল না, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রজদাসী আবার প্রশ্ন করিল—দুলাল!

দুলাল যে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিবে—এমনই একটা প্রত্যাশা লইয়া সে আখড়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। সেও যে ফিরিতেছে ওই বাগ্দীপাড়া হইতে।

বাবাজীর স্থান হইতে ফিরিয়া সে বৃন্দাবনে যাইবার উদ্যোগই করিতেছিল।

মহেশকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া বলিয়াছিল—তুমি দেবতা! তোমাকে আমি অনেক কটু বলেছি, আমাকে তুমি মাপ কর। বাবাজী আমাকে সব বলেছেন।

মহেশ বিষণ্ণ হাসিয়া বলিয়াছিল—আপনি আমার মহাপাতক ঘটালেন মা-জী! আপনার প্রণাম নেবার মত লোক আমার চোখে দেখি নাই। গুরুর কলঙ্ক মাথায় নিয়েছিলাম—তাতে আমি সুখ পেয়েছিলাম মা-জী। তাকে আমি বড় ভালবাসতাম। তার সন্তান!

বেচারী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

ব্রজ বলিয়াছিল, দুলালের ভার তা হ'লে তোমার ওপর রইল।

—সে কি? আপনি—

—আমি বৃন্দাবনে যাব। কাল সকালেই। বাবাজী আদেশ করেছেন, আমারও মন উঠেছে।

হাত জোড় করিয়া মহেশ কি বলিতে গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজ হাত দুটি জোড় করিয়া বলিয়াছিল।—কিছু বলবেন না, আমার আর সহ্যশক্তি নাই!

মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চলিয়া গিয়াছিল। ব্রজ বলিয়াছিল—বৃন্দাবনে যাইবার আয়োজন করিবে। কি-ই বা আয়োজন! খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিল—পুরাতন ঝোলাটি। সে ঝোলাটির ভিতরের জিনিসগুলি তেমনি আছে। ওটি সে নাড়ে নাই। একবার ঝোলার মুখ খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দুই একটা পুরানো জিনিস পাল্টাইয়া লওয়া, পুরানো আয়নাখানা আজ ষোল বৎসরে অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছিল, সেখানা বাহির করিয়া দিয়া—নূতন আয়না লওয়া, পুরানো তেলের শিশি পাল্টানো, তিলক মাটি পুরানো চন্দনকাঠ টুকরাটাও বদলাইতে হইল। দুইখানা নূতন কম্বল, একটা বালিশ—।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়াছিল—কে?

মহেশ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়াছিল—মা-জী, রতন পাগলের নাকি শেষ অবস্থা!

—সে কি?

—হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি। যাবেন দেখতে?

—যাব। কিন্তু হঠাৎ কি হল?

—লোকে বলছে গাছ চাপা পড়েছে।

—গাছ চাপা!

—হ্যাঁ। বলছে—গাছ কেটে মাকে বের করতে গিয়েছিল—যাবে তো এস।

—চল।

ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল ব্রজদাসী। যাইবার আগে রতনবাবার পায়ের ধূলা লইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল।

রতন পাগল গাছ, চাপা পড়িয়াছে। গাছ কাটিবার সময় দুলাল আসিয়া বাধা দিয়াছিল। দুলাল চলিয়া যাইবার পর—উঠিয়া কুড়ালখানা কুড়াইয়া লইয়া একবার তাহার পিছনে ছুটিবার উদ্যোগ করিয়াছিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গাছে কোপ মারিয়া বলিয়াছিল—ছলনা—আমার সঙ্গে ছলনা! ওই বৈরেগীর বাচ্চাকে পাঠিয়ে আমাকে ভুলাবি? ওর পিছনে ছুটব আর তুই এদিকে পিটটান দিবি?

কয় দিন হইতে রতন উন্মাদ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। এবার তাহার উন্মত্ততার ধারা অন্য রকম। অন্য অন্য বারে সংসারের সকলকে কাটিবার ঝোঁক লইয়া হইত। এবার সে দিন-কয়েক ওই মায়ের স্থানে আহার নিদ্রা ছাড়িয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া ছিল না, শুধু গাঁজা খাইয়াছে আর চীৎকার করিয়াছে। দু'দিন হইতে চীৎকার করিয়া গোটা আমবাগানময় ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যায় হঠাৎ বাড়ী আসিয়া বলিয়াছিল—হাতুড়ি দেখি—হাতুড়ি!

হাতুড়ি হাতে করিয়া গোটা পাড়ায় ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল—আজ রাতে মাকে বার করব। খবরদার কেউ বাইরে বেরুবি না। খবরদার! খবরদার!

গাঢ় অন্ধকার-ভরা কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। লোকগুলি জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ছেলেরা কাঁদিলে সভয়ে মুখচাপা দিয়া বলিয়াছে—চুপ! ওদিকে গাঢ় অন্ধকারের

মধ্যে জমাট অন্ধকারের একটা স্তূপের মত ওই আমবাগানটার মধ্যে অনবরত সমানতালে দুইটা কঠিন বস্তু সংঘর্ষের শব্দ উঠিতেছে, ঠুই—ঠুই ঠুই—ঠুই!

মধ্যে মধ্যে রতন পাগলের হিংস্র চীৎকার উঠিতেছে—নিকাল! নিকাল!

কখনও কখনও চীৎকার করিতেছে—অ্যা-ই।

হাতুড়ি মারিয়া সে যেন আঁধার ঘরের লোহার কপাটে হানা দিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর শব্দ থামিল। পাগল ফিরিয়া আসিয়া কুড়াল লইয়া বাহির হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল—আয় সব দেখবি আয়।

ফিরিয়া গিয়া আগুন জ্বালিল। আগুনে জঙ্গলটা আলো হইয়া উঠিল। পাড়ার লোক সভয়ে আসিয়া দূরে দাঁড়াইল—সারিবদ্ধ মাটির পুতুলের মত।

পাগল গাছ কাটিতেছিল, হঠাৎ কুড়াল চালানো বন্ধ করিয়া বলিল—বেরিয়েছিল।

অর্থাৎ পাথরের মধ্যবর্তিনী তাহার ইষ্ট দেবী।

—বেরিয়েছিল। পাথরটা ভাঙলাম, বেরিয়ে ঢুকে গেল শিমুল গাছটার গোড়ায়। এইবার গাছটা কাটব। নইলে গেল কোথা? যাবে কোথা?

সাধারণ মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর কি দিবে। পাগল গাছ কাটিতে শুরু করিয়াছিল।

দুলাল চলিয়া যাইবার পর সে দ্বিগুণ উৎসাহে গাছের উপর কুড়াল চালাইল। বার বার বলিল—বৈরেগীর বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে আমাকে ছলনা!

দেখিতে দেখিতে মড়মড় শব্দ উঠিল।

পাগল গাছটা পড়িবার দিক ঠাওর করিতে ভুল করিল না, বিপরীত দিকেই সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—নিকাল! অব্ নিকাল!

মুহূর্তে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল—বড় গাছটা পড়িবার সময় আর একটা গাছের উপর পড়িল—সেই গাছটার একটা ডাল আছাড় মারিয়া পড়িল পাগলের উপর।

মুমূর্ষু অবস্থা—এখনও কিন্তু চীৎকার করিতেছে মধ্যে মধ্যে—নিকাল!

নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণার মধ্যেও রক্তাক্ত পিষ্ট বিকৃত-মূর্তি পাগল কঠোর মুষ্টি প্রসারণ করিয়া কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল। শেষ হাতটা পড়িয়া গেল—বাঁকানো আঙুলের খোলা মুঠি মেলিয়া।

কে যেন বলিল—দে হাতে পাথর দিয়ে দে। বল—এই তোমার আপনার। এই নিয়ে যাও তুমি। ছেলে-পিলে যারা রইল—তাদের দিকে হাত বাড়িয়ো না। কিন্তু কেহই সে সাহস করিল না। ও মুঠির মধ্যে যাহাকে পাইবে—তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার শক্তি বোধ করি যমেরও হইবে না। মরিলেও মুঠি খুলিবে না।

বৈষ্ণবী পাড়ার প্রান্ত হইতেই ফিরিল। দেখিবার শক্তি হইল না তাহার। সে তাহার বাপের চেয়ে বেশী স্নেহশীল ছিল। একদিন গরুড়ের মত পক্ষ মেলিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। বনবাসের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিল সেকালের মুনিঋষির মত। তাহার এ শেষ দশা দেখিবার মত শক্তি সে সংগ্রহ করিতে পারিল না।

বাগ্দীবুড়ী বলিল—ভাগ্যে দুলাল পালিয়েছিল মা! নইলে—তাকে নিয়েই ও যেত। তাকে আর কুবাক্যি বলতে বাকী রাখে নাই। বললে মহেশের—ওই মোড়লের, ছি—ছি—ছি—।

সব শুনিয়া ব্রজর মনে হইয়াছিল—সে আসিবে। সে হয়তো রতনের মতই আজ তাহাকে কাটিয়া—খুঁজিয়া দেখিবে তাহার মা-কে সে পায় কি না।

অন্ধকারে আখড়ায় ঢুকিয়াই দেখিল উঠানে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। তবু সে প্রশ্ন করিল—কে ?

দুলাল এবার ফিরিয়া দাঁড়াইল—

—দুলাল ?

চীৎকার করিয়া উঠিল দুলাল—কোথা গিয়েছিলি ?

—রতনবাবাকে দেখতে।

আবার দুলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—রতন পাগল আমাকে ও কথা বললে কেন ? তুই আমার মা নোস ?

ব্রজ ভাবিয়া পাইল না কি উত্তর দিবে ! অন্ধকারের মধ্যেও দুলালের মুখ সে দেখিতে পাইতেছে। অন্ধকার যেটুকু অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে তাহার অন্তরের মমতায় প্রদীপের আলোয় সেটুকু স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; তাই বা কেন—ওই আলোতে শুধু দুলালের বাহিরটাই না—ভিতরটাও দেখিতে পাইতেছে। দুলালের চোখে আগুন জ্বলিতেছে—কিন্তু ব্রজ দেখিল—ওই আগুনের মধ্যে চোখের জলের ঢেউ উঠিয়াছে। দুলালের ওই কর্কশ রূঢ় চীৎকারের অন্তরালে বুক-ফাটানো আর্তনাদ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সে কি করিয়া বলিবে ? আজ তাহার সত্য বলাই উচিত। কাল সে যাত্রা শুরু করিবে; দীর্ঘকাল পূর্বে পিছনে ফেলিয়া আসা পথের উদ্দেশে সে চলিতে আরম্ভ করিবে—আজ সকল মিথ্যার ঘর পৃথিবীর সম্মুখে খুলিয়া দিয়া সব দায় চুকাইয়া দেওয়াই উচিত। দুলাল আসুক—তাহার পরিচয়, সে যদি আজ বলে কেন তুই আমাকে কুড়াইয়া বাঁচাইয়াছিস্ ? তবে সে বলিবে—ওরে আমি যে বৈষ্ণবী, জাত আমার কাছে বড় নয়—জীব আমার কাছে সব চেয়ে বড়, তাই জাতিবিচার করি নাই, তাই আমার স্বর্গের পথে চলায় ছেদ টানিয়া তোকে শ্মশান হইতে কুড়াইয়া এত বড় করিয়াছি—তুই এখন যা—আপন পথে চলিয়া যা, আজ আমার মুক্তি। আমি আজ প্রভুর নাম লইয়া আমার পথে চলিলাম। আমি তোকে গর্ভে ধরি নাই, তবে প্রতারণা তোকে করি নাই, তোর মা বোধ হয় আমার বুকেই বাসা বাঁধিয়া আছে, বিশ্বাস না হয়—তুই আমাকে হত্যা কর।—ওই রতন-বুড়া পাথর ভাঙিয়া যেমন তাহার মাকে খুঁজিয়াছে—তেমনি করিয়া আমাকে খুন করিয়া দেখ—রতনের পাথরের মায়ের মত তোকে আমি ঠকাইব না, তুই তোর মাকে খুঁজিয়া পাইবি।

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—মা ! বল !

ব্রজ এবারও উত্তর দিতে পারিল না। সে চোখে দেখিতে পাইতেছে দুলাল ছুটিয়া পলাইতেছে—অন্ধকারে প্রান্তরের মধ্য দিয়া—

—মা ! তোর পায়ে পড়ি—বল্ বল্।

এবার মৃদুস্বরে ব্রজদাসী বলল—কি বলব ?

—তুই আমার মা নোস্ ?

ব্রজ বলিতে গেল—না। কিন্তু অকস্মাৎ কি যেন একটা জমাট-বাঁধা বস্তু বুক হইতে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিল—প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল, সে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দুলাল তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—তুই কাঁদছিস ? তবে তুই—তুই—

ব্রজদাসী দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তুই আমার ছেলে দুলাল,—আমি তোকে গর্ভে ধরেছি বাবা। দশ মাস দশ দিন—

দুলালের চোখের আগুনের অন্তরালে সত্যই জলের পাথার ছিল—আগুন নিভাইয়া সে

পাথার এবার উথলিয়া উঠিল—বলিল, তবে—তবে কেন বুড়ো—

—পাগল,—পাগলের কথা বাবা। নইলে পাথর ভেঙে দেবতা বের করতে যায়!

—না-না, তুই মিছে কথা বলছিস। আমার জাত নাই। আমার মা, সে—

—আমি তোর মা।

ব্রজদাসীর চোখে এবার আলো জ্বলিয়া উঠিল যেন।

দুলাল বলিল—তুই অমন ক'রে তাকাচ্ছিস কেন?

—আয়, আমার সঙ্গে আয়।

—কোথায়?

—আয়। সে মন্দিরের দুয়ার খুলিল। প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিল—শোন, এই আমার প্রভু সামনে, বল্ ওঁর সামনে তোকে যদি বলি—বিশ্বাস হবে তোর?

বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল দুলালের মুখ।

—শোন্—আমি তোর মা। আমার গর্ভে তোর জন্ম। পথে গাছতলায় তোকে আমি প্রসব করেছিলাম।

—আমার বাবা? লোকে পাঁচজনে গুজ-গুজ করে—

—আমার স্বামী তোর বাপ।

—সে তোর স্বামী?

—হ্যাঁ। স্বামী—

—কে? আমার বাবা? ওই—ওই মোড়ল?

—গোবিন্দ! গোবিন্দ! না—না—

—তবে? ওই বাবাজী?

ব্রজ দুলালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

—বল্?

ব্রজ বলিল, বলিল ঠিক নয়, বলিয়া ফেলিল, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়াই বলিয়া ফেলিল—হ্যাঁ।

—তবে—। দুলাল কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল।

ব্রজ বুঝিল। সে বলিল—আমরা দুজনে বৈষ্ণবের সাধন পথে মিলেছিলাম বাবা। তারপর সে পথে—ওই রতনের মত—আমাদেরও হ'ল পতন। তুই এলি আমার বুকে। লজ্জায় আমি ওকে ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলাম। তারপর—

মিথ্যার পর মিথ্যা জুড়িয়া সে বলিয়া গেল। সে মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিবার ভার মন্দিরের দেবতার পায়ে সমর্পণ করিয়া মনে মনে বলিল—সকল সাজা তুমি আমাকে দিয়ো। দুলালকে এ নিষ্ঠুর সত্যের আঘাত দিতে আমি পারব না, পারব না, পারব না!

দুলাল হঠাৎ উঠিয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—বাবার কাছে।

ব্রজদাসী মন্দিরের দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। বলিল—আর আমি পারছি না দুলাল। আমাকে আজ তুই ক্ষমা কর, বাবা!

—তবে আমি চললাম।

—কোথায়?

—তার কাছে।

সে সেই অন্ধকার কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রেই বাহির হইয়া গেল। ভয় তাহার নাই। সে দুর্দান্ত —প্রচণ্ড তাহার দেহ—তাহার উপর প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি ব্রজদাসী তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। কোন প্রার্থনা জানাইল না। মন মস্তিষ্ক সব যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে তাহার।

অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়েও গাঢ় অন্ধকার চোখ বন্ধ করিয়া আপনার চারিপাশে সৃষ্টি করিতে পারে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে পড়িয়া রহিল।

পৃথিবী নিস্তব্ধ।

কতক্ষণ পর কে জানে—নিস্তব্ধ অন্ধকার পৃথিবীতে যেন প্রথম আলোকরেখার স্পর্শ লাগিল। ব্রজ অনুভব করিল, কে যেন তাহার কপালে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে—মৃদু সে স্নেহ, সে স্পর্শ। হাতখানা কঠোর কর্কশ, কিন্তু সেই হাতেরও স্পর্শটুকু মধুর, পাছে কর্কশ হাতের রূঢ়তা আঘাত করে—তাই মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইতেছে।

—মা!—দুলাল ফিরিয়াছে।

—বাবা!

—আমি মদ খাই নি মা। ওরা আমাকে জোর ক'রে—। ছোট ছেলের মত দুলাল কাঁদিতে শুরু করিল।

—কখনও খেয়ো না বাবা। বৈষ্ণবের ছেলে তুমি—। আমি কাল চ'লে যাব, তোমার নিজের ভাল মন্দ—

—চলে যাবি? কোথায়? চীৎকার করিয়া উঠিল দুলাল।

—আমি বৃন্দাবনে যাব বাবা।

—না। না। না। দুলাল এবার উপুড় হইয়া মায়ের বুকের উপর ভাঙিয়া পড়িল। আমি আর—আর—। সে কথা বলিতে পারিল না—শুধু দীর্ঘ হাতখানা প্রসারিত করিয়া ব্রজদাসীর পায়ে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

—পা ছাড়, দুলাল।

—না। এবার সে বলিল—তোর পায়ে হাত দিয়ে বলছি। তুই যা বলবি—আমি শুনব।

ব্রজ এবার উঠিয়া বসিল। দুলালের কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—গিয়েছিলি? দেখা হ'ল?

প্রশ্নের মর্ম বুঝিতে দুলালের বিলম্ব হইল না। সে বলিল—না।

—কেন?

—না। পথ হ'তে ফিরে এলাম। একটু নীরব থাকিয়া দুলাল বলিল—না। তাকে আমার দরকার নাই। আমরা বেশ আছি। তুই যা বলবি আমি শুনব। শুধু—

—কি? বল্?

—বিয়ে আমি করব না। না।

—বেশ। ব্রজ হাসিল। ষোল বছরের দুলাল—তাহার মনে বিবাহের সাড়া আজও জাগে নাই।

ষোল

ব্রজদাসী থাকিয়া গেল।

তাহার গোপালের আশ্রম—সত্য এবং প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। দুলাল মস্তক মুণ্ডন করিয়া গলায় কণ্ঠী ধারণ করিয়া কপালে তিলক আঁকিল। ব্রজদাসীই তাহাকে বহির্বাস পরিতে দিল না, নহিলে সে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল। ব্রজদাসী গোপালের গৃহদ্বারে লুটাইয়া পড়িয়া আনন্দে চোখের জলে গৃহদ্বারের সম্মুখটুকু মার্জনা করিয়া দিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী কিন্তু চলিয়া গেলেন।

বলিলেন—আমার ডাক এসেছে। আর থাকব না আমি।

ব্রজদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—মানগোবিন্দপুরের আখড়ার ভার তুমি নাও। তোমার দুলালকে তুমি দিয়ে যাবে।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিল—না। আমি গোপালকে ছেড়ে যাব না। মানগোবিন্দপুরকে আমি ভয় করি।

বাবাজী বলিলেন—তবে মহেশকে ভার দিয়ে যাচ্ছি। দুলাল যদি—

—যদি? যদি কেন বলছেন?

—বলব না। দুলালকে সে-ই বুঝিয়ে দেবে। তুমি কিন্তু দুলালের শিগ্‌গীর বিয়ে দিয়ো।

হাসিয়া ব্রজ বলিল—বিয়ে ও করবে না এখন। সেইটুকু আমি শপথ করেছি ওর কাছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাবাজী বলিলেন—তুমি নিজের পথ ধরলেই ভাল করতে ব্রজ।

দুলালকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিলেন—নীরবে, কোন কথা বলিলেন না, শুধু চোখ হইতে দু'ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

দুলালও কোন কথা বলিল না।

ব্রজ শেষ ক্ষণটি মুখর করিয়া তুলিল, বলিল—চলুন আপনি এগিয়ে, আমরা মা-বেটায় যাব একবার শ্রীধামে, আপনার সঙ্গে যে বোঝাপড়া বাকী রইল, সে সেইখানে হবে। দেখবেন, দুলাল কেমন নিষ্ঠাবান হয়েছে।

বাবাজী হাসিলেন। বলিলেন—তোমার অসম্পূর্ণ সোনার কলস দেওয়া মন্দির এবার সম্পূর্ণ হোক।

সে মন্দির ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। আর বোধ হয় সামান্য বাকী।

দুলাল, দুর্দান্ত দুলাল পাল্টাইয়া যাইতেছে। ভোরে উঠিয়া স্নান করে, ফোঁটা তিলক কাটে, সে-ই ফুল তোলে; তাহার মা তাহাকে গৃহমার্জনা করিতে দেয় না। তাহার পর সে ফুলগাছগুলির পরিচর্যা করে। বৈষ্ণবী ভিক্ষায় বাহির হয়, দুলাল ঐটুকু পারে না।

বলে—না মা। ও পারব না। না। আমি—

সে যে কি বলিতে চায় বলে না, ব্রজদাসী তাহা বুঝিতেও চায় না। সে যতদিন আছে ততদিন কোন চিন্তা নাই। তাহার গান শুনিয়া লোকে দু হাত ভরিয়া দেয়, সে সেই দু হাতের ভিক্ষার এক হাতেরটুকু সঞ্চয় করিয়া যায়—দুলালের জন্য।

দুপুরে দুলাল একা বসিয়া থাকে। আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। পায়ে শিকল বাঁধা বাজপাখীর মত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

মধ্যে মধ্যে মেল ট্রেনের শব্দ আসে। কখনও কখনও মানগোবিন্দপুরের প্রান্তভাগের মজা দীঘির ঘাটে মোটর বাসগুলাকে ধুইতে আনিয়া ইলেকট্রিক হর্ন বাজায়—তাহার শব্দও সে শুনিতে পায়। সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে এ শব্দগুলো—শব্দবৈচিত্র্যের মধ্যে হারাইয়া যায়, তাহার কাছে এ শব্দ হারায় না।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসে।

তাহার পরই বলে—ধু—বৃ। ভা—গ্!

মধ্যে মধ্যে শোভা দিদিকে মনে পড়ে। মনে মনে প্রণাম জানাইয়া বলে—তোমাকে প্রণাম—শত কোটি প্রণাম! তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তোমার ছায়া আর আমি মাড়াব না। সে অস্থির হইয়া উঠে। শোভা দিদি! অকৃতজ্ঞ শোভা দিদি! বুকটা কখনও কখনও ফুলিয়া উঠে তাহার। আজও ফুলিয়া উঠিল।

—দুলাল!

ভিক্ষা হইতে মা ফিরিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—গোবিন্দ! গোবিন্দ! তারপর উঠিয়া বাহিরের আগড় খুলিয়া দিয়া বলিল—আজ এত সকালে ফিরলে মা?

সে অবাক হইয়া গেল, ব্রজদাসীর সঙ্গে একটি বিধবা ও একটি কিশোরী। ভোলাদাসী ও তাহার কন্যা। মা বলিল—ওরা আখড়া দেখতে এসেছিল। ব'স ভাই—ব'স। এইটি আমার ছেলে।

—বাঃ, এ যে চমৎকার ছেলে গো! লোকে যে বলে কালো!

সত্য কথা—বৈষ্ণব হইয়া ব্রজদাসীর প্রত্যাশা মত একটি মিষ্ট শান্ত শ্রী দেখা দিয়াছে দুলালের সর্বাঙ্গে। সে কালো—কিন্তু সে শান্ত স্নিগ্ধ।

দুলাল লজ্জিত হইয়া একটু হাসিল।

মেয়েটিও মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বেশ মেয়েটি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত ধূলিমলিন নয়, দীপ্তি আছে। তবে দুলালের চোখ এড়াইল না, এ দীপ্তি সূর্যের দেশের মানুষের নয়। এ মেয়েকে—চাঁদের দেশের বলা চলে। দুলাল বইতে পড়িয়াছিল—চাঁদের নিজস্ব কোন দীপ্তি নাই, সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে, তাহাতেই প্রতিফলিত হইয়া উঠে চাঁদের দীপ্তি। মেয়েটি নকল করিয়াছে। তবুও ভাল লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া অনেক পান চিবাইয়া ভোলাদাসী মেয়েকে লইয়া চলিয়া গেল। ব্রজদাসী বলিল—তোকে মেয়ে দেখাতে এনেছিল। আমি নিজে কিছু বলি নি বাবা। ওরা নিজেই এসেছিল।

দুলাল হাসিয়া বলিল—মেয়ে ভাল।

—বিয়ে করবি?

—দেখি ভেবে।

আকাশে মেঘ জমিয়াছে। বর্ষা নামিবার লক্ষণ চারিদিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বৈশাখের প্রখর প্রদীপ্ত নয়, বর্ষার অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ক্ষীণ। কিছুক্ষণ পর ঘন গম্ভীর গুরু-গুরু ধ্বনি আকাশ ছাইয়া বাজিয়া উঠিল। খালে ব্যাঙ ডাকিতেছে। অনেক ব্যাঙ একসঙ্গে ডাকিতেছে। কোন ঝোপে বসিয়া বনকাক ডাকিতেছে—কুক্—কুক্—কুক্—কুক্। ছোট চাতক পাখীগুলা শূন্যমণ্ডলে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

গুর্-গুর্-গুর্-গুর্-গুর্-গুর্ ধ্বনির আর বিরাম নাই।

মেঘের ডাক নয়। এরোপ্লেন। একখানা এরোপ্লেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুলালের মনে পড়িল যুদ্ধ চলিতেছে।

আখড়ায় বসিয়া সব হারাইয়া গিয়াছে। সন তারিখও হারাইয়া গিয়াছে। ইংরাজী বিয়াল্লিশ সাল এটা। মাস শ্রাবণ। ইংরাজী কোন্ মাস সে জানে না।

প্লেনখানা চলিয়া গেল।

এরোপ্লেন লুঠ করিয়া বোমা ফেলিয়া ইংরাজের সঙ্গে লড়াইয়ের সাধ ছিল একসময়।

—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

তারপর ডাকিল—মা!

—কি?

—কি করছ?

আজকাল দুলাল আর তুই-তুকারি করে না। ভাষাকে সে সংযত সংস্কৃত করিয়াছে।

—যাই।

—আসতে হবে না। তুমি কর বিয়ের সম্বন্ধ—

—করব?

—হ্যাঁ, কর। বলিয়া দুলাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

আকাশের প্লেনটা যেন অনেকটা নীচে নামিয়া পড়িয়াছে—ওই—ওই—ওইখানে। ওই মাঠের ওপারে—ময়ূরাক্ষীর তীরের জঙ্গলের মাথায় ওই—ওই লাট খাইতেছে। হ্যাঁ, লাট খাইতেছে।

থাক। সে আর যাইবে না।

তাহার অন্তরের সমস্ত তৃষ্ণাকে সে অবরুদ্ধ করিয়াছে। ও বড় পাজী নেশা। দুনিয়াকে আর এক রকম করিয়া দেয়। ছুটিয়া চলে, স্থির মাটি। যে মাটি, ক্ষেত-খামার গাছ-পালা বুকে লইয়া শান্ত স্থির ধরিত্রী—সে লাগাম-কষা, চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে, থামে না। বাসের পাশের ডাণ্ডা ধরিয়া এক হাত বাড়াইয়া পৃথিবীর মুখের লাগাম ধরিয়া সে অনেক ছুটাইয়াছে, নিজেও ছুটিয়াছে। আর না। মা যাহা চায় সে তাই করিবে। নহিলে সে—সেই বিরিজনন্দন ডাণ্ডা লইয়া বনে গিয়া বাঘ মারিয়া—হাতীর দাঁত উপড়াইয়া—বনকে ভয়শূন্য করিয়া বন কাটিয়া নগর গড়িতে পারিত। কিম্বা রাজাকে মারিয়া কোতোয়ালকে বাঁধিয়া রাজকন্যাকে লুটিয়া লইয়া পলাইতে পারিত।

চল, বাড়ী ফিরিয়া চল।

জোর বাতাস উঠিয়াছে। বাতাস নয়, ঝড়। আকাশে কালো মেঘের পুঞ্জগুলা ফুলিয়া বড় হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত বেগে নৈঋর্ৎ কোণ হইতে অগ্নিকোণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বর্ষার ঝড়ো বাতাসে মাথার লম্বা বাবরি চুলগুলো চোখে কপালে আছাড় খাইতেছে। রাত্রে নিশ্চয় মুষলধারে বর্ষা নামিবে। পাতা খড় উড়িয়া মুখে চোখে সর্বাঙ্গে লাগিতেছে। খানকয়েক কাগজ আসিয়া তাঁহার বুকে আটকাইয়া গেল। বাতাসের যেন বেগে আঁটিয়া লাগিয়া গিয়াছে। হাত ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিতে গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

লাল হরফে মোটা অক্ষরে ছাপা কাগজ।

মাথায় লেখা—বিপ্লব—বিপ্লব—বিপ্লব।

আরও অনেক কথা। নীচে নাম রহিয়াছে শোভা সেন।

দুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। বুকখানার ভিতর মেঘের ডাকের প্রতিধ্বনি উঠিল।* একটা বিপুল শক্তি প্রচণ্ড আলোড়নে যেন আবর্তিত হইয়া উঠিল।

* * *

ব্রজদাসী চারিদিকে খুঁজিয়া অধীর হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে, দুলাল ফেরে নাই। সেই 'আসি' বলিয়া বাহির হইয়াছে। আকাশ ভাঙিয়া বর্ষণ শুরু হইয়াছে। কোথায় দুলাল?

কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারে না।

এক প্রহর রাত্রে সংবাদ আনিল মহেশ মণ্ডল। মানগোবিন্দপুর হইতে সে ছুটিয়া আসিতেছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

দুলালকে সে মানগোবিন্দপুরে দেখিয়াছে। মাথার চুল উড়িতেছে, চোখে আবার সেই আগের দৃষ্টি ফুটিয়াছে। শোভাকে পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহারই প্রতিবাদে সভা হইতেছিল, সেই সভায় সে দুলালকে দেখিয়াছে। পুলিস আসিয়া লাঠি মারিয়া সভা ভাঙিয়া দিয়াছে, কতক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, অনেক জনের মাথা ফাটিয়াছে। মহেশ দুলালকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল—দুলাল!

মুহূর্তে হাতখানা হেঁচকা টানে ছাড়াইয়া লইয়া সে চীৎকার করিয়াছিল—এ্যা—র্ত্।

তারপর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে, বলিয়াছে—নেহি বারেঙ্গা—যাও।

ব্রজদাসী পাংশু বিবর্ণ মুখে মোড়লের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল যেন, আকাশে বাজ ডাকিয়া গেল যেন। প্রায়-সম্পূর্ণ মন্দিরের উপরেই বোধ হয় বাজ পড়িল।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। জানে, সে ফিরিবে না। তবু বসিয়া রহিল।

দিন কয়েক পর—মহেশ আবার ছুটিয়া আসিল।

—এক দল এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। শুনছি, রেলের লাইন তুলে ফেলে দিচ্ছে। থানা পোড়াচ্ছে। পুলিস এসেছে কলকাতা থেকে ট্রেন বোঝাই। কাল নাকি বোলপুরে গুলি চলেছে।

—গুলি?

—হ্যাঁ।

দুরন্ত দুর্দান্ত দুলাল—মানুষের জীবনের সকল বন্যায় সে প্রথম ঢেউ—সেই তো সকলের আগে ছিল! ব্রজ মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—মরেছে? কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, প্রয়োজন ছিল না, সে চোখে যেন দেখিতে পাইতেছে—রক্তাক্ত ধূলি-ধূসরিত দুলাল অসুরের মত দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়া পড়িয়া আছে। ব্রজ পাগলের মত ছুটিল। বোলপুর সে চেনে। অজয়ের তীরবর্তী অঞ্চল সে দীর্ঘকাল পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়াছে। কিছুক্ষণ পর সে শুনিল—দাঁড়াও ব্রজ।

ব্রজ পিছন ফিরিয়া চাহিল না, সে বুঝিল—মহেশ মণ্ডলই আসিতেছে। ভালই হইয়াছে, সে দুলালের দেহ মণ্ডলকে ফিরাইয়া দিবে, বলিবে—নাও, আমি একদিন তোমার হাত থেকে নিয়েছিলাম। আমি ফিরিয়ে দিলাম। যা তুমি করতে চেয়েছিলে—তাই হয়েছিল—তাই হয়েছে। সকল কলঙ্কের চিহ্ন তোমার মুছে গেল।

ট্রেন বন্ধ। পায়ে হাঁটিয়া ধূলি-ধূসরিত দেহ—লাল ধূলায় লালচে কাপড়, রুক্ষ চুল, চোখে

প্রখর চঞ্চল দৃষ্টি লইয়া সে আসিয়া বোলপুর পৌঁছিল। সামনে যাহাকে পাইল তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল—বলতে পারেন প্রভু, কোথায়—কোন্ জায়গায় ? হাঁপাইতে লাগিল সে।

—কি ?

—গুলি করেছে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ব্রজর দিকে চাহিয়া বলিল—কেন ? তোমার—

—আমার ছেলে। দুলাল। ব্রজদুলাল দাস।

—তোমার ছেলে ? কিন্তু—

—কোথায় বাবা ? কোন্ জায়গায় গেলে তার দেহখানা পাব ?

—কি জানি ? কিন্তু—কই—

—বলুন বাবা—বলুন !

লোকটি আর কথা বাড়াইল না—আঙুল দেখাইয়া বলিল—স্টেশনের ওখানে গুলি চলেছিল, কিন্তু কই—ব্রজদুলাল দাস কই—? না তো !

ব্রজ আর শুনিল না—ছুটিল।

লোকটি মিথ্যা বলে নাই—যাহারা মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে ব্রজদুলাল দাস বলিয়া কেহ ছিল না। লোকে বলিল—থানায় বলিল—ডাক্তার বলিল। ব্রজ বিশ্বাস করিল না-কি কে জানে—কোন একজনের বুকের ঝরিয়া-পড়া রক্তে ভিজা মাটির পাশে বসিয়া রহিল।

* * *

মল্লারপুরের ওদিকে রেল-লাইন তুলিয়া দিয়াছে।

ব্রজ অন্ধকার রাত্রে কাহাকেও না বলিয়া একদিন মল্লারপুরের দিকে রওনা হইল। রামপুর-হাটে অনেক লোককে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। ব্রজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

লোহার শিক দেওয়া খাঁচার মত ঘরের মধ্যে হাতে-পায়ে বেড়ীতে আবদ্ধ দুলাল পড়িয়া আছে—শিঙে-নাকে-গলায় বাঁধা মহিষের মত। লালচে চোখ মেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। ব্রজকে দেখিয়া সে কথা বলিবে না, একটু নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়া উঠিবে মুখে—দু'ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িবে চোখের কোণ হইতে।

এবার ব্রজর মায়ের মনের অনুমান মিথ্যা হইল না।

মল্লারপুর পৌঁছিয়া শুনিল—ব্রজদুলাল নয়, বিরিঞ্চিনন্দন একজন আছে। ধরা পড়িয়াছে। অল্প বয়স—দুর্দান্ত ছেলে—বুনো মহিষের মত গোঁ—তেমনি আকৃতি ! ব্রজর সন্দেহ রহিল না।

—কি হবে ?

—কে জানে ? ফাঁসি—দ্বীপান্তর—যা খুশী ওদের। আবার বলছে—জেলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মেরে দেবে।

ব্রজ আবার ছুটিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, লোকে বারণ করিল—পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই, এ রাত্রে তুমি যেয়ো না। প্রচণ্ড বর্ষা—বন্যায় দিগ্‌দিগন্তর ভাসিয়াছে। পথে নদী—দারকা—এখানে দারকাকে নদ বলে, বর্ষায় প্রচণ্ড স্রোত, সেই দারকার দুকূল-পাথার।

ব্রজ মানিল না।

বর্ষণ শুরু হইল পথে। আকাশ-পৃথিবী একাকার হইয়া গেল—বৃষ্টির ধারায় ধারায় মেঘ ও মাটির মধ্যে শূন্যলোক পরিপূর্ণ করিয়া একসঙ্গে জুড়িয়া দিল। অন্ধকার—এমন অন্ধকার ব্রজদাসী কখনও দেখে নাই। ব্রজ তাহারই মধ্য দিয়া চলিল। বর্ষণ একসময় থামিল। ব্রজ

একটু জোরেই চলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দারকা নদীর ঘাটে আসিয়া আটকাইয়া গেল। নদীর জল স্পষ্ট দেখা যায় না—শুধু একটা বিস্তীর্ণ শুভ্র আস্তরণ বিছানো রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল—কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে হাসির মত খল-খল কল-কল শব্দে বন্যা বহিয়া চলিয়াছে—সেখানে অস্পষ্ট কিছু নাই। খেয়া নাই। এপারে-ওপারে কোথাও একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মিও দেখা যায় না, গ্রাম চেনা যায় না; ব্রজ তবু চীৎকার করিল—মাঝি—মাঝি!

তাহার কণ্ঠস্বর নদীর বুকে ছড়াইয়া পড়িল—ভাসিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু সাড়া কেহ দিল না।

একা সে একটা গাছতলায় বসিয়া রহিল।

ভোর হইলে দেখিল—ঘাট কোথায়? সে একটা আঘাটায় বসিয়া আছে।

আরও খানিকটা ঘুরিয়া ঘাটে গিয়া দেখিল—খেয়া বন্ধ। সরকারী হুকুমে খেয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইমাত্র পুলিস আসিয়া ওপারে বসিয়াছে।

রেলের পুল আছে। লোহার কাড়ির উপর কাঠের স্লিপার পাতা পুল। সাহস থাকিলে সন্তর্পণে পার হওয়া যায়। ব্রজ ফিরিল—সেই পুলের উপর দিয়াই পার হইবে সে!

রেলের পুলের উপরেও পাহারা। ইহারা পুলিস নয়, গোরা পল্টন বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে।

দূরে দূরে লোক জমিয়া আছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া এই পাহারা দেওয়াই দেখিতেছে। তাহারাই ব্রজকে আঁটকাইল।—যেয়ো না, গুলি ক'রে দেবে। ক্ষেপে গিয়েছে বেটারা। কাল রাত্রে জল-ঝড়ের মধ্যে জেল থেকে ছ'জন কয়েদী পালিয়েছে।

—জেল থেকে পালিয়েছে?

—হ্যাঁ। বাহাদুর ছোকরা সব!

—বিরিঞ্জনন্দন—

—সেও পালিয়েছে। হাতকড়ি খুলে—জানলার শিক বেঁকিয়ে—কাপড় বেঁধে—পাঁচিল টপকে—বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। জন-দু-তিন ডাকাত আর এরা তিন-চারজন।

* * *

ব্রজ দিনে ঘুমায়—রাত্রে ঘরে আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া তাহারই পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

নিজে কাটারী লইয়া জানালার সামনের কতকগুলি গাছের ডাল কাটিয়া দিয়াছে।

কাহাকেও সে এ কথা বলে নাই। বাবাজীকে না, মহেশকেও না। বলিতে তাহার সাহস নাই। শুধু বলিয়াছে—দেবতা গোপালকে। বলিয়াছে—একটি রাত্রে একটি বারের জন্য তাহাকে এখানে আসিবার মতি দাও।

রাত্রে বসিয়া থাকে। খুট করিয়া শব্দ হইলে বাহির হইয়া চাপা গলায় ডাকে, দুলাল?

সাড়া পায় না। তবু দাঁড়াইয়া থাকে। চারিপাশ ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আপন মনে আপনাকে শুনাইয়াই বোধ হয় গায়—"মনে ছিল আশা—হ'লে বৃদ্ধ দশা—গোপাল পুষিবে শেষে।"

মাত্র ওই একটা কলিই গুন-গুন করে। গান তো সে গায় না, ওইটুকুই মনে পড়িয়া যায়—আপনিই বিলাপ-গুঞ্জনের মত বাহির হইয়া আসে।

মধ্যে মধ্যে মহেশের কাছে যায়। খবরের কাগজে দুলালের ফাঁসি বা দ্বীপান্তরের খবর উঠিয়াছে কি না জানিতে যায়। থাকিলে মহেশ গোপন করিবে না—সে কথা সে জানে।

করিতে পারিবে না। চোখ দিয়া তাহার বন্যা বহিয়া যাইবে।

মহেশ বলে—আর নিজেকে মিথ্যে মায়ায় জড়িয়ে রাখবেন না মা-জী। চ'লে যান। পথে বেরিয়ে—ছলনায় বাঁধা প'ড়ে আটকে রয়েছেন। আমি তার জন্যে দায়ী। আর না। অনেক দুঃখ ভোগ করলেন। এইবার সময় এসেছে, বেরিয়ে পড়ুন, চ'লে যান। গুরুদেবকে লিখেছিলাম, তিনি লিখেছেন—

ব্রজ বলে—যাব। তাই যাব। চিঠি শুনব না।

ব্রজ উদ্যোগ-আয়োজন করে। কিন্তু সে আয়োজন তার শেষ কোন দিন হয় না। বাঁধে আর খোলে। এটা লইতে ভুল হইয়াছে। আবার খোলে—ছি, এ-সবে তার প্রয়োজন কি? এত পোঁটলা বহিয়া কি পথ চলা যায়!

নিজের ছলনা এক-এক সময়ে নিজেই ধরিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাতে সে লজ্জিত হয় না। বলে—আমার যদি নিজের সন্তান হ'ত তবে কোন্ দিন—কোন্ দিন আমি চ'লে যেতাম। এ যে পরের। সেখানে গিয়ে যদি শুনি—পরের ব'লেই এটা তুমি পেরেছিলে, নিজের হ'লে কি পারতে? শাস্তিকে তো ভয় করি না, অনেক শেল বুকে ব'য়ে বেড়াচ্ছি, এর চেয়ে আর কোন বড় শক্তিশেল ভগবানের আছে? শাস্তি নয়, লজ্জা; নিজের কাছেই যে লজ্জায় ম'রে যাব। শুধু একটা সংবাদের প্রতীক্ষা!

সাত-আট মাস হইল দুলাল চলিয়া গিয়াছে। জেল হইতে পলাইয়া—আবার হয়তো কোথায় ধরা পড়িয়াছে। কিম্বা ঝড় আছে, ঝঞ্ঝা আছে, বন্যা আছে, বজ্রপাত আছে, রোগ আছে, জন্তু-জানোয়ার আছে, সাপ আছে—মৃত্যু আছে—মৃত্যু তো বহুরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মানুষের চারিপাশ ঘিরিয়া পাকে-পাকে ফিরিতেছে, সে শুধু খোঁজে সুযোগ। দুলালের দুর্দান্তপনা—দুরন্তপনার মধ্যে সুযোগ যে প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুকে ডাকে!

শুধু সেই সংবাদটার প্রতীক্ষা সে করিয়া আছে। সংবাদ আসিলেই সে চলিয়া যাইবে। তাহার সকল আয়োজন এইখানে বসিয়াই করিতে আরম্ভ করিল। সে এক তপস্যা।

আর তাহার প্রতীক্ষায় লাভ নাই। সে চলিয়াই যাইবে। প্রাণ-মন সমস্ত কিছুকে সে একত্রিত করিয়া দেবতার সেবায় ঢালিয়া দিল। আখড়াকে সে উৎসব-মুখর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সব মিথ্যা—তুমি সত্য। তুমি যখন রহিয়াছ—মূর্তি ধরিয়া ব্রজর আখড়ার সিংহাসনে বসিয়াছ—তখন ব্রজর তো সব আছে। কিসের দুঃখ। সে স্নান করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিয়া বাল্যভোগ সাজায়, মালা গাঁথিয়া পরায় গোপালকে, চন্দনের অলকাবিন্দু তিলক-রেখা আঁকিয়া দেয়—হাতে একটি নাড়ু তুলিয়া দেয়, মৃদুস্বরে গান গায়—

"একবার তেমনি-তেমনি-তেমনি ক'রে নাচ রে
চাঁদের কোণা!
চরণে চরণ দিয়ে—তেমনি ক'রে!
তোর মুরলী বাঙ্কায়ে দিব যত লাগে সোনা,
নাচ রে চাঁদের কোণা!"

ঠিক এমনি একটি মুহূর্তে সেদিন ভারী জুতার শব্দ করিয়া কে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। একজন বিচিত্র পোশাকপরা লোক। সিপাহীর মত পোশাক। পিছনে এক পাল ছেলে—এক দল লোক।

দুলালের বন্ধু শিউচা। সে বলিল—খেৎ—আমার নাম শিবদাস। আমি বাঙালী রে বাবা! শিউচা তো পুলিসের গুলি খেয়ে মরেছে। হা-হা করিয়া হাসে। সে বিচিত্র সংবাদ আনিয়াছে।

দুলালের বন্ধু। একসঙ্গে বাসে চাকরি করিত। একসঙ্গেই পলাইয়াছিল। বিচিত্র সংবাদ আনিয়াছে।

দুলাল যুদ্ধে চাকরি করিতেছে।

সে কি? তোমরা যে সব—লাইন তুলে—

হা-হা করিয়া হাসিয়া সে বলিল—পাগল সব। আস্ত পাগল। লাইন তুলতে কে গিয়েছিল—সে মা-গঙ্গা জানে - আমরা তিনজন যুদ্ধের চাকরিতে মোটা মাইনে ব'লে চ'লে গেলাম কলকাতা। সেখানে হ'ল না, চলে গেলাম পানাগড়। সেখানে চাকরি মিলে গেল। ডেরাইবিংয়ের পরীক্ষা নিলে—আরও শেখালে, লাইসেন্ ক'রে দিলে—বাস্—বড় বড় গাড়ী নিয়ে চ'লে গেলাম। আমি বাড়ী এলাম ছুটি নিয়ে—কাঁধে বোমার টুকরো লেগেছিল। আবার যাব। দুলাল খুব গাড়ী চালাচ্ছে—সে-ই চাটগাঁয়ের ওধার—জঙ্গল-পাহাড়—সেদিকে আছে এখন।

কে একজন বলিল—আঃ, বাছা রে! কোন্ দিন কি হবে—কেউ খবর পাবে না।

সে বলিল—সেটির জো নাই। দুলাল মায়ের নাম-ঠিকানা দিয়েছে; আমি আমার দিয়েছি; যে যার আপন লোকের ঠিকানা দিয়ে রেখেছে। কিছু হ'লে রেজেস্টারী চিঠি আসবে—কিছু দিয়ে গেলে তা আসবে। সরকার ডেকে ক্ষতিপূরণ দেবে—টাকা দেবে। সে সব পাবে। সে সব বন্দোবস্ত পাকা।

তার পর বলিল—দুলাল একটি কথা ব'লে দিয়েছে। তোমরা সব যাও বাপু। যাও—যাও। কারও সামনে আমি বলব না—ব্যাগো! শেষে সে 'ব্যাগো' বলিয়া একটা হাঁক মারিয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া উঠিয়া পলাইয়া গেল।

শিউচা হাসিয়া বলিল—ওদের ছামনে ঝুট বলতে হ'ল। আমার নাম শিউচা। নাম আমরা ভাঁড়িয়েছি তো! লাইন তুলতে আমরা গিয়েছিলাম। বিরিজনন্দন ভিজে গায়ে বাসের গ্যারেজে হাঁক মারলে মারী—সে কি বলব তোমাকে! ইনকিলাব জিন্দাবাদ্! মারো ডাণ্ডা! আরে বাপ রে! তারপর বললে—শিউচা, দে আমাকে একটা হাপপ্যাণ্ট আর একটা শার্ট, আর একটা চাদর। পাগড়ী বেঁধে ডাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে বললে—চল্। পহেলে লাইন উখাড় দেব, তারপর চল্—জেল তোড়কে ছিনিয়ে আনব শোভা দিদিকে। বেরিয়ে সে হয়ে গেল অন্ত রকম কাণ্ড! ধরা পড়লাম, জেলে ভরলে, বিরিজনন্দন শলা ক'রে সাহস ক'রে জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করলে। আরে বাপ রে! সে এক কাণ্ড! আজও দেখ না—গায়ের রোঁয়া সব খাড়া হয়ে উঠেছে!

তারপর হাসিয়া বলিল—নাম আমাদের কেউ জানত না। সব নাম ভাঁড়িয়েছিলাম। পুলিস এখানে কোন খোঁজখবর করে নি?

ব্রজদাসীর কণ্ঠস্বর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, দেহমন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, সমস্ত আকাশ পৃথিবী যেন দোল খাইতেছে, সে চোখ বন্ধ করিয়া যেন তলাইয়া যাইতেছে গাঢ়তম অন্ধকারের মধ্যে। ওরে দুরন্ত—ওরে দুর্দান্ত! তবু তাহার আক্ষেপ—এ বুক হইতে তাহার রক্তকে ক্ষীর করিয়া তাহার বুক ভরিয়া দিতে পারি নাই। ওরে দুলাল, মাতৃস্তন্যবঞ্চিত দেহে তুই—। চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

শিউচা আবার প্রশ্ন করিল—পুলিস এসেছিল নাকি?

ব্রজদাসী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

সে বলিল—ঠিক হায়। তারপর জেল থেকে পালিয়ে অনেক ঘুরে শেষে পানাগড়ে গিয়ে

আসল নাম লিখিয়ে যুদ্ধের কাজ নিলাম।

ব্রজ এবার বলিল—সে কি বলেছে?

—বলে নাই কিছু। তবে আমি গোপনে খোঁজটা নিলাম। এ যদি প্রকাশ হয় তবে একেবারে গুলি ক'রে মেরে দেবে তো, তাই জন্যে। আচ্ছা চললাম। যুদ্ধ শেষ হ'লেই আসবে সে। যদি—। হাসিয়া বলিল—তা হ'লে খবর পাবে। রেজেস্টারী চিঠি আসবে, কিছু যদি দেয় সে—তাও পাবে। তুমি একটা মাদুলি দিয়েছিলে—সেটা সে ঠিক রেখেছে—বলেছে—তা যদি হয়, তবে মাদুলিটা পাঠিয়ে দিতে বলব! আর সরকার যা দেয়—তা পাবে।

স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল ব্রজদাসী।

কিছু বলিয়া দেয় নাই দুলাল?

মাদুলিটা সে সযত্নে রাখিয়াছে?

সে যদি—। তাহা হইলে সেইটা ফেরত আসিবে?

দোল-পর্ব চলিয়া গেল।

মহেশ আসিয়া বলিল—মা-জী—

—মোড়ল!

—কি ঠিক করলেন?

—ঠিক আর কি করব? আর ক'টা দিন দেখি? রেজেস্টারী তো আসবে—

—না। না। তা কেন? সে হয়তো ফিরেই আসবে।

—দেখি।

বৈষ্ণবী উঠিয়া চলিয়া যায় পোস্ট-আপিসে।—আমার কি কোন রেজেস্টারী আছে বাবা?

নাই।

দিন যায়—মাস যায়—বছর যায়—। যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। রেজেস্টারী আসিল না। দুলালের সঙ্গী শিউচা ফিরিল। বলিল—কলকাতায় এল। এসে বললে, যা তুই বাড়ী। আমি এখন যাব না। সে শোভা দিদির খোঁজ করছে। দুদিন তাকে রাস্তায় দেখেও ধরতে পারে নি। তা ছাড়া—আবার কোন নতুন হাঙ্গামাতে মাতবার ফিকিরে আছে সে। হাসিয়া বলিল—সে একটা হালফেশানের মেয়ে বিয়ে করবে। তারপর তার একটা না একটা হাঙ্গামা চাই-ই।

হা-হা করিয়া সে হাসিতে লাগিল।—সে হায় বিরিজনন্দন। মারে ডাণ্ডা দনাদন্। যাঁহা ডাণ্ডা গাড়তা হুই রাজ বানাতা! সে আসবে না।

এবার ব্রজ একদিন সব বন্ধন একটানে ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। নাকে রসকলি কাটিল—গলায় নূতন কণ্ঠী পরিল, গৈরিক কাপড় ছোপাইয়া লইল, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইল, চূড়া করিয়া চুল বাঁধিল, হাতে খঞ্জনী লইয়া বাবাজীকে গোপালের ভার বুঝাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দীর্ঘকাল পরে সে গান ধরিল—

"কবে আমি ব্রজে যাব,
মাধুকরী মেগে খাব—
পথের ধূলায় ধূসর হয়ে—"

এবার সে পথ হাঁটিবে না। ট্রেনে চাপিয়া—চোখ মুদিয়া বসিবে। একেবারে বাংলা দেশ

পার হইয়া সেই এক বড় জংশনে নামিবে—তাহার পর বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ গোবিন্দ নন্দ-নন্দন!

স্টেশনে আসিয়া সে গান আরম্ভ করিল। ভিক্ষা শুরু করিল।

আর সে সে-কালের সে নয়। বিরহিণী রূপসী বৈষ্ণবী নয়। আজ সে দুঃখিনী, দুলালের মা, প্রৌঢ়া ব্রজদাসী বৈষ্ণবী। কেহ আর আজ ইঙ্গিত করিল না, হাসিল না, রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল না। আজ তাহাকে কেহ করিল শ্রদ্ধা—কেহ করিল স্নেহ—কেহ বলিল মা। কেহ বলিল মেয়ে।

কিন্তু সকলেই তাহার গান শুনিয়া কাঁদিল।

গান শেষ করিয়া সে একজনকে বলিল—আমাকে একখানা টিকিট কেটে দেবেন বাবা?

—কোথাকার টিকিট? দাও।

খুঁট খুলিয়া সে একমুঠা টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল—কলকাতার।

—কলকাতার তো এত টাকা কেন?

—ও! আমি বৃন্দাবনের ভাড়া খুঁটে বেঁধে রেখেছিলাম কি না? তাই দিয়েছি। কলকাতা হয়ে আমি বৃন্দাবন যাব বাবা, সেই টিকিট একখানি কেটে দাও।

লোকটি হাসিয়া বলিল—তা তো হয় না। কলকাতা পূবে, বৃন্দাবন পশ্চিমে। কলকাতা গেলে—সেখান থেকে আবার নতুন টিকিট কিনতে হবে। এখান থেকে কলকাতার যা ভাড়া—সেই ভাড়াটা আবার বেশী লাগবে।

ব্রজদাসী একটু ভাবিয়া বলিল—তবে কলকাতার টিকিটই কিনে দাও। কি করব।

কি করিবে সে? কলিকাতা যে তাহাকে যাইতেই হইবে।

এই কিছুক্ষণ আগে একজন খবরের কাগজ পড়িয়া গল্প করিতেছিল—একজন এ-দেশী পল্টনের সিপাহী এবং একজন নিগ্রো সিপাহী—পরস্পরের মধ্যে গালি-গালাজ করিয়া ছুরি লইয়া মারামারি করিয়াছে। এই দেশী লোকটি নিগ্রো সিপাহীটিকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে। আহত অবস্থায় দেশী সিপাহীটিকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ব্রজ জানে—এ তাহার দুরন্ত দুর্দান্ত দুলাল ছাড়া আর কেহ নয়।

সে জানে—। টপ-টপ করিয়া চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে শুরু হইল। সে জানে—এবার তাহার নিষ্কৃতি নাই। ফাঁসিকাঠে—

সে তাহার পূর্বে একবার তাহাকে দেখিবে। দুলালকে লইয়া কত ভাবনা সে ভাবিয়াছে, কত প্রশ্ন জাগিয়াছে—কতজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর সে সংগ্রহ করিয়াছে। ফাঁসির পূর্বে দরখাস্ত করিলে মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র—ইহাদের দেখিতে অবশ্যই অনুমতি মিলিবে।

তাহাকে দেখিয়া—সকল খেদের সকল ভাবনার শেষ করিয়া সে আবার বৃন্দাবনের পথে রওনা হইবে। গিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়ে গড়াইয়া পড়িয়া বলিবে—সব শেষ করিয়া আসিয়াছি। এইবার তুমি দয়া কর।

তাহার পূর্বে দুলালকে একবার—

ট্রেনখানা দুরন্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ব্রজ জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া সকলের অগোচরে কাঁদিতে লাগিল।

ঝর-ঝর করিয়া সে জল পৃথিবীর বুকে পড়িতেছিল। পৃথিবী তৃপ্ত হইল—ধন্য হইল। পৃথিবী বলিল—আরও কাঁদ তুমি। তোমার সন্তানেরা তোমার কোল ছাড়িয়া ছুটিয়া চলে

ভবিষ্যৎ-বধূর হাতছানিতে। প্রৌঢ়া তুমি অনুসরণ করিতে পার না, এমনি করিয়া চিরকাল কাঁদিয়া আসিয়াছ, আজও কাঁদিতেছ; সেই অশ্রুর একটি বিন্দু সিন্ধু হইয়া আমাদের স্নান করায়; সেই স্নানে ওই দুরন্ত অস্ত্রাঘাতে ক্ষরিত আমার বুকের সকল রক্ত কলঙ্ক—সকল উত্তাপ মুছিয়া যায়, শীতল হয়। আমি তৃপ্ত হই।

প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মাটিতে পড়িবা মাত্র শুকাইয়া যাইতেছিল। দুরন্ত তৃষ্ণায় পৃথিবী পান করিতেছিল।